মহারাজ নন্দকুমার

অথবা

শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা

চণ্ডীচরণ সেন

পুনশ্চ

MAHARAJ NANDAKUMAR

A Historical Novel

by Chandi Charan Sen

First PUNASCHA Edition
January 2026

ISBN 978-81-7332-707-0

Price
₹ 395

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম
₹ ৩৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সূচিপত্র

পিতৃমাতৃহীন বালক	৯
নির্জন চিন্তা	১৫
জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নগৃহ	২২
কাশিমবাজারের রেশমের কুঠি	২৬
লুট	৩৮
পিতৃ-বিয়োগ	৪৪
আরাটুন সাহেবের পত্নী	৫৮
রামদাস শিরোমণির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ	৬৪
কলিকাতা যাত্রা	৭৬
গুরুগোবিন্দ ভক্ত	৮০
ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী	৮৬
বিশ্বাস পরিবারের পূর্ব বিবরণ	৮৯
প্রেমানন্দ বাবাজী এবং ভক্তানন্দ বৈরাগী	১০০
বাল বিধবার মৃত্যুশয্যা	১১৫
বঙ্গ বিধবার চরিত্র সমালোচনা	১২৮
অনাথা কন্যাত্রয়	১৩২
শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা	১৪৪
বিলাতী বৈষ্ণব	১৫০
স্বপ্নে ভগবদ্ দর্শন	১৬২
বাপুদের শাস্ত্রী	১৬৭
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং নন্দকুমার	১৭৭
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং নবাব কাশিমালি	১৮৩
কারাগার দর্শন	১৮৭
ক্যারাপিট আরাটুন	১৯০
ভ্রাতা ভগ্নী	১৯৪

ক্যারাপিট আরাটুন সাহেবের মৃত্যু	১৯৬
এস্থার বিবির কলিকাতা যাত্রা	২০০
রামা ও রামহরি	২০২
রামহরি	২০৬
দুর্ভিক্ষ	২১৪
এ কী ভীষণ দৃশ্য	২১৯
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং মহম্মদ রেজা খাঁ	২২৬
স্বর্গারোহণ	২৩২
শ্যামা এবং কৃষ্ণানন্দ বাবাজী	২৩৬
ওয়ারেন হেস্টিংস	২৪২
মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের বিচার	২৪৫
নব কৌন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট	২৪৯
অভিযোগ	২৫২
প্রথম চক্রান্ত	২৫৬
প্রথম অভিযোগের বিচার	২৫৮
দ্বিতীয় চক্রান্ত	২৬০
বিচার না নরহত্যা ?	২৬৫
গুরু শিষ্য	২৭৫
দ্বিতীয়বার গুরু সন্দর্শন	২৮৩
ব্রহ্মহত্যা	২৮৬
উপসংহার	২৮৯
APPENDIX	২৯২

প্রকাশকের কথা

মহারাজা নন্দকুমার রায় ছিলেন নবাবি বাংলার দেওয়ান। ১৭০৫ সালে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ভদ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ আমলে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ফাঁসির সাজা পান। নন্দকুমার মুর্শিদকুলী খানের আমিন ছিলেন। ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা শিখে আলীবর্দীর আমলে হিজলি ও মহিষাদলের দেওয়ান হয়েছিলেন। ১৭৬৫ সালে নন্দকুমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে দেওয়ানি পান বর্ধমান, নদিয়া ও হুগলির। এ জায়গায় আগে দেওয়ান ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, খাজনা আদায় নিয়ে নন্দকুমারের সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধ শুরু হয়।

সেই ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেন। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস সহ বাংলার সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্য সদস্যরাও হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ সমর্থন করেন কিন্তু সে অভিযোগ হেস্টিংস নাকচ করে দেন। এরপর স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দলিল জাল করার দুনীর্তির অভিযোগ আনেন, বিচার চলে স্যার ইলাইজা ইম্পের অধীনে। কিন্তু মজা হল ইলাইজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু; মামলায় নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হন। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট কলকাতায় নন্দকুমারকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মহারাজ নন্দকুমারের এই ঘটনাকে উপজীব্য করে শ্রীচণ্ডীচরণ সেন ‘মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা’ নামে কালজয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে, ৬৪/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে। প্রথম সংস্করণে বইয়ের নামে ‘মহারাজা’ থাকলেও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে বইটি ‘মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা’ হয়— এ পর্যন্ত বইটি পাঠকসমাজে ওই নামেই খ্যাত। আমরাও ‘মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা’ নামটি রেখেছি।

৩ জুন ১৭৭৫ সালে ইলাইজা ইম্পে (ইম্পি) মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঘটনা হল, সাক্ষী আজিম আলি স্বপ্নে দেখেছে নন্দকুমার বোলাকি দাসের দলিল জাল করেছে। স্বপ্নে দেখা বক্তব্য তখন ব্রিটিশ আমলে ‘প্রমাণ’ হিসাবে গ্রহণ করল চারজন জুরি— এভাবে মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের নামে প্রহসন হয়। ওই বিচারের রায়ে ৫ আগস্ট ১৭৭৫ সালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয় বর্তমান রেসকোর্সের কাছে কুলবাজার মোড়ে। ঐতিহাসিক হেনরি বেভারিজ এই নিষ্ঠুর অবিচারের ঘটনাকে ‘জুডিশিয়াল

মার্ডার' বলেছিলেন। চণ্ডীচরণ সেন উপন্যাসে ওই বিচার অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন 'বিচার না নরহত্যা?' বিচারের নামে এই প্রহসনে অনেক কলকাতাবাসীরা 'ব্রহ্মহত্যা' হয়েছিল বলে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে কম করে দশ হাজার লোক একযোগে নন্দকুমারের ফাঁসি স্থগিত করার জন্য প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে কী মর্মান্তিক বাংলা— তখন ওয়ারেন হেস্টিংস ও জন বারওয়েল এই প্রতিবাদকে চাপা দেওয়ার জন্য কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ সহ চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক সংগ্রহ করে ইলাইজা ইম্পেকে অভিনন্দন বার্তা পাঠায়, যাতে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকে। উপন্যাসের এ অংশে পাঠক হয়তো রবীন্দ্রনাথের প্রবাদপ্রতিম লাইনের প্রতিধ্বনি পাবেন।

এ উপন্যাস শুধুমাত্র মহারাজ নন্দকুমারের বিচারকাহিনি নিয়েই নয়; এই উপন্যাস তৎকালীন বঙ্গদেশে নবাবি শাসন চলে যাওয়া, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ; মুর্শিদাবাদ, সৈয়দাবাদ থেকে কলকাতা— বিস্তীর্ণ বাংলার জন-মানুষের নানা লোকাচার, মীরমদন কন্যা এরফান্নেসা কীভাবে হয়ে ওঠেন এস্থারবিবি আর তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী মৃত্যুকালে কেন বিলাপ করে বলে, 'আর যদি পৃথিবীতে জন্ম হয়, ম্লেচ্ছ কুলে যেন আমার জন্ম হয়— মুসলমানের ঘরে যেন আমার জন্ম হয়' তারই এক নির্মম আখ্যান।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাতায় পাতায় তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের রসদ। সেসময় বঙ্গের কৃষক, তাঁতি ও সুবর্ণবণিকদের উপর ইংরেজ শোষণ ও প্রাকৃতিক রোষে বঙ্গভূমি যে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে পড়ে চণ্ডীচরণ সেনের ভাষায় 'নরক-সদৃশ্য বঙ্গভূমি' হয়েছে তার ঐতিহাসিক দলিল এই উপন্যাস। তৎকালীন নানা নথিপত্র থেকে তথ্যের সততা যাচাই করে চণ্ডীচরণ সেন এই কালজয়ী উপন্যাসটি লেখেন।

এই উপন্যাসের জন্য তাঁকে সরকারের রোষে পড়ে শাস্তিও পেতে হয়েছিল। 'মহারাজ নন্দকুমার' উপন্যাসটি জাতীয়-চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজ করেছিল, জনপ্রিয়ও হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে বন্ধু গৌতম রায়ের পরামর্শে ও প্রস্তাবে সম্মত হয়ে 'মহারাজ নন্দকুমার' বইটি নতুন করে প্রকাশের সিদধান্ত নিই ও যথাসম্ভব সযত্নে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি প্রকাশ করে আগামীর পাঠকের জন্য বাঙালির অতীতের এই তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের অংশকে জানার সুযোগ করে দিতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

জানুয়ারি, ২০২৬

সন্দীপ নায়ক
পুনশ্চ

ভূমিকা

আমার লিখিত টম্‌কাকার কুটীর পাঠ করিয়া অনেকানেক সুশিক্ষিত লোক বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদিগের কর্ত্তৃক আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিতা হইয়াছে, পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন জাতীয় লোকই অপর কোন জাতির উপর কখন এইরূপ ভীষণ অত্যাচার করে নাই। বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারেই জানে না।

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বঙ্গবাসীদিগের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার সম্বন্ধে লর্ড মেকলে বলিয়াছেন, ‘বঙ্গবাসীদিগের প্রতি মুসলমানদিগের সময়ও অত্যাচার হইত, কিন্তু এইরূপ ভীষণ অত্যাচার আর কখনও হয় নাই।’

বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় না, এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন

মহারাজ নন্দকুমার

অথবা

শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

Paint me as I am if you leave out the scars and wrinkles I will not pay you a shilling—*Oliver Cromwell.*

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যাপত্র

এক

পিতৃমাতৃহীন বালক

মীরকাশিমের সিংহাসনচ্যুতির কয়েক মাস পরে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে ক্রোশাধিক দূরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহে বসিয়া রাত্রে দুইটি লোক পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন।

ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার পরিধানে অতি মূল্যবান সুচারু পরিচ্ছদ। বেশভূষা এবং আকার-ইঙ্গিতে ইহাকে একজন প্রধান রাজপুরুষ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বৎসর হইবে। ইঁহার পরিচ্ছদ এবং কথাবার্তায় ইঁহাকে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার শুভ্র কেশ এবং প্রশান্ত মূর্তি দেখিলেই ইঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়।

অনেক কথাবার্তা এবং বাদানুবাদের পর শেষোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার এই সকল রাজনৈতিক কৌশল সকলই বৃথা হইবে, চরমে তুমি এই রাজনৈতিক কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।'

প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি তো বরাবরই এই রূপ বলিতেছেন। এই সকল বিষয়ে অধিক তর্ক-বিতর্ক করিলে কোনো লাভ নাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি এই দেশ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া একেবারেই স্থির করিয়াছেন?'

বৃদ্ধ। একটি দিনও আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আলিবর্দির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমার বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল।

প্রথম। তবে কলিকাতা যাইয়া কি লাভ হইবে? দুর্বল এবং নিরাশ্রয় দিগের উপর এখানেও যেরূপ অত্যাচার হইতেছে, সেখানেও সেইরূপ।

বৃদ্ধ। এই স্থানের তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক, অন্যান্য বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং শ্রমোপজীবিলোক সমুদয়ই আমার বিশেষ পরিচিত। বাল্যকাল হইতে ইহারা সকলেই আমাকে ভক্তি করে এবং আমিও ইহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসি; সুতরাং ইহাদের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিলে মনে যেরূপ দুর্বিষহ কষ্ট উপস্থিত হয়, অপরিচিত লোকের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে তত কষ্ট হয় না। গতকল্য হলধরের কন্যার মৃত শব দেখিবামাত্র প্রমদা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের, বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের, কষ্টের কথা শুনিলে নিতান্ত ব্যথিত হন। তাঁহাকে লইয়া আমার স্থানান্তরে যাওয়াই কর্তব্য। লোকের কষ্ট

দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। পূর্বে মনে করিয়াছিলাম জন্মের মতো বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যাইব। কিন্তু প্রমদার যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে এখন তাহাকে লইয়া— দূর দেশে যাইবার সাধ্য নাই। তাই কল্যই কলিকাতা চলিয়া যাইব। কালীঘাটের নিকটবর্তী কোনো স্থানে বাস করিব।

প্রথম। তবে আমাকে ডাকাইয়াছেন কেন?

বৃদ্ধ। দেখ আমি সিরাজের মৃত্যুর পর হইতে এই পাঁচ ছয় বৎসর পর্যন্ত তোমাকে যেরূপ পথাবলম্বন করিতে বলিতেছি সে পথে তুমি চলিলে না। তুমি সত্য সত্যই মোহান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ; স্বীয় অন্তরস্থিত মোহান্ধকার নিবন্ধন তোমার হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে তুমি নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই প্রস্তুত করিতেছ। আজ তোমাকে আর একটি অনুরোধ করি— (পার্শ্ববর্তী শয্যাপরি নিদ্রিত একটি তিন বৎসর বয়স্ক শিশুকে দেখাইয়া) এই শিশুসন্তানের প্রতিপালনের একটি সদুপায় কর; এই পিতৃমাতৃহীন বালক একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়াছে। ইহার পিতার যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল তাহা সমুদয়ই সভারামের গৃহে রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু সভারাম আজকাল ইহাকে স্বীয় গৃহে রাখিলে ইংরাজেরা সভারামের পুত্রকেই হলধরের সঙ্গী বলিয়া সন্দেহ করিবে। হলধরের সঙ্গে যে কে ছিল তাহা আজ পর্যন্তও তাহারা নিশ্চয় অবধারণ করিতে পারে নাই।

প্রথম। হলধরের ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরাজেরা আমাকেই নাকি সন্দেহ করিতেছে। কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির সাহেবরা নাকি বলে যে আমার লোক চৈতান নাথ হলধরের সঙ্গে ছিল। কিন্তু আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না। যদি এই বালককে আমার নিজের ঘরে রাখি, তবে তাহারা নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে যে, হলধরের ব্যাপারে আমি লিপ্ত ছিলাম। ইহার ভরণপোষণে যত ব্যয় হইবে তাহা সমুদয় আমি দিব। আপনি সম্প্রতি অন্য কোনো স্থানে ইহাকে রাখিতে চেষ্টা করুন।

বৃদ্ধ। (সক্রোধে বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব প্রকাশপূর্বক) তবে তুমি এই নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় প্রদান করিতে অসমর্থ? ইহাকে আপন গৃহে রাখিতে তোমার সাহস হয় না?

প্রথম। অবস্থানুসারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমি প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সহিত এখন কোনো শত্রুতা করিতে ইচ্ছা করি না। নবাব মীরজাফরের সাধ্য নাই যে, ইংরাজদিগের অনিচ্ছা হইলে তিনি আমাকে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন। ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলেই এখন আমাকে পদচ্যুত করিতে পারে।

বৃদ্ধ। প্রজাদিগের উপর যে অত্যাচার হইতেছে, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে তোমার এ-দেওয়ানি প্রাপ্তি দ্বারা কী লাভ হইল? তোমার নিজের একটা পদ হইল, এই ভিন্ন আর তো ইহাতে কিছুই লাভ দেখি না।

প্রথম। একদিনের মধ্যেই কি সকল অত্যাচার দূর করা যায়? ক্রমে ক্রমে এই অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে।

বৃদ্ধ। একদিনের মধ্যে যে এই সকল অত্যাচার দূর হইতে পারে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি কি এই সকল নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া তোমার ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারে? তুমি একেবারেই হৃদয়শূন্য। তুমি বারম্বার কি আমার নিকট বল নাই যে দেওয়ানি প্রাপ্ত হইতে বর্তমান অত্যাচার নিবারণ করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে? নরাধম! এই পিতৃমাতৃহীন তিন বৎসর বয়স্ক বালকের দুরবস্থা দেখিয়া তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না? ধিক তোমার জীবন! ধিক তোমার দেওয়ানি।

প্রথম। আমি আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে রেশমের কুঠির ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কিন্তু কৌশলপূর্বক কার্য করিতে হইবে।

বৃদ্ধ। হৃদয়হীন পাষণ্ড! তোমার হৃদয় থাকিলে তুমি 'রাজনৈতিক কৌশল, রাজনৈতিক কৌশল' বলিয়া বিলম্ব করিতে পারিতে না। এই নিরাশ্রয় দুর্বলদিগের কষ্ট নিবারণার্থে এই মুহূর্তেই প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইতে।

প্রথম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনি তো সিরাজের মৃত্যুর পর হইতেই এই সাত বৎসর পর্যন্ত আমাকে, 'নরাধম', 'পাষণ্ড', 'পামর' ইত্যাদি সুললিত শব্দে অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু আপনার উপদেশানুসারে কার্য করিয়া কাসিমালির কী দুর্দশা হইয়াছে তহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি।

বৃদ্ধ। আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কাসিমালির দুর্দশা হইয়াছে? তোমার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান থাকিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিতে যে কাসিমালির পরাজয় তাহার নিষ্ঠুরতারই অবশ্যম্ভাবী ফল। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।' আমি কাসিমালিকে নৃশংসাচরণে প্রবৃত্তি দান করি নাই? আমি কি তাহাকে সেইরূপ ক্রূর নরহত্যা দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিতে বলিয়াছিলাম? নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সে কয়েকটি নিরস্ত্র ইংরাজের প্রাণবধ করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়াছে। আমি চিরদিন তাহাকে সত্য এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছি। ন্যায়পথ ভ্রষ্ট না হইলে সে কখনো পরাজিত হইত না। অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া যে মনুষ্য স্বীয় শক্তিকে হ্রাস করে, তাহা মোহান্ধকার নিবন্ধন তোমরা বুঝিতে পার না।

প্রথম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রভু ক্ষমা করিবেন। কাসিমালি সম্পূর্ণরূপে আপনার উপদেশানুসারে কার্য করে নাই বলিয়াই আজ নির্বাসিত অবস্থায়ও সে স্বীয় মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পরিতেছে। কিন্তু আপনার উপদেশানুসারে কার্য করিলে এই যৎসামান্য মানসিক উল্লাস হইতেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইত।

বৃদ্ধ। কিরূপ মানসিক উল্লাস দ্বারা সে আপন মনকে প্রবোধ দিতে সমর্থ হইয়াছে?

প্রথম। আর অধিক কিছু নহে। রাজ্যচ্যুতির সময়ে অন্তত যে কয়েকজন শত্রুর প্রাণবিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই মানসিক উল্লাসে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। কিন্তু আপনার উপদেশরূপ ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে সে কয়েকটা দুষ্টেরও প্রাণবধ করিতে সমর্থ হইত না।

বৃদ্ধ। নরাধম ! সত্য সত্যিই তোমার অন্তরাত্মা নরকসদৃশ হইয়া রহিয়াছে। কী পরিতাপের বিষয় ! নিগূঢ়তত্ত্ব তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে না। তোমার সহি অধিক বাক্যালাপ করিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। অস্ত্রহীনাবস্থায় কাসিমালি শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রাণবধ করিয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য করিয়াছে; স্বীয় নাম কলঙ্কিত করিয়াছে।

প্রথম। আমি স্বীকার করিলাম আমার শাস্ত্রে জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু আপনার উপদেশানুসারে কার্য করিয়া কাসিমালির কি উপকার হইয়াছে?

বৃদ্ধ। কাসিমালির অনেক উপকার হইয়াছে। তুমি কি জান না কাসিমালি কী ছিল? সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্বে কাসিমালি সিরাজ এবং মীরজাফরের ন্যায়ই নরপিশাচ ছিল; নহিলে সে আপন শ্বশুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া রাজ্য লাভের চেষ্টা করিবে কেন? কিন্তু সিংহাসনারূঢ় হইবার পর সে সমস্ত জীবনের মধ্যে আমার যে একটি উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল, তজ্জন্য পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার সদগতি হইবে; বঙ্গের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহার নাম চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে, ভাবী বংশাবলী তাহার জীবনের সকল কলঙ্ক বিস্মৃত হইবে; প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া সে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে; তাহার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র বঙ্গের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইবে। মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি বাঞ্ছনীয় আছে? ন্যায়ের রাজত্ব সংস্থাপনার্থ, সত্যের আধিপত্য বিস্তারার্থ যাঁহারা এই কার্যক্ষেত্রে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন তাঁহারাই দেবতা।

প্রথম। (অধোমুখে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক) তবে আমার নিকট আর কিছু আপনার বলিবার নাই। আমি এখন বিদায় হইতে পারি।

বৃদ্ধ। তোমার নিকট আমার আর কিছুই বলিবার নাই। কেবল এই নিরাশ্রয় শিশুর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে পার কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকাইয়াছিলাম। এই বালককে সাহস করিয়া কেহই আশ্রয় প্রদান করিল না। সকলেই বলে ইহাকে যে আশ্রয় প্রদান করিবে তাহাকেই ইংরাজেরা হলধরের সঙ্গী সন্দেহে ফাঁসি দিবে। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, এই পিতৃমাতৃহীন তিন বৎসর বয়স্ক নিরাশ্রয় শিশুকে যাহারা আশ্রয় প্রদান করিতে অস্বীকার করিল, পরমেশ্বর স্বয়ংই তাহাদের ফাঁসিরকাষ্ঠ প্রস্তুত করিতেছেন। নন্দকুমার ! আজ তোমার ফাঁসিরকাষ্ঠ প্রস্তুত হইল।

প্রথম। আমি আপনাকে পিতা অপেক্ষাও সমধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করি। আপনি আমার গুরু, পরম দেবতা, আমাকে অভিসম্পাত করিলেন!

বৃদ্ধ। আমি অহর্নিশ তোমার মঙ্গল কামনা করি। এ দেহে প্রাণ থাকিতে তোমাকে কখনো অভিসম্পাত করিব না। কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে ভবিষ্যতে তুমি যে পুরস্কার পাইবে তাহাই কেবল বলিলাম।

প্রথম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) দেশের মধ্যে কেহই তো এই বালককে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইল না; তবে কি এই দেশসুদ্ধ সমুদয় লোকেরই ঈশ্বরের বিচারে ফাঁসি হইবে?

বৃদ্ধ। এই নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেছে বলিয়া দেশসুদ্ধ সমুদয় লোককেই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। কিন্তু এই অপরাধের নিমিত্ত কাহাকে কিরূপ দণ্ডিত হইতে হইবে তাহা মনুষ্যের বলিবার সাধ্য নাই। যে দেশে একজনের কষ্ট নিবারণার্থ অপরাপর লোক নিশ্চেষ্ট থাকে, সে-দেশে ক্রমান্বয়ে সকলকেই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। বঙ্গদেশ নরপিশাচে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; অনতিবিলম্বেই এই দেশ উৎসন্ন যাইবে। বঙ্গদেশ ছারখার হইবে।

প্রথম। তবে দেশের সমুদয় লোককেই আপনি অভিসম্পাত করিতেছেন?

বৃদ্ধ। আমি দেশের অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু দেশের প্রত্যেক লোক যখন অপরের কষ্ট নিবারণার্থ যত্নবান হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই এই দেশ অধঃপাতে যাইবে। হলধরের যে-অবস্থা হইয়াছে, একে একে সকলেরই সেই অবস্থা হইবে।

প্রথম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) যাহারা অত্যাচার করিতেছে, ঈশ্বরের বিচারে তাহারা অধঃপাতে গেলেই বিচারটা কিছু ভাল হয়। কিন্তু আপনার মুখে যে এক নূতন প্রণালীর বিচার শুনিতে পাইতেছি। যাহারা অত্যাচার করিতেছে তাহাদের কোনো দণ্ড হইবে কিনা সে-বিষয়ে কিছুই বলিলেন না। যে-সকল দুর্বল গরিব আপন আপন প্রাণের ভয়ে অত্যাচার নিপীড়িতদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করে না, অগ্রে তাহারাই দণ্ডিত হইবে, এই কি ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত বিচার!

বৃদ্ধ। যাহারা অত্যাচার করিতেছে তাহারা ঐশ্বরিক দণ্ড হইতে কখনও নিষ্কৃৎত পাইতে পারিবে না। কিন্তু তুমি যে এখন দেশের প্রধান রাজপুরুষ হইয়া এই অত্যাচার নিবারণে যত্ন করিলে না, তজ্জন্য সর্বাগ্রে তোমাকেই দণ্ডিত হইতে হইবে। জগতের দুঃখ-কষ্ট, অর্থাৎ অত্যাচার নিবারণার্থ যাহারা চেষ্টা করে না, তাহারা নিশ্চয়ই অত্যাচারের সাহায্য করিতেছে।

প্রথম। এ বিলক্ষণ বিচার। আমি নিরপরাধী, এই অত্যাচার নিবারণার্থ কত কৌশল করিতেছি এখন অগ্রে আমাকেই দণ্ডিত হইতে হইবে।

বৃদ্ধ। এ-বিচার ভালই হউক আর মন্দই হউক, এই অখণ্ডনীয় ঐশ্বরিক নিয়ম সারা বিশ্ব সংসারে পরিশাসিত হইতেছে। তোমার হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর না হইলে ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব তুমি কিছুই বুঝিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তুমি বিনাশের পথে

অগ্রসর হইতেছ। যদি আপনার মঙ্গল চাও তোমার এই সকল রাজনৈতিক চাতুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে অত্যাচারের অবরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইতে চেষ্টা কর। সাধ্বীর অশ্রুবারি দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদয় বঙ্গদেশকে ভস্মীভূত করিবে। কীটের ন্যায় তুমি সেই দাবাগ্নির মধ্যে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইবে নন্দকুমার! আর বিলম্ব করো না। আপন মৃত্যু হইতে অপনাকে রক্ষা কর। পরমেশ্বর তোমাকে জনসাধারণ অপেক্ষা সমধিক শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। দুর্বল ও নিরাশ্রয়ের অত্যাচার নিবারণার্থ সেই শক্তির সদ্ব্যবহার কর।

এই বলিয়া বৃদ্ধ নির্বাক হইয়া রহিলেন। মহারাজ নন্দকুমার অধোবদনে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নন্দকুমার বৃদ্ধের চরণে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দুই
নির্জন চিন্তা

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। সুনীল আকাশে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া গভীরভাবে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। জগন্মণ্ডল চন্দ্রের সুমধুর স্নিগ্ধ কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। জন-প্রাণীর শব্দ নাই। এই সময়ে বঙ্গের সুবাদার মীরজাফরের দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমার একাকী রাজপথ দিয়া চিন্তাকুল মনে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। তিনি সময়ে সময়ে ঊর্ধ্বনেত্রে চন্দ্রমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

চন্দ্রমার প্রকাশে বহির্জগৎই কেবল আলোকিত হইল, কিন্তু মনুষ্যের অন্তরস্থিত মোহান্ধকার চন্দ্রলোক দ্বারা বিদূরিত হইল না। চন্দ্রের চন্দ্রমা যিনি, জ্যোতির জ্যোতিঃ তিনি, তাঁহার পবিত্র বিকাশ ভিন্ন অন্তর্জগৎ কখনো আলোকিত হয় না, হৃদয়স্থিত তিমিররাশি বিনষ্ট হয় না।

চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজা নন্দকুমার স্বীয় গৃহে প্রবেশপূর্বক শয়ন প্রকোষ্ঠের বাতায়নে বসিয়া মনে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন; মনোমধ্যে এইরূপ বিবিধ প্রশ্নের উদয় হইল—সত্য সত্যই কি আমি বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি? গুরুদেবের মুখ হইতে তো কখনো কোনো বৃথা কথা বাহির হয় না। তিনি যাহাকে যাহা বলিয়াছেন তৎ সমুদয়ই সময়ে পূর্ণ হইয়াছে—তবে কি ইঁহারই উপদেশানুসারে কার্য করিব? কিন্তু ইঁহার উপদেশানুসারে কার্য করিলে ধন মান পদ প্রভুত্বের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে—তাহাতে লাভ কি হইবে? লাভ তো কিছুই দেখিতে পাই না—গুরুদেবের সমুদয় কথাই প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে। ইঁহার কোনো কথারই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না, কোনো কথার অর্থই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে ইনি যাহা বলিলেন তাহাই কি সত্য? আমার হৃদয়স্থিত মোহান্ধকার প্রযুক্তিই কি আমি কিছু বুঝিতে পারি না? কিরূপেই বা হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর হয়, কবে আমার হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর হইবে?

কিন্তু ইঁহার অন্যান্য কথার অর্থ না বুঝিলেও শেষের কথার অর্থ তো অনায়াসেই বুঝিতে পারি—আমার এ-দেওয়ানি পদ সত্য সত্যই অস্থায়ী, কল্যই আমি পদচ্যুত হইতে পারি। আমার পদচ্যুত হইবার তো অনেক সম্ভাবনাই রহিয়াছে। ইংরাজগণ অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক আমার নিয়োগ সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়াছে। একটু ত্রুটি হইলেই পদচ্যুত করিবে। ত্রুটির তো অভাবই নাই, শত চেষ্টা করিয়াও রাজস্ব আদায় করিতে পারিতেছি

না, কিন্তু ইংরাজগণ বলিতেছে আমি রাজস্ব অদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতেছি। রাজস্ব আদায় না হইলে নবাব ইংরাজদিগকে যে-টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা পরিশোধ হইবে না, কাজে কাজেই ইংরাজেরা আমাকে পদচ্যুত করিবে।

গুরুদেবের কথা কিছুই মিথ্যা নহে। এই রাজস্ব আদায় করিতে আবার আমাকেও কত কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে হইবে। তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন সকলই সত্য। পদরক্ষার নিমিত্ত অত্যাচার করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইবে কিন্তু পদ কিছু থাকিবে না, চরমে কেবল সেই অত্যাচারের নিমিত্তিই পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে।

দেওয়ানি তো আমার থাকিবেই না, যায় দেওয়ানি যাউক, আমি গুরুর বাক্যানুসারেই কার্য করিব। ইংরাজিদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিব যে তাহারা তন্তুবায়দিগের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। গুরু ঠিক বলিয়াছেন, এ অত্যাচারের অবরোধ না করিলে আমার জীবন বৃথা। গুরু ঠিক বলিয়াছেন, এই কাপুরুষ মীরজাফরের দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া আমাকেও ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচারের সহায়তা করিতে হইতেছে। অত্যাচারী রাজা দাসকেও বাধ্য হইয়া অত্যাচার করিতে হয়। আমি কি নবাবের দেওয়ান? আমি এক প্রকার ইংরাজদিগের দেওয়ান হইয়া পড়িয়াছি। ইংরাজ কে? কয়েকজন বণিকমাত্র, তাহারা কি দেশের রাজা? তবে তাহারা কেন প্রজাদিগের উপর ঈদৃশ অত্যাচার করিবে? আমি নবাবের দেওয়ান, এ রাজ্যের প্রকৃত রাজা নবাব, একান্ত যদি নবাব আমার কথায় কর্ণপাত না করেন, দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে আমি নিজে দেওয়ানি সনন্দ লইতে চেষ্টা করিব। দেখি একবার নবাবকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত করাইতে পারি কি না। ফরাসীদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে এখনই এই দুর্বৃত্ত ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি। আমি নিশ্চয়ই ফরাসীদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইব। নবাবকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিব, কিন্তু গুরুদেব আবার ফরাসী দিগের সাহায্যপ্রার্থী হইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি বলেন, ফরাসীদিগের সাহায্য লইলে ভাল হইবে না। তাহারাও আবার ইংরাজ বণিকদিগের ন্যায় দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিব? তবে কী করিব? গুরুদেব বলেন, নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর কর। আমার কি বল আছে? গুরুদেবের এই কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি বলেন, মানসিক বল থাকিলে লোক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তিনি বলেন, নবাবের কোনো মতামতের অপেক্ষা করিতে হইবে না। দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি আবশ্যক করে না, ফরাসিদিগের সাহায্যের প্রয়োজন নাই, অত্যাচার নিবারণার্থ একবার প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইলেই কৃতকার্য হইবে। এই কথার কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। দেশের সমুদয় লোকই ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুঠিতে চাকরি পাইবার নিমিত্ত লালায়িত; তাহারা বাণিজ্যকুঠিতে চাকরি পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা কি ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে? কখনই না। তবে গুরুদেবের এই কথা অর্থ শূন্য। তিনি বলেন, তুমি প্রাণ বিসর্জন

করিতে প্রস্তুত হও, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর, দেশের শত শত লোক তোমারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। তিনি বলেন, অন্যের মুখাপেক্ষা করিও না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি একজনও আমাকে অনুসরণ করিবে না, বাঙালী জাতি ! চাকরি ইহাদিগের জীবন-সর্বস্ব ! সকলেই নবকৃষ্ণ মুন্সীর পথাবলম্বন করিবে। ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিবে।

তবে নিশ্চয় দেখিতেছি কৌশল ভিন্ন কোনো উপায় নাই। ফরাসীদিগের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, না হয় ইংরাজদিগের পরস্পরের মধ্যে চক্রান্ত করিয়া গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতে হইবে। গুরুদেব বলিলেন, এ-পথ অমলম্বন করিলে রাজনৈতিক কুহকে পড়িয়া আমাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। কিন্তু এই কৌশলের পথ ভিন্ন আর তো কোন পথ আমি দেখি না। হয় কৌশল, না হয় সংগ্রাম, কিন্তু সংগ্রামের কোনো উপায় নাই। সংগ্রাম ক্ষেত্রে বাঙালী কখনো অগ্রসর হইবে না। তবে নিশ্চয়ই কৌশলের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কী বিপদ ! গুরুদেব বারম্বার এই পথ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন ভিন্ন এই পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরুর আদেশ যে যুক্তিসঙ্গত তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু গুরুর আদেশের অর্থ বুঝি আর না-বুঝি নিশ্চয়ই এই পথে অগ্রসর হইব। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিব না। আমার এ-দেওয়ানি পদ অনেক দিন থাকিবে না, আমাকে নিশ্চয়ই ইংরাজ বণিকগণ পদচ্যুত করাইবার চেষ্টা করিবে, এ বড় অস্থায়ীপদ। আমি রাত্রি প্রভাত হইলেই সেই নিরাশ্রয় বালককে আনাইয়া স্বীয় গৃহে রাখিব। ইংরেজরা সন্দেহ করে করুক, আমি গুরুর আদেশানুসারে কার্য করিব, ইহাতে মৃত্যু হইলেও ভাল।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহারাজ নন্দকুমারের নিদ্রাবেশ হইল; তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

মনুষ্য মনে করে সংসারে উচ্চপদ হইলেই সুখ-শান্তি লাভ হয়। উচ্চপদস্থ লোকদিগকে সর্বদাই চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়। মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ণনিদ্রা হইল না। অর্ধনিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, কলিকাতা কৌন্সিলের ব্যাট্‌সন্ সাহেব কয়েকজন সৈনিক-পুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন, রাজস্ব আদায়ের হিসাবপত্র তাহার নিকটে তলব করিয়াছেন, হিসাবপত্র দৃষ্টি করিয়া হিসাবে গোল হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বন্দীস্বরূপ কলিকাতা প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইংরাজদের রেশমের কুঠির গোমস্তা রামহরি চট্টোপাধ্যায়কে নবাবের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা রামহরিকে দেওয়ানি-কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে। নবাব মীরজাফর রামহরির নিয়োগ সম্বন্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। স্বপ্নাবসানে জাগ্রত হইয়া দেখেন রজনী প্রভাত হইয়াছে। তখন গাত্রোত্থান করিয়াই মনে করিলেন গুরুর বাক্য প্রতিপালন করিব, এখনই নিরাশ্রয় বালককে আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিব।

নন্দকুমার! এই প্রভাত-প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। নিশাবসানে প্রত্যেক দিন প্রভাতসূর্য গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া মোহান্ধকারে নিমগ্ন নরনারীদিগকে বলিতেছেন, 'মানব তোমার হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য জগৎপিতা আজ আবার তোমাকে একটি নূতন সুযোগ প্রদান করিলেন। তাঁহারই আদেশে আমি সমুদিত হইয়া তোমাকে জাগ্রত করিলাম, তাঁহার আদেশ তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম।

পাঠক ও পাঠিকাগণ! চরিত্র সংশোধন করিতে হইলে, হৃদয় পবিত্র করিতে হইলে, অন্তরের মোহান্ধকার দূর করিতে হইলে, প্রত্যেক দিবসের প্রভাত-উপদেশ প্রতিপালন করিতে যত্ন কর। সংসারের চিন্তা, সংসারের কোলাহল কর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্বে জাগ্রত হইয়া প্রত্যেক দিবসের প্রভাত কী বলিতেছে তাহাই শ্রবণ কর। প্রভাত-উপদেশের উপকারিতা হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিলে তোমার হৃদয় সমুন্নত করিবার বড় আশা নাই।

মহারাজ নন্দকুমার প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া দরবারে আসিবার পূর্বেই দরবার-গৃহ শত শত লোকে পরিপূর্ণ হইল; দেওয়ান-মহল হইতে লোকারণ্যের কোলাহল শুনা যাইতে লাগল। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিগণ আপন আপন তহসিলের কাগজপত্র লইয়া দেওয়ানখানার পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশপূর্বক অগ্রে সদরের নায়েব পেস্কারদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন। হিসাব পরিষ্কারকালে সদরের আমলাগণ পাছে কোনো গোলযোগ বাধাইয়া দেয় সেই আশঙ্কায় সর্বাগ্রে ইহাদিগের প্রণামী প্রদান করিতে হয়। জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় দেয় খাজনার টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন; এখন পর্যন্ত সদরের আমলাদিগের প্রণামী বাহির হয় নাই; সুতরাং দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বসিবার হুকুম হয় নাই। নবাবসরকারের কার্যের প্রার্থী হইয়া অনেকানেক ভদ্রসন্তান দেওয়ানের সন্দর্শন লাভ করিবার প্রত্যাশায় নজর হস্তে করিয়া দেওয়ানাখানার সম্মুখস্থ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা দ্বাররক্ষক এবং দেওয়ান খানার প্যাদা মৃধাকে কিঞ্চিৎ জলপানি প্রদান করিয়া তাহাদিগের অনুগ্রহ ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। অন্যান্য সকলেই বর্তমান সময়ের মুন্সেফি এবং ডেপুটি মাজিস্টরী কার্যের উমেদারদিগের ন্যায় মস্তকে উষ্ণীষ পরিধানপূর্বক দেওয়ানখানার সম্মুখস্থ তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 'মহারাজের জয় হউক' এই বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের নিকট কাহার কিছু পাইবার আশা নাই; সুতরাং ইহাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিতে কেহ বাধা দিতেছে না। ইঁহারা গৃহে প্রবেশপূর্বক নির্দিষ্ট উচ্চস্থানে উপবেশন করিতেছেন। শত শত প্রজা আবেদনপত্র হস্তে করিয়া গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সময়ে কাশীধামের পাণ্ডাদিগের ন্যায় উকিল মোক্তারের যন্ত্রণা একেবারেই ছিল না। প্রত্যেক প্রজাই আপন আপন প্রার্থনীয় বিষয়

স্বয়ং নিবেদন করিত। কাহাকেও উকিল মোক্তারের হস্তে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইতে হইত না। যে দুই চারি টাকা ব্যয় হইত তাহা আমলাদিগেরই প্রাপ্তি ছিল। আমলাগণ অল্পে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষাধিপতির উদ্যানের সমুদয় ফলমূল সংগ্রহ করিয়া দিলেও উকিলের বৃহৎ উদর কেহ পরিপূর্ণ করিতে পারে না।

প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে দশ-বারোজন লোক পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজা নন্দকুমার দরবারগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হস্তোত্তলনপূর্বক 'মহারাজের মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অন্যান্য লোক মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন।

মহারাজ সভাসীন হইলে পণ্ডিতগণের অগ্রণী হরিদাস তর্কপঞ্চানন তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শাস্ত্রালাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও একেবারে নির্বাক রহিলেন না। পণ্ডিতদিগের এইরূপ নিয়ম নহে যে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে একে একে আপন বক্তব্য বিষয় বলেন। কথা বলিবার সময়ে তাঁহারা চারি-পাঁচজন একত্র হইয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠেন। প্রত্যেককেই আপন আপন বিদ্যা প্রকাশ করিতে হইবে। মহারাজ আবার কিছুকাল পরেই রাজকার্যে মনোনিবেশ করিবেন; সুতরাং উপস্থিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই একত্র হইয়া কথা বলিয়া উঠিতেন। ইঁহাদিগের বাগযুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে চিৎকারে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। প্রথমত ধর্মালোচনার চিৎকার আরম্ভ হইল; তারপর নীতিশাস্ত্রের কথোপকথন হইতে লাগিল। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন, 'মহারাজ! আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন সুকৌশলে রাজকার্য নির্বাহ করিতে হইবে, কৌশল ভিন্ন কোনো কার্যই সম্পন্ন হয় না—শত্রুকে পরাজয় করিতে হইলে, জনসাধারণকে করতলস্থ রাখিতে হইলে রাজগণকে বিবিধ কৌশলাবলম্বন করিতে হইবে। মন্ত্রীপ্রবর চাণক্য প্রভৃতি এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুশর্মাও হিতোপদেশের স্থানে স্থানে এই কৌশলের পথাবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, যথা—

'সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথ বা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন।'

তর্কপঞ্চাননের মুখ হইতে শ্লোকের সমুদয় অংশ উচ্চারিত হইতে-না-হইতেই বাচস্পতি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'ওহে, পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলে যে—

'বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন।
অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুদ্ধমানযোঃ।'

মহারাজ নন্দকুমার এই দুই শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! কেহ কেহ বলেন কৌশলের দ্বারা কোনো ফল লাভ হয় না।'

তৎক্ষণাৎ তর্কপঞ্চানন, বাচস্পতি, বিদ্যাবাগীশ—তিনজনেই একত্রে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

‘যথা কাল কৃত্যোদ্যোগাত্ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব ! চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ।’

পণ্ডিতদিগের এই সকল কৌশলের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবামাত্রই মহারাজ নন্দকুমারের গতরাত্রের সমুদয় কথাই স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি অবশেষে পণ্ডিতদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, ‘মহাশয় ! শাস্ত্রের মতামত কিছুই বুঝিতে পারি না। বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে রাজধর্ম পালন করিতে হইলে রাজাকে অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে হইবে, সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথাবলম্বন করিতে হইবে। নীতিশাস্ত্র বিশারদগণ যাহা কিছুই রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এক প্রকার প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার মাত্র। ন্যায়পরায়ণ রাজগণের ঈদৃশ পথাবলম্বন করা শ্রেয় নহে। তিনি আরও বলিলেন যে আর্যজাতির অধঃপতনাবস্থায় আধুনিক পণ্ডিতগণ যাহা কিছু রাজনীতি-কৌশল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তৎসমুদয়ই ধর্মবিগর্হিত প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার। সেই কৌশলের পথ অবলম্বন করিয়া যে সকল রাজগণ রাজ্যশাসন করিতেছে, তাহারা রাজানামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। দস্যুগণ যদ্রূপ বলপূর্বক অপরের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, কৌশলাবলম্বী রাজপুরুষগণ প্রকারান্তরে সেই দস্যুবৃত্তিই অনুসরণ করিতেছেন। শাস্ত্রীমহাশয় কৌশলের কথা শুনিলেই সাধুসুলভ ঘৃণা এবং বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে প্রেমরজ্জু দ্বারা তাহাদিগেকে বাঁধিতে হইবে, সে-বন্ধন কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয় না।

মহারাজের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ বলিলেন, বাপুদেব শাস্ত্রী বার্ধক্য প্রযুক্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বলিলেন, বাপুদেবের শাস্ত্রে কোনো দিনও ব্যুৎপত্তি হয় নাই; তবে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন বলিয়া আলিবর্দি খাঁ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হরিদাস তর্কপঞ্চানন বাপুদের শাস্ত্রীর নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, ‘মহারাজ ! সেই বৃদ্ধ পাগলের কোন উপদেশে কর্ণপাত করিবেন না। আলিবর্দি খাঁ ইহাকে সম্মান করিতেন বলিয়া কাসিমালি সিংহাসন প্রাপ্তির পর ইঁহারই উপদেশানুসারে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখুন, কাসিমালির কী দুরবস্থা হইয়াছে। আমি আপনাকে বিশেষ আগ্রহাতিশয়-সহকারে বলিতেছি সমুদয় রাজকার্যই কৌশলাবলম্বন-পূর্বক সম্পন্ন করিবেন।

বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রতি মহারাজ নন্দকুমারের অবিচলিত ভক্তি ছিল। সমাজের মধ্যে যদিও হরিদাস তর্কপঞ্চানন অত্যন্ত ধার্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং হরিদাস তর্কপঞ্চানন এবং অন্যান্য পণ্ডিতদিগের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রতি যে ভক্তি ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইল না। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে মনোমধ্যে সন্দেহের সঞ্চার হইল।

বস্তুত এই বিশ্বসংসারে মানবমন চতুঃপার্শ্বস্থ ঘটনা এবং বিবিধ বিষয়ের সংস্পর্শ প্রাপ্তি নিবন্ধন সর্বদাই দোলায়মান হইতেছে। সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন এই সংসারে এইরূপ দোলায়মান অবস্থা হইতে মনকে সংরক্ষণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। দোলায়মান চিত্ত মহারাজ নন্দ কুমারে আবার গতরাত্রের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাত-প্রতিজ্ঞার ঔচিত্য সম্বন্ধে মনোমধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে-প্রতিজ্ঞা তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। কৌশলের পথ অবলম্বন করিবেন বলিয়াই মনে মনে স্থির করিলেন। কিছুকাল পরে সভাস্থ পণ্ডিতগণ বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই-তিন ঘণ্টা পরে দরবার ভঙ্গ হইল। তিনি ইষ্টমন্ত্র সাধনার্থ পূজা-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে নবাব মীরজাফরের মৃত্যু হইল। ইংরাজগণ পূর্ব হইতেই মহারাজ নন্দকুমারকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং মহম্মদ রেজা খাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া মহারাজ নন্দকুমার বন্দীস্বরূপ কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন।

তিন
জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নগৃহ

আষাঢ় মাস। বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। এই সময়ে—'হা বিধাত ! কপালে কত দুঃখই ছিল'—এইরূপে স্বীয় অদৃশ্যকে তিরস্কার করিতে করিতে একটি খর্বাকৃতি কৃশা রমণী আম্র পরিপূর্ণ একখানি ডালা মস্তকে করিয়া দ্রুতপদে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জনশূন্য বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। রমণীয় বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইবে না। তাহার পরিধানে অতিশয় মলিন জীর্ণ বস্ত্র, মুখকমলে শোক, দুঃখ এবং দারিদ্র্যের চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার শরীর সম্পূর্ণ গৌরবর্ণ না হইলেও যে উত্তম শ্যামবর্ণ, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বোধ হয় বর্তমান দরিদ্র্য কিম্বা কোন মানসিক কষ্ট নিবন্ধন তাহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছে। ইহাকে দেখিলে অত্যন্ত দুর্বলা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যেরূপ দ্রুতপদে গমন করিতেছে তাহাতে কে বিশ্বাস করিতে পারে যে ইহার শরীরে বল নাই ? স্থিরক্ষেত্রে ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জা, নম্রতা এবং সরলতার ভাব সুস্পষ্টরূপে ইহার মুখকলে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল সদ্ভাব ভিন্ন এবং ইহাপেক্ষাও মধুরতর—কী এক স্বপ্নময় অপূর্ব সৌন্দর্যের ভাব ইহার মুখশ্রী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে, ইহাকে দেখিবামাত্র সহৃদয় লোকের মন মুগ্ধ হইত, ইহার প্রতি দয়া, স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্টভাবে তাহাদের হৃদয়ে উদ্রেক হইত।

রমণী যে ভগ্নবাটির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল সেই বাটি আরমানিয়ান ও ফরাসীদের সৈদাবাদের রেশমের কুঠি হইতে অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। এই সময়ে সৈদাবাদে ফরাসী এবং আরমানিয়ানদিগের রেশমের কুঠি এবং কাশিমবাজারে ইংরেজদিগের কুঠি ছিল। এখন পর্যন্তও পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয় নাই লর্ড ক্লাইব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ-বাড়িতে যে কোনো লোক বাস করতেছে তাহা বোধ হয় না। বাড়ির মধ্যে সমুদয় স্থানই বিবিধ কণ্টকলতা, সুদীর্ঘ তৃণরাশি এবং গলিত বৃক্ষপত্রে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের পদসঞ্চারের চিহ্নও নাই। গৃহের প্রাঙ্গণে পর্যন্ত বড় বড় ঘাস হইয়াছে। বিগত ছয় মাসের মধ্যে যে কেহ বাড়ির কোনো স্থান পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু ভগ্নগৃহ সকল দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে এই বাড়ি দুইখণ্ডে বিভক্ত

ছিল। সম্মুখের খণ্ডে বাহির বাড়ি ও পশ্চাৎ খণ্ডে অন্তর বাড়ি ছিল। বাহির খণ্ডে চারি পাঁচখানা কাঁচা ঘরের ভগ্নবিশিষ্ট চালা ও কাঠ স্তূপাকার হইয়া ঘরের পোতার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইখানি অপ্রশস্ত অথচ সুদীর্ঘ গৃহের মাটির ভিটা দেখিলে বোধ হয় যেন পূর্বে কোনো তন্তুবায় এই বাড়িতে বাস করিত। এই সকল দীর্ঘাকার অপ্রশস্তগৃহে বসিয়া তাহারা বস্ত্র বুনাইত। বাড়ির পশ্চাতের খণ্ডেও অন্যূন পাঁচ ছয়খানা ঘর ছিল। কিন্তু এখন প্রায় সমুদায় ঘরের চালাই মৃত্তিকাসাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র একখানি ভগ্নপ্রায় ছোট ঘরের চাল এখনও পর্যন্ত ভূমিসাৎ হয় নাই। কিন্তু সে-ঘরেও বর্ষাকালে কাহারাও বাস করিবার সাধ্য নাই। চালার ছাউনি পচিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হইলেই ঘরের মধ্যে জল পড়িতে থাকে। চতুর্দিকের বেড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এই ছোট ঘরখানির একটিমাত্র দরজা। মধ্যে কেবল একটি প্রকোষ্ঠ। দেখিবামাত্র সামান্য গৃহস্থবাড়ির রন্ধনশালা বলিয়া বোধ হয়।

রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে এই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহ মধ্য হইতে অতি কাতরকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, 'সাবিত্রী! বাছা! বড় শীত! কোথায় গিয়াছিলে?'

রমণী দ্রুতপদে দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বাবা! আজ ঘরে এক মুঠা চালও নাই। কী করিয়া যে তোমাকে পথ্য দিব জানি না। সৈদাবাদের বাজারে কয়েকটা আম লইয়া যাইতেছিলাম। কাহারও নিকটে এই আম কয়েকটা বেচিতে পারিলে কিছু চাউল কিনিতে পারিতাম। কিন্তু পথে বড় বৃষ্টি আসিল। তোমার যেরূপ জ্বর হইয়াছে তাহাতে এ-বৃষ্টিতে ভিজিলে তো আর বাঁচিবে না, তাই ভাবিয়া বড় দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াছি। তুমি উঠ, আমার কোলের মধ্যে মাথা রাখিয়া পা গুটাইয়া শুইয়া থাক।'

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'হা ঈশ্বর! আমার বাছার কপালে এত দুঃখ ছিল! আমি কিছু খাইতে চাই না। বড় শী—ই—ত।'

ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। একখানি দরমার উপর একখান ছিন্ন কন্থা বিস্তৃত। বৃদ্ধ তাহার উপর শুইয়াছিল। রমণী বৃদ্ধকে ধরিয়া উঠাইয়া ঘরের যে-স্থানে জল পড়ে নাই সেই স্থানে বসাইল। কাঁথাসুদ্ধ দরমাখানি উঠাইয়া ঘরের এককোণে রাখিয়া দিল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ বসিতে পারিল না। আপনার মস্তক কন্যার ক্রোড়ে রাখিয়া এবং হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া মৃত্তিকাতে শুইয়া পড়িল। কন্যার নিজের পরিধেয় বস্ত্রও একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। পিতার শীত নিবারণার্থ তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল। শীত নিবারণার্থে আর দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না।

কিছুকাল পরে বৃষ্টি থামিল। সায়ংকাল উপস্থিত। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। রমণী সংমার্জনী লইয়া ঘরের জল ঝাঁটাইয়া ফেলিতে লাগিল। পুনর্বার দরমাখানি পাতিয়া তাহার উপর বৃদ্ধকে শোয়াইয়া রাখিল। ঘরে তৈল নাই। প্রদীপ জ্বালিতে পারিল না। বাহিরে

ভগ্নগৃহের চালার খড়গুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে। অতিকষ্টে বাড়ির এদিক-ওদিক সঞ্চরণপূর্বক রমণী কয়েকখানি শুষ্ক কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া, পিতার শয্যার পার্শ্বে আগুন জ্বালিল এবং নিজের ও পিতার সিক্ত বস্ত্র অগ্নির উত্তাপে শুকাইতে লাগিল।

গৃহের এক কোণে একটি চুল্লি রহিয়াছে। সেখানে জিনিসপত্রের মধ্যে মাত্র দুইটি মাটির হাঁড়ি, দুইটি মাটির কলসী। ধাতুনির্মিত জিনিসের মধ্যে কেবল একটি পিতলের ঘটি। ঘরে একমুষ্টি মাত্র চাউল আছে। আর কিছুই নাই। পিতাকে কিরূপে পথ্য দিবে রমণী তাহাই ভাবিতেছে। তাহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রু পতিত হইতেছে। প্রাতেও ঘরে অধিক চাউল ছিল না। তন্তুবায় প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ গৃহস্থের স্ত্রীলোকদিগের একটি বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, চাউল রাখিবার পাত্র একেবারে শূন্য করিতে নাই। সেই জন্য প্রাতে একমুষ্টি মাত্র চাউল পাত্রে রাখিয়া আর যে দুই-এক মুষ্টি চাউল ছিল, তাহা দ্বারা পিতাকে চারটি অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। নিজে সমস্ত দিন কিছুই আহার করে নাই। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘরে যে এক-মুষ্টি চাউল ছিল তাহা রন্ধন করিয়া এ বেলাও পিতাকে পথ্য দিবে বলিয়া স্থির করিল। চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়া পিতার শয্যার অপর পার্শ্বে বসিয়া ভাত রান্ধিতে আরম্ভ করিল।

কিছু কাল পরে অকস্মাৎ গৃহের বাহিরে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। দেখিতে-না-দেখিতে চারি-পাঁচজন লোক এই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের অগ্রে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার নাম রামহরি চট্টোপাধ্যায়। ইনি ইংরেজদিগের কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির গোমস্তা। সাবিত্রী ইহাকে পূর্ব হইতে চিনিত। ইহার সঙ্গের অপর তিন-চারি জন লোক কুঠির প্যাদা।

ইহাদিগকে দেখিয়া যুবতী চিৎকার করিয়া উঠিল। ভয় ও ত্রাসে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

রামহরি চট্টোপাধ্যায়কে কাশিমবাজারের কুঠিতে কেহ কেহ রামহরিবাবু বলিয়া ডাকিত, কিন্তু কুঠির সাহেবগণ কেবল 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিত। দুই-একজন নবাগত ইংরেজ 'বাবু' না বলিয়া কখন কখন 'বেবুন' বলিত।

রামহরি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুবতীর হাত ধরিয়া বলিল, 'চল, তোকে কাশিমবাজারের কুঠিতে যাইতে হইবে।' যুবতী তাহার পদতলে পড়িয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। অতি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'চাটুয্যে ঠাকুর, আপনি আমার পিতা, আমার সংসারে আর কেহ নাই, আমাকে রক্ষা করুন।'

রামহরি। আজ তোর ও সকল কথা শুনিব না; হয় চল, নহিলে আমার সঙ্গের লোকেরা তোর ঘাড় ধরিয়া লইয়া যাইবে।

সাবিত্রী! ঠাকুর মশাই! বাবা ঠাকুর, তুমি আমার ধর্মের বাপ।

রামহরি। চুপ কর। সরকারি কাজের সময় ও সব বাপ-ভাই ভাল লাগে না। তোর

নিজের ভাল চাস তো আমার সঙ্গে চল। নহিলে তোর ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাব। আজ বাপু তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। আজ তিনদিন পর্যন্ত তোমাকে কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছি, কিছুতেই তোমার মন উঠে না।

যুবতী নিরাশ হইল। বুঝিল যে এ কুলাঙ্গার ব্রাহ্মণসন্তান তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না; বুঝিল যে এ নরপিশাচের অন্তরে দয়ার লেশমাত্রও নাই। তখন কোপানলে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগল, হৃদয়াবেগ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'পাপিষ্ঠ, তুই চক্রান্ত করিয়া আমাদের সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি লুটিয়া নিয়াছিস, আমার ভাই ও স্বামীকে জেলে দিয়াছিস, এখন আবার আমার ধর্ম নষ্ট করিতে চাস। আমার সব গিয়াছে—ভাই গিয়াছে—মা গিয়াছে—স্বামী গিয়াছে—এখন ধর্ম বিসর্জন করিব? এখনই আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা দূর করিব।' এই বলিয়া যুবতী ক্ষিপ্তের ন্যায় সম্মুখস্থিত একখানি কাং হাতে করিয়া সজোরে আপন ললাটে আঘাত করিতে লাগিল। রামহরি অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল।

যুবতীর আর্তনাদ তাহার পিতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ আজকাল রোগে, শোকে এবং অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়েই অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এতক্ষণ সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নিমীলিত নেত্রে পড়িয়াছিল। কন্যার আর্তনাদ শ্রবণে জাগিয়া উঠিল। রামহরি তাহার কন্যার সম্বন্ধে যে-যে চক্রান্ত করিয়াছিল তাহা সে পূর্ব দিবস সাবিত্রীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিল।

সে বুঝিতে পারিল যে, রামহরি তাহার কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তখন তাহার মৃত শরীরে যেন সহসা নববলের সঞ্চার হইল। প্রায় একমাস পর্যন্ত তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! হৃদয়াবেগ সময়ে সময়ে মৃত শরীরেও বল প্রদান করে। সে সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হস্ত প্রসারণ পূর্বক রামহরিকে ধরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে কাঁপতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল এবং একেবারে স্পন্দনরহিত হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিল। রামহরির সঙ্গের লোক সাবিত্রীকে টানিতে টানিতে ঘরের বাহির করিবামাত্র সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সেই অচৈতন্যাবস্থায় দুজন লোক তাহাকে স্কন্ধে করিয়া কাশিমবাজারে ইংরেজদিগের রেশমের কুঠির দিকে লইয়া চলিল।

চার

কাশিমবাজারের রেশমের কুঠি

পাঠক ও পাঠিকাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কাশিমবাজারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু খ্রিস্টীয় অব্দের ১৭৬৬ সালে, এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার সময় কাশিমবাজারের যেরূপ গৌরব ও সমৃদ্ধি ছিল এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। কাশিমবাজারের সকল গৌরব, সকল সমৃদ্ধি বিলোপ হইয়াছে—জঙ্গলাবৃত জনশূন্য সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি পড়িয়া রহিয়াছে।

অহোরাত্র লোকারণ্যে পরিপূর্ণ, বঙ্গের প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিগণিত ভাগীরথী, গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীত্রয় পরিবেষ্টিত তৎসাময়িক কাশিমবাজারের প্রকৃত গৌরব আজ কল্পনাকেও পরাস্ত করিতেছে। নানা দিগ্‌দেশাগত অসংখ্য অসংখ্য বণিক বাণিজ্যার্থ এখানে সমবেত হইতেছে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আরমানিয়ান বণিকদিগের সৌধ অট্টালিকা, ভাগীরথীবক্ষে ভাসমান অসংখ্য অর্ণবপোত, স্থানে স্থানে রাশিকৃত স্তূপাকার পণ্যদ্রব্য, নদীপার্শ্বস্থ মালের ওদাম, বহুসংখ্যক রেশমের গৃহ; দেশীয় তন্তুবায়দিগের সারি সারি দোকান; দোকানের সম্মুখস্থিত দোলায়মান চিত্র-বিচিত্র রেশমী বস্ত্র, সর্বদাই এই স্থানটিকে অপূর্ব শোভায় পরিশোভিত করিতেছে। লোকারণ্যের কোলাহল, দালালগণের দ্রুতপদে গমনাগমন, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিলাস-প্রিয় লোকদিগের সুচারু পরিচ্ছদ ও বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য, অর্থলোলুপ বণিকদিগের অর্থোপার্জনার্থ বিবিধ চেষ্টা এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার, মানব মনের ঘোর বিষয়াসক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মানুষ অর্থের নিমিত্ত যে সকল প্রকার কষ্ট, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে কখনো পরান্মুখ হয় না, তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

নিশীথে নদীপার্শ্বস্থ অট্টালিকাস্থিত দীপালোক দূরস্থিত দর্শকের নিকট অগণ্য তারকারাশির ন্যায় বোধ হইতেছে। সন্ধ্যার পর ইংরেজদিগের ক্যান্টনমেন্টে ইংরাজি বাদ্য, পার্শ্ববর্তী গ্রামস্থ তন্তুবায় ও অন্যান্য বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী লোকদিগের গৃহের খোল-করতালের ধ্বনি, ভাগীরথীর কল কল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব সুমধুর সঙ্গীতে সর্বস্থান পরিপূর্ণ করিতেছে, শ্রোতার কর্ণে অজস্র সুধাবর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু এই সুখ-সামগ্রী পরিপূর্ণ স্থান, এই মনোহর দৃশ্য, কেন শত বৎসর গত হইতে -না-হইতে বিলোপ হইল? কুকার্যরতা রমণীর যৌবনের ন্যায় কাশিমবাজারের গৌরব এত অল্প সময় মধ্যে কেন বিলয় প্রাপ্ত হইল? পরমাসুন্দরী কুলটা রমণীগণ যৌবনাবসানে

যদ্রূপ সর্বপ্রকার সৌন্দর্য বিবর্জিত হইয়া কুকার্যসম্ভূত রোগাদি নিবন্ধন ঘোর বিকটাকৃতি প্রাপ্ত হয়; বর্তমান সময়ে কাশিমবাজারের সেই অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছে। কেনই বা হইবে না? কাশিমবাজার কি পরম পবিত্র কাশীধাম সদৃশ তীর্থ স্থান ছিল? এখানে কি সকল দেশীয় সাধু-সজ্জনগণ সৎসঙ্গ লাভ করিবার নিমিত্ত, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন? প্রভাতে কাশীধামে গঙ্গাতীরে বসিয়া ধর্মার্থিগণ যদ্রূপ নানাছন্দে আর্যদিগের পরম পবিত্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এখানে কি কখনো একদিনও ভাগীরথীতীরে তেমন কোনো ধর্মশাস্ত্র, ধর্মের কথা সমালোচিত হইয়াছে? এখানে ধর্মের লেশ-মাত্রও ছিল না, কেবল কে কাহাকে প্রতারণা করিয়া দুই পয়সা লাভ করিবে, তাহারই চেষ্টা ছিল।

কি নদী, কি সাগর, কি গ্রাম, কি নগর, ধর্মানুষ্ঠানের পবিত্র সংস্পর্শে সকলের মধ্যেই অমরত্ব প্রদান করিতে পারে। যে কোনো বস্তু কিম্বা স্থানের সঙ্গে ধর্ম ও পবিত্রতা সম্বন্ধীয় ভাব, সংস্কার বা ঘটনা সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই বস্তু, সেই স্থান ধর্ম সংস্পর্শে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। পরম পবিত্রা সাধ্বী রমণীগণ যদ্রূপ যৌবনাবসানেও কুকার্যরতা কুলটাদিগের ন্যায় বিকটাকৃতি প্রাপ্ত হয়েন না, বরং যৌবনাবসানে সেই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় স্নেহ, দয়া, পবিত্রতা বিশেষরূপে তাঁহাদের মুখকমলে প্রভাসিত হয়, পরমারাধ্যা দেবকন্যা বলিয়া তাঁহারা সাধারণ্যে সম্পূজিত হইতে থাকেন, সাধু ও মহর্ষিদিগের সম্মিলন-স্থান সেই প্রকার কখনো সৌন্দর্য-বিবর্জিত হয় না। সে-সকল স্থানের মাহাত্ম্য কখনো হ্রাস হয় না।

এই সকল স্থান অমরত্ব লাভ করিয়া কালের আক্রমণকে সর্বদাই পরাস্ত করিতেছে।

কিন্তু পাঠক, কাশিমবাজারের বিলোপ—কাশিমবাজারের বর্তমান অবস্থা তোমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? কাশিমবাজারের এই অধঃপতন কেবল বেশবিন্যাস পরিপূর্ণ ধর্মহীন মানব জীবনের অসারতাই প্রতিপাদন করিতেছে। বঙ্গীয় পাঠিকা, তুমি কাশিমবাজারের বর্তমান দুরবস্থা দেখিয়া কী শিক্ষা পাইলে? যদ্রূপ পিতা এবং পতিহীনা বঙ্গীয় বাল-বিধাব স্বামীবিয়োগান্তর স্বামীর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইবামাত্র শত শত ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক তাহার সম্পত্তি ও ধর্মাপহরণ করিবার মানসে তাহাকে কুপথে পরিচালনা করে এবং অবশেষে তাহার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া যৌবনাবসানে তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়া ফেলিয়া যায়, সেইরূপ রাজশাসনশূন্য দেশে, দেশীয় নবাব এবং স্বদেশীয় লোক কর্তৃক অরক্ষিতা, অতুল ঐশ্বর্যশালিনী কাশিমবাজারের ঐশ্বর্য লোভে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় অর্থলোভী বণিকগণ তাহার বক্ষে সমবেত হইয়াছিল, নানাবিধ কুকার্য, পাপ ও অত্যাচারের দ্বারা তাহার বক্ষ কলঙ্কিত করিয়া, তাহার সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া, তাহাকে ভিখারিণী করিয়া চলিয়া গেল। পবিত্রসলিলা ভাগীরথী গঙ্গা তাহাকে কলঙ্কিনী মনে করিয়া তাহার সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। কাশিমবাজার গঙ্গাশূন্য হইয়া রহিল।

কাশিমবাজার ১৭৬৬ খ্রিঃ অব্দের জুলাই মাসে, যখন লোকারণ্যে পরিপূর্ণ; যখন অশেষবিধ পাপ ও অত্যাচার এখানে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন রাত্র আট ঘটিকার সময় বঙ্গ-কুলাঙ্গার রামহরির সঙ্গী দুজন লোক সাবিত্রীকে স্কন্ধে করিয়া কাশিমবাজারের ইংরেজদিগের রেশমের কুঠির নিকট উপস্থিত হইল।

রেশমের কুঠির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি একতলা দালান। সেই একতলা গৃহে কুঠির আসিস্টাণ্ট ডব্‌সন্ সাহেব বাস করিতেন। সাবিত্রীকে আনিয়া, পাষণ্ডগণ ডব্‌সন্ সাহেবের দালানের বারান্দায় রাখিল। সাবিত্রী এ পর্যন্ত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় ছিল, কাশিমবাজারে পৌঁছিবামাত্র লোকারণ্যের কোলাহলে সে জাগ্রত হইল। জাগিয়া দেখিতে পাইল, একটি দালানের বারান্দায় সে পড়িয়া রহিয়াছে—একজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তখন ভয় ও ত্রাসে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে বার-বার বলিতে লাগিল, 'হে বিপদভঞ্জন হরি, এ অনাথাকে তুমি রক্ষা কর।'

রেশমের কুঠির গোমস্তা রামহরিবাবু যে অভিপ্রায়ে সাবিত্রীকে আনিয়াছিল এবং যেরূপ সাবিত্রীর বৃদ্ধ পিতার এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগের নিকট বলিতে হইলে অগ্রে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে।

পাঠক ও পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে যে, মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। আমরাও অস্বীকার করি না যে, মুসলমান রাজগণ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে যে প্রজাদিগকে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অত্যাচারের মধ্যে কোনো কৌশল পরিলক্ষিত হইত না। তাহাদের অত্যাচার এক প্রকার অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতা মাত্র। কৌশলপরিপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ অত্যাচার, পণ্য-দ্রব্যের একাধিকার সংস্থাপনপূর্বক বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত প্রদান, নানাবিধ চক্রান্ত দ্বারা প্রজাসাধারণের অর্থশোষণ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা মুসলমান রাজত্ব কখনো কলঙ্কিত হয় নাই। তাহাদের অসভ্যোচিত কোপানলে পড়িয়া সময়ে সময়ে অনেকানেক দেশীয় ধনী ও জমিদারদিগকে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইয়াছে, জাতিভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে; তাহাদের অদম্য ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিতৃপ্ত্যর্থ সময়ে সময়ে তাহারা কত কত ভদ্রমহিলার প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে। কিন্তু অর্থহীন শ্রমোপজীবীদিগকে, দুর্বল বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণকে তাহাদের অত্যাচারে কখনো নিপীড়িত হইতে হয় নাই। ইহাদিগের প্রতি অত্যাচারের কথা দূরে থাকুক, অনেকানেক তন্তুবায় ও শিল্পিগণ আপন আপন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া সময়ে সময়ে পুরস্কারস্বরূপ লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর যখন বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হইল, যে সময় হইতে মুর্শিদাবাদের নবাব ইংরেজের করতলস্থ হইয়া পড়িলেন, যখন

কাপুরুষ মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৎসাময়িক অর্থলোভী কর্মচারীদের নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন হইতেই দেশীয় বাণিজ্যের মূলে কুঠারঘাত পড়িল, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপিত হইল, দিন দিন দেশীয় বণিকদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণ ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক আপন আপন গ্রাম ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির সময়ে স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, ভবিষ্যতে এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার তাহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইবে। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বঙ্গের সুবাদার হইলে, ইংরাজগণ তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, 'আপনি আমাদের বাণিজ্য-কুঠির সাহেব ও গোমস্তাদিগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু অন্য কেহ তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আসিলে,আপনাকে তাহাদের সহায়তা করিতে হইবে।' কাপুরুষ মীরজাফর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; ইংরেজদিগের বাণিজ্য-কুঠির সাহেব ও গোমস্তাগণ, তন্তুবায় প্রভৃতি দেশীয় সকল শ্রেণীস্থ শিল্পিদিগের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল।* বিশেষত এই সময়ে ইংলণ্ডের ভদ্রবংশীয়ণ ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইতেন না। ইংলণ্ডীয় সমাজের যে সকল নীচাশয় অর্থলোলুপদিগের স্বদেশে অন্ন জুটিত না, যাহারা সর্বপ্রকার কুকার্যানুষ্ঠানেই রত হইত, তাহারাই অর্থলোভে এ দেশে আগমন করিত; এবং অর্থসঞ্চয়ার্থ কোনো প্রকার কুকার্য করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।** ইহারা দেশীয় তন্তুবায়দিগকে বলপূর্বক বাধ্য করিয়া দাদন দিত (অর্থাৎ অগ্রিম টাকা প্রদান করিত)। তন্তুবায়দিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকে এইরূপ টাকা গ্রহণ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়মধ্যে নির্দিষ্টসংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে বলিয়া মুচলেকা লিখিয়া দিতে হইত।*** কিন্তু সেই সকল বস্ত্রের মূল্য নিরূপণকালে ইংরাজগণ কিম্বা তাহাদের কুঠির গোমস্তাগণ যে বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য একশত টাকা হইবে তাহার দাম পঞ্চাশ টাকার অধিক দিতে সম্মত হইতেন না। নিরাশ্রয় তন্তুবায়দিগের এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকার পাইবার কোন আশা ছিল না। দেশের নবাব মীরজাফর। তিনি ইংরাজগণের বাণিজ্যকুঠির সাহেব ও গোমস্তাগণের কার্য-কর্মে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তন্তুবায়গণ নির্বাক হইয়া এই অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। এই সময়ে কাশিমবাজারে ফরাসী, ওলন্দাজ ও আরমানিয়ানদিগেরও রেশমের কুঠি ছিল। পূর্বে তন্তুবায়গণ তাহাদিগের নিকটও বস্ত্র বিক্রয় করিত। কিন্তু এখন ইংরেজগণ তন্তুবায়দিগকে ফরাসী কি ওলন্দাজদিগের

---

* Vide note (1) in the appendix.

** Vide note (2) in the appendix.

*** Vide note (3) in the appendix.

নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। কোনো ব্যক্তি ইংরেজদিগের নিষেধ অমান্য করিয়া ফরাসী কিম্বা ওলন্দাজদিগের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিলে ইংরেজদিগের ফেক্টরীর সাহেব ও গোমস্তাগণ তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান করিতেন।* কখনো কখনো তাহাদের বাড়ি লুট করিতেন, কখনো কখনো তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকেও অপমানিত করিতেন। এইরূপে অনেকানেক তাঁতিকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইল। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্বক বৈরাগী হইতে লাগিল এবং তন্তুবায়ের ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ করিল।

ফরাসী কিম্বা ওলন্দাজদিগের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিলে তন্তুবায়গণ অনায়াসে উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারিত; কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদিগের ভয়ে তাহারা কখনো অন্যত্র বস্ত্র বিক্রয় করিত না। আবার ইংরেজদিগের কুঠির বাঙালী গোমস্তাগণ এবং দেশীয় অন্যান্য ধূর্ত লোকেরা তাঁতিদিগের নিকট হইতে টাকা লইবার অভিপ্রায়ে, তাহারা ফরাসী কিম্বা ওলন্দাজদিগের নিকট গোপনে বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত। কুঠির সাহেবগণ এইরূপ অভিযোগ শ্রবণ করিলেই তাহার সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সকল অভিযুক্তের বাড়িতে সিপাহী প্রেরণ করিতেন। সিপাহীগণ তাহাদের বাড়ি লুঠ করিত, তাহাদিগের পরিবারগণের ধর্ম নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিত।

কাশিমবাজারের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক তন্তুবায় বাস করিত। কিন্তু এরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরকাশিমের সিংহাসনচ্যুতির পর ১৭৬৬ সালে এই প্রদেশ হইতে এক রাত্রে সাত শত তন্তুবায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল।

সাবিত্রীর পিতা সভারাম বসাক অতি প্রসিদ্ধ তন্তুবায়। তাঁতিদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। যখন আলিবর্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সুবাদার ছিলেন, তখন সভারাম একখানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া নজরস্বরূপ সুবাদার বাহাদুরকে প্রদান করে আলিবর্দি খাঁ ইহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ শত বিঘা জমি ইহাকে লাখেরাজ দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবারের সমুদায় পরিধেয় বস্ত্র সভারাম প্রস্তুত করিয়া দিত এবং সময় সময় শেঠদিগের নিকট হইতে বিবাহ, নামকরণ ইত্যাদি উপলক্ষে হাজার দুই হাজার টাকা পুরস্কার পাইত। এই প্রকারে সভারাম বিলক্ষণ ধন সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু পাঁচ শত বিঘা জমি লাখেরাজ পাইবার পর সে সাধারণ বস্ত্রব্যবসা প্রায় ছাড়িয়া দিল; কেবল শেঠ পরিবারের এবং নবাব বাড়ির লোকের ব্যবহারের নিমিত্ত বৎসর বৎসর অল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিত এবং তাহাতেই বৎসরে দুই-তিন হাজার টাকা লাভ করিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

---

* Vide note (4) in the appendix.

দেওয়ানি প্রাপ্তির পর কাশিমবাজারের ইংরেজদিগের রেশমের কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব শুনিতে পাইলেন যে, সভারাম অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, সুতরাং সভারামের প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সভারাম নিজে এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তাহার আর চলৎশক্তি নাই। তাহার তিন পুত্র কালাচাঁদ বসাক, গোরাচাঁদ বসাক এবং রায়চাঁদ বসাক আর জামাতা নবীন পালই তাহার সমুদয় বাণিজ্য-ব্যবসা চালাইত। ইংরেজদিগের কুঠির গোমস্তা রামহরি, দালাল প্যাদা পাইক এবং সিপাহী সঙ্গে করিয়া সভারামের বাড়ি আসিয়া তাহার জামাতা ও পুত্রদিগের এক শত টাকা দাদন গ্রহণ করিতে বলিল। সভারামের পুত্রগণ ও জামাতা দাদন গ্রহণ করিতে অসমস্ত হইল। কিন্তু গোমস্তা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। দাদনি টাকা হাতে দিয়া চুক্তিপত্রে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইল। এই চুক্তিপত্রে কী লিখিত ছিল, তাহা সভারামের পুত্রত্রয় কিম্বা জামাতাকে একবার পাঠ করিয়াও শুনাইল না। গোমস্তা দাদনের টাকা দিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া কুঠিতে চলিয়া গেল। কিন্তু এই চুক্তিপত্রে এইরূপ অঙ্গীকার ছিল যে দুই মাসের মধ্যে দুই হাজার রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে। দুই মাস গত হইবামাত্র কুঠিতে সভারামের পুত্রত্রয় ও জামাতার তলব হইল। অধ্যক্ষ সাহেব তাহাদের অঙ্গীকৃত দুই হাজার বস্ত্র দিতে বলিলেন। তাহারা আশ্চর্য হইয়া বলিল, ‘ধর্মাবতার! দুই মাসের মধ্যে কি কেহ এতগুলি বস্ত্র বুনিতে পারে?’

কিন্তু কুঠির গোমস্তা রামহরি চট্টোপাধ্যায় সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ‘ধর্মাবতার! ইহারা বড় বদলোক, সমুদয় বস্ত্র সৈদাবাদে আরমানি ও ফরাসী বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। দুই হাজার কেন, দুই মাসে ইহারা পাঁচ হাজার বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে।’ সাহেব হুকুম করিলেন, ‘ইহাদের চারিজনকে কয়েদ রাখ, আর ইহাদের বাড়ির সমুদয় মালামাল ক্রোক এবং নীলাম করাইয়া দাদনি টাকা আদায় কর।’ রামহরি জানিত যে, সভারামের ঘরে অনেক টাকা আছে। সে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আজ ইহাদের বাড়ি লুট করিয়া অনেক টাকা লাভ করিতে পারিবে। তিন বার হরিনাম স্মরণপূর্বক প্যাদা ও সিপাহী সঙ্গে করিয়া সে মনের আনন্দে সভারামের বাড়ি লুণ্ঠন করিতে চলিল। এদিকে সভারামের একজন আত্মীয় লোক সিপাহীদিগের পৌছিবার দুই-তিন মিনিট পূর্বে সভারামের স্ত্রীকে এই বিপদের সংবাদ দিল। এই সময় ইংরেজদিগের কুঠির সিপাহীর নাম শুনিলে, ভয় ও ত্রাসে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইত। সভারামের স্ত্রী আপন পুত্রবধূগণ ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। সাবিত্রী তাহার চলনশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতাকে ক্রোড়ে করিয়া এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু একস্থানে সকলে পলাইলে পাছে ধরা পড়ে, এই আশঙ্কায় সভারামের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ সৈদাবাদের আরমনি বণিকদিগের কুঠির দিকে চলিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবামাত্র দেখে যে গোমস্তা সিপাহিগণ সহ তাহাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা ভয় ও ত্রাসে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। সিপাহিগণও তাহাদিগকে

পলায়নপর মনে করিয়া তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। অনাথা স্ত্রীলোকগণ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগীরথীর বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়ল। পবিত্রসলিলা ভাগীরথী তাহাদিগের সংসারের সকল যন্ত্রণা দূর করিলেন, অনাথা কন্যাগণকে স্বীয় বক্ষে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় কুলাঙ্গার রামহরি, কি সেই দুর্বৃত্ত সিপাহিগণ, অথবা অর্থলোলুপ ইংরেজ বণিক! এখন আর ইহাদের প্রতি কে অত্যাচার করিতে পারে? এ-সংসারের অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে ইহারা নিষ্কৃতি পাইয়া, অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অমৃতক্রোড়ে অনন্তকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করিল!

গোমস্তাবাবু সিপাহিগণকে সঙ্গে করিয়া সভারামের শূন্যবাড়িতে প্রবেশ করিল। ঘরের সমুদয় জিনিসপত্র বাহির করিয়া বিক্রয়ার্থ কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রেরণ করিল। কিন্তু সভারামের গুপ্তধন কোথায় রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাইল না। এই সময় দেশীয় লোকেরা ঘরের মধ্যে গর্ত করিয়া মাটির নিচে টাকা পুঁতিয়া রাখিত। সভারামের সমুদায় ঘরগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও কোথায় যে টাকা রহিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারল না। ইংরেজদিগের কুঠির গোমস্তা এবং সিপাহিগণ এই জন্যই কোনো ব্যক্তির বাড়ি লুট করিতে হইলে প্রথম তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে আটক করিয়া রাখিত; মনে করিত যে, স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার ও অপমান করিতে আরম্ভ করিলেই তাহারা গুপ্তধন রাখিবার স্থান দেখাইয়া দিবে। যে সকল হতভাগিনী স্ত্রীলোক ইহাদিগের হস্তে পতিত হইত, তাহাদিগের প্রতি ইহারা যেরূপ ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিত, তাহা স্মরণ হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সেই সকল অত্যাচারের নাম উল্লেখ করিয়া আমরা ভাষাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। সেই সকল অত্যাচারের মধ্যে ঘোর অশ্লীলতা রহিয়াছে, সভ্যতা ও সুরুচির সীমা লঙ্ঘন না করিয়া কোনোক্রমেই তাহা বর্ণনা করা যায় না।

সমস্ত দিন সভারামের সমুদয় গৃহের মৃত্তিকা খনন করিয়াও রামহরি গুপ্তধনের কোনো অনুসন্ধান পাইল না। সে তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, সভারামের পুত্রত্রয় এবং জামাতাকে প্রহার করিলে তাহারা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের ঠিকানা বলিয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারে চোটে গোরাচাঁদ ও রামচাঁদ মানবলীলা সম্বরণ করিয়া অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কালাচাঁদ বসাক ও নবীন পাল চুক্তিভঙ্গের অপরাধে কলিকাতা জেলে প্রেরিত হইল।

এদিকে সাবিত্রী পিতাকে লইয়া দুই দিন দুই রাত্রি অনাহারে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সাবিত্রী বাল্যকাল হইতে পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং যারপরনাই ভালবাসিত। পিতাই সাবিত্রীর জীবনসর্বস্ব, পিতাই তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তজ্জন্য সভরাম সাবিত্রীকে বিবাহ দিবার সময়ে, তাহাকে কখনো শ্বশুরালয়ে না যাইতে হয়, সেই অভিপ্রায়ে নবীন পালকে ঘর-জামাতা করিয়া রাখিয়াছিল।

দুই দিন দুই রাত্রের পর সাবিত্রী পিতাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু সে কখনো জানে না—তাহার মাতা ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতাদিগের কী অবস্থা হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে আপনাদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে আসিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সমুদয় গৃহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায় সকল গৃহের ভিটায়ই স্থানে স্থানে খোদিত গর্ত রহিয়াছে। ঘরে এক মুষ্টি অন্ন নাই। দুই দিন দুই রাত্র অনাহারে কালযাপন করিয়াছে। কিরূপে বৃদ্ধ পিতাকে দুইটি অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল যে, পলায়নকালে তাহার গায়ে যে দুই-একখান অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সৈদাবাদের বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিবে। এই ভাবিয়া পিতাকে একাকী গৃহে রাখিয়া সে সৈদাবাদ অভিমুখে গমন করিল। যাইতে যাইতে পথে সৈদাবাদের আরমানি বণিক আরাটুন সাহেবের মেমের আয়ার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। এই আয়ার নাম বদরন্নেসা। এই স্ত্রীলোকটি আরাটুন সাহেবের মেমের নিমিত্ত বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পূর্বে বরাবর সভারামের বাড়ি আসিত। সুতরাং বদরন্নেসার সহিত সভারামের পরিবারস্থ সমুদয় স্ত্রীলোকের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। বদরন্নেসা সাবিত্রীকে দেখিবাবাত্র তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাবিত্রীও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মা এবং ভাইবৌদের কী হইয়াছে বলিতে পার? তাহারা কি তোমাদের কুঠিতে পলাইয়া আছে?'

বদরন্নেসা ভগ্নস্বরে বলিল, 'কাল তোমার মাতা ও ভ্রাতৃবধূদের লাশ ওই নদীতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে তাহাদের তিনজনের লাশ দেখিয়াছি। তোমার ভাই রায়চাঁদ ও গোরাচাঁদকে প্রহার করিতে করিতে সাহেবের লোকেরা মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের লাশ মেথরগণ নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে। তোমার স্বামীকে এবং জ্যেষ্ঠ ভাইকে কলিকাতার জেলে পাঠাইয়াছে।'

এই কথা শুনিবামাত্র সাবিত্রী শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বদরন্নেসা তাহার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া রাস্তার পার্শ্বে বসিল। অনেকক্ষণ পর সে চেতনা লাভ করিল এবং আপন শিরে কারাঘাতপূর্বক আবার কাঁদিতে লাগিল। তখন বদরন্নেসা তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, 'এই প্রকাশ্য রাস্তায় বসিয়া তুমি কাঁদিয়া অনর্থক গোল করিও না। তোমাদের ঘরের গুপ্তধন নাকি কিছুই পায় নাই। হয়ত তোমাকে ধরিয়া নিয়া গুপ্তধনের অনুসন্ধান লইবার চেষ্টা করিতে পারে।' কিন্তু শোকে সাবিত্রীর কর্ণ বধির হইয়াছে। বদরন্নেসা কী বলিতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। পরে বদরন্নেসা তাহাকে টানিতে টানিতে পুনরায় তাহাদের সেই গৃহে লইয়া গেল। তাহার মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। সাবিত্রী সময় সময় অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার গন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। বদরন্নেসা ভাবিল যে, কিছু আহার না করিলে ইহার শরীর আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে, শোকে মরিয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সে তখন সাবিত্রীকে তাহার পিতার পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখিয়া

পুনরায় সে অরাটুন সাহেবের কুঠিতে আসিল। আরাটুন সাহেবের মেমের নিকট আদ্যোপান্ত সমু বর্ণনা করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীজাতিসুলভ করুণ হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই-তিন টাকার চাউল, ডাইল ইত্যাদি আহারীয় দ্রব্য তিনি-চারিজন লোক দ্বারা বদরন্নেসাকে সঙ্গে দিয়া সভারামের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন! কিন্তু সাবিত্রী কি এখন রন্ধন করিতে পারে, না আহার করিতে পারে? শোকে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বদরন্নেসা বারম্বার প্রবোধ দিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ শোকের সময় কোনো প্রবোধবাক্যই হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সভারাম এখন পর্যন্ত কিছুই শুনে নাই। কিছুকাল পরে সে বলিল, 'সাবিত্রী, গলা শুকাইয়া গিয়াছে এক ফোঁটা জল।' তখন আবার পিতার দুরবস্থা দেখিয়া সাবিত্রীর হৃদয় আরও শোকে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে উঠিয়া পিতাকে একটু জল দিয়া পিতার নিমিত্ত ভাত রাঁধিতে আরম্ভ করিল। অন্ন প্রস্তুত হইলে পিতাকে আহার করাইল। কিন্তু নিজে কিছুই খাইল না। বদরন্নেসা মুসলমান। সে সাবিত্রীকে ধরিয়া তাহার মুখে অন্ন দিতে পারে না। ভাত রাঁধিবার সময় বদরন্নেসা স্থানান্তরে যাইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু বারম্বার সাবিত্রীকে ভাত খাইতে বলিতে লাগিল। সাবিত্রী কোনো ক্রমে কিছু খাইতে চাহে না। পরে বদরন্নেসা বলিল, 'বাছা, তুমি অনাহারে মরিয়া গেলে তোমার এই বৃদ্ধ চলৎশক্তিহীন পিতাকে কে একটু জল দিবে বল দেখি?' বদরন্নেসা বারম্বার এই কথা বলিলে সাবিত্রী অগত্যা দুইটি অন্ন জলের মধ্যে মাখিয়া সেই ভাতের জল খাইল। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। বদরন্নেসা একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সভারাম আহারের পর কিছু সুস্থ হইল এবং সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাছা! তোমার মা এবং ভাইদের কোনো তত্ত্ব পাইয়াছ?' সাবিত্রী আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। মাতা, ভাই এবং ভ্রাতৃবধূদিগের মৃত্যুর সমুদয় বিবরণ পিতার নিকট বিবৃত করিল। সভারাম তচ্ছাবণে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল। এই হইতে সভারাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। প্রায় সর্বদাই আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত, কখন কখন তাহার জ্ঞানের উদয় হইত।

সাবিত্রী এইরূপে পিতাকে লইয়া সেই ভগ্নগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। ১৭৬৬ সনের জানুয়ারি মাসে তাহাদের এই বিপদ উপস্থিত হইল। কিন্তু জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্যন্ত এ বাড়িতে ছিল, নিজের যে দুই-একখানা অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া আহারের সংস্থান করিতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে আরাটুন সাহেবের মেম কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। বদরন্নেসা দুই-একদিন অন্তর তাহার বাড়িতে আসিয়া তত্ত্ব-খবর লইত। সমুদায় গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল তাঁতি ও অন্যান্য লোক সভারামের লাখেরাজ ভূমিতে প্রজা ছিল, তাহারাও সকলে পলাইয়া গিয়াছে। জুলাই মাসের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ১১৭২ সনের আষাঢ় মাসে সাবিত্রীর আর আহারের সংস্থান ছিল না, সেই জন্যই সে আষাঢ় মাসে এক দিবস বাড়ির বাগিচা হইতে কয়েকটি আম লইয়া বাজারে বিক্রয়

করিতে চলিয়া ছিল। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই রামহরি লোকজন সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে রামহরি সাবিত্রীকে ধৃত করিবার সময় বলিয়াছিল, 'সরকারী কাজ, আজ তোকে কখনো ছাড়িয়া যাইব না।' সাহেবদিগের যে কোনো কার্য হউক রামহরি তাহাই সরকারী কার্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যে 'সরকারী কার্যের' নিমিত্ত সাবিত্রীকে বলপূর্বক লইয়া গেল, তাহাই এই স্থানে বিবৃত করিতেছি।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের ভাবী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কাশিমবাজারের ফেক্টরীর অ্যাসিস্টাণ্ট ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস্ কতকটা অর্থলোভী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন না। বিশেষত তাঁহার কাশিমবাজারে অবস্থানকালে তিনি সস্ত্রীক সেখানে বসবাস করিতে ছিলেন। এখানেই তাঁর প্রথমা স্ত্রী ও তাঁহার সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের পর লেপ্টেনেন্ট ডব্‌সন্ এখানে অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের অব্যবহিত পরেই এখানে আসিয়াছিলেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু উপন্যাসের লিখিত এই ঘটনার সময়ে ডব্‌সন সাহেবই ফেক্টরীর অ্যাসিস্টাণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কিছু ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং লম্পট ছিলেন। ফেক্টরীর বাঙালী গোমস্তারা সর্বদাই ইহাকে দেশীয় স্ত্রীলোক জুটাইয়া দিত। যদি কখনো কোনো বাঙালি গোমস্তা এইরূপ কুকার্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিত, তবে ইনি তৎক্ষণাৎ তাহার নামে রিপোর্ট করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। বাঙালী জাতি চাকরির নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত। জগতে এমন কি কুকার্য আছে যে, অনেকানেক বাঙালী চাকরির প্রত্যাশায় তাহা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন? চাকরি বাঙালীর প্রাণ, চাকরি বাঙালীর জীবনসর্বস্ব, চাকরি বাঙালীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। বিশেষত এই সময়ে যাহারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠিতে কিম্বা লবণের গোলায় চাকরি পাইত, তাহারাই একমাত্র দেশের নবাব। সুতরাং কাশিমবাজারের কুঠিতে যখন যে গোমস্তা থাকিত, তাহাকেই ডব্‌সন সাহেবের এই সকল কুক্রিয়ায় সাহায্য করিতে হইত।

এখন রামহরি কাশিমবাজারের কুঠির গোমস্তা। ইহার কর্তব্যজ্ঞান কিছু অধিক প্রখর ছিল। 'সরকারী কার্য' প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া করিত। ডব্‌সন্ সাহেবের এই সকল কুক্রিয়ার সহায়তা করা সে 'সরকারী কার্য' বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সম্প্রতি এই কাশিমবাজারের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসকল জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। রামহরি আর 'সরকারী কার্য' চালাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

একদিন ডব্‌সন্ সাহেব রামহরিকে বলিলেন, 'শালা বজ্জাত, তোম কুছ্ কাম্‌কা আদ্‌মী নেই—তোম্‌কো বরখাস্ত করনে হো গা।'

রামহরি দেখিল যে, ভারি বিপদ। সাহেবের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত প্রাণপণে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু চারি-পাঁচদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কৃতকার্য হইতে

পারিল না। রামহরি তখন কোনো দূরবর্তী স্থানে স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে যাইবে বলিয়া সাত দিবসের বিদায়ের প্রার্থনা করিল। কিন্তু ডব্‌সন্ সাহেব তাহাকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না; সাহেবের জরুরি কাজ। কোনোরূপ বিলম্ব তাঁহার সহ্য হয় না। ইহার পর আর একদিন রবিবার অপরাহ্ণে ডব্‌সন্ সাহেব গির্জা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রামহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামহরি কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাহেব সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'বজ্জাত, তোমারা ইয়াদ্ নেই, তিন-চারি দফে, হাম্ তোম্‌কো মাফ কিয়া।'

* * * *

পাছে চাকরি যায়, সেই ভয়ে রামহরি ভারি ত্রাসিত হইল। 'থ্যাঙ্ক ইউ সার (Thank you sir), বেরি গুড্ সার (very good sir) এই বলিয়া সাহেবের গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। মনে মনে স্থির করিল, আজ যাহা হয় একটা করিতেই হইবে। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পাইল যে, সভারামের ভাঙা বাড়িতে তাহার কন্যা সাবিত্রী বাস করিতেছে। তখন সাবিত্রীর নিকট আসিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাবিত্রী সত্যসত্যই সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রীর ন্যায় অতি সচ্চরিত্রা রমণী। কিছুতেই সে ধর্মবিসর্জন করিতে সম্মত হইল না। বরং সে পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। কিন্তু মুমূর্ষু পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে পলায়ন করিবে? সুতরাং অহর্নিশ সে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগল। রামহরির কথা যখনই স্মরণ হইত, তখনই বলিয়া উঠিত, 'দীনবন্ধু বিপদভঞ্জন হরি, আমার ধর্ম রক্ষা কর।' দুই-তিনদিন চেষ্টা করিয়া যখন রামহরি দেখিতে পাইল যে সাবিত্রী কিছুতেই প্রলুব্ধ হয় না, সে কোনো ক্রমেই ধর্মবিসর্জন করিতে সম্মত হয় না, তখন মনে মনে সে স্থির করিল যে, রেশমের কুঠির দুই-তিনজন প্যাদা সঙ্গে করিয়া তাহাকে বলপূর্বক সাহেবের নিকট লইয়া যাইবে। তাই আজ সাবিত্রীকে বলপূর্বক আনিয়া ডব্‌সন্ সাহেবের কুঠির বারান্দায় বসাইয়া রাখিয়াছে। সাবিত্রী ভয় ও ত্রাসে কাঁপিতেছে। 'বিপদভঞ্জন হরি, আমাকে রক্ষা কর' মনে মনে এইরূপে ঈশ্বরকে ডাকিতেছে।

রাত্র আট ঘটিকার সময় সাবিত্রীকে বারান্দায় রাখিয়া রামহরি ডব্‌সন্ সাহেবের গৃহে প্রবেশপূর্বক সাহেবকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল। সাহেব বড় খুশি হইয়া সত্বর বলিয়া উঠিলেন, 'লে আও।'

কিন্তু পাঠক! সংসারের কার্যকলাপ কি ন্যায়বান্ পরমেশ্বর কর্তক পরিশাসিত হইতেছে না? কার্য-জগতে জগৎপিতার কি অপূর্ব কৌশল পরিলক্ষিত হয় না? মঙ্গলময় পরমেশ্বর পাপীকে কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার জন্য, অসহায় দুর্বলকে পাপাসক্ত নিষ্ঠুরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কার্যকারণশৃঙ্খল দ্বারা সেই নৃশংস পাপীদিগের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন।

রামহরি সাবিত্রীকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে বাহিরে বারান্দায় আসিবামাত্র দেখে যে, কাশিমবাজারের কুঠির প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ফ্রান্সিস্ সাইক সাহেব বারান্দায় উপস্থিত। সাইক্ সাহেবের কোনো ইন্দ্রিয়-দোষ ছিল না। বরং তিনি অন্যান্য সাহেবদিগের এই সকল কুক্রিয়া ও কুব্যবহার নিবারণ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। রামহরিকে দেখিবামাত্র

সাইক্ সাহেব বলিলেন, ‘এ স্ত্রীলোকটি কে?’ রামহরি একেবারে অপ্রস্তুত। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ‘ধর্মাবতার! অন্ধকার রাত্রে একটি বৈষ্ণবী পথহারা হইয়া পড়িয়াছিল। আমি রাস্তায় ইহাকে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; আজ আমার বাসায় থাকিবে; রাত্রি প্রভাতে কাল আপন আখড়ায় চলিয়া যাইবে।’

সাইক্ সাহেব এখন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডবসন্ সাহেবের প্রকোষ্ঠদ্বারে ঘন ঘন আঘাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘লেপ্টেন্যাণ্ট ডবসন, লেপ্টেন্যাণ্ট ডবসন্।’ গৃহ মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর হইল—‘কাম ইন মেস্তের সাইক’। (Come in Mr. Sykes)। মেস্তর সাইক প্রবেশপূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘লেপ্টেন্যাণ্ট ডবসন্ তোমাকে এই মুহূর্তেই দিনাজপুর রওনা হইতে হইবে। পঞ্চাশজন গোরা এবং দুইশত সিপাহী সঙ্গে করিয়া তুমি এখনই দিনাজপুর যাও। কেণ্টনমেণ্ট মেজর সেড্‌লকে আমি সব প্রস্তুত রাখিতে লিখিয়াছি। বোধ হয় তিনি এতক্ষণ সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারিবে না। দিনাজপুর সেই আরমানিয়ান বণিক ক্যারাপিট আরাটুনের লবণের গোলায় প্রায় ত্রিশ হাজার মণ লবণ মজুত আছে। তাহাকে বারম্বার সমুদয় লবণ ট্রেডিং কোম্পনির নিকট বিক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। তাহাকে অবশেষে দু'টাকা হারে প্রত্যেক মণের মূল্য দিতে আমরা স্বীকার করিয়াছি, তত্রাচ সে সম্মত হইল না। তুমি সেখানে যাইয়া প্রথমত দু'টাকা হারে মূল্য দিতে প্রস্তাব করিবে। যদি সম্মত না হয়, তাহার গোলা ভাঙিয়া সমুদায় লবণ আমাদের গোলায় নিয়া মজুত রাখিবে। তাহার গোমস্তার নিকট দু'টাকা হারে মূল্য পাঠাইয়া দিবে।’

ডবসন্ সাহেব বলিলেন, ‘আপনি ঘরে যান, আমি এখনই রওনা হইব।’ কিন্তু সাইক সাহেব অত্যন্ত কাজের লোক। তিনি বলিলেন, ‘তোমাকে রওনা করিয়া দিয়া আমি ঘরে যাইব। তুমি চাকরদিগকে জিনিসপত্র বান্ধিতে বল।’ ডবসন্ দেখিলেন তিনি রওনা না হইলে সাইক সাহেব যাইবে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র বান্ধিতে হুকুম দিলেন। বাহিরে আসিয়া রামহরিকে এক পদাঘাতপূর্বক বলিলেন, ‘শালা সাইক সাহেবকো দেখতা নাই, সামলাও।’

রামহরি সাহেবের সুচারু পদাঘাত প্রাপ্তিমাত্র বাহিরে আসিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন, ‘পালা, পালা, আজ সাহেবকে অনেক বলে-কয়ে তোকে ছাড়িয়ে দিলাম।’

সাবিত্রী প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল। এই কথা শুনিবামাত্র তাহার শরীরে নববলের সঞ্চার হইল। সে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। রাত্র ঘোর অন্ধকার। কোনদিকে যে দৌড়াইয়া যাইতেছে তাহাও জানে না। ‘হে পরমেশ্বর আজ তুমিই রক্ষা করিলে—তুমিই রক্ষা করিলে’, এই বলিতে বলিতে সে অবিশ্রান্ত দৌড়াইতে লাগিল।

পাঁচ
লুট

১৭৬৫ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ বঙ্গদেশে লবণের বাণিজ্য সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করিলেন, তাহা সবিস্তারে উল্লেখ না করিলে পাঠক ও পাঠিকাগণ উপন্যাসের এই অধ্যায়ের ঘটনাসমূহ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। অতএব এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ উল্লেখ করিতেছি।

মুসলমান কুলতিলক, বঙ্গের শেষ সুবাদার উদারচেতা ন্যায়পরায়ণ দেশহিতৈষী কাসিমালি যে জন্য ইংরাজদিগের কোপানলে নিপতিত হইয়াছিলেন। অবশেষে যেরূপ তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন, তাহা বোধহয় বাঙালি পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের উপর দেশপ্রচলিত নিয়মানুসারে মাশুল দিতে অস্বীকার করিলেন। কাসিমালি দেখিলেন যে ইংরেজগণ কোনো ক্রমেই মাশুল দিতে সম্মত হইতেছেন না; সুতরাং কেবল দুর্বল বাঙালি বণিকদিগের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা তিন নিতান্ত অন্যায় মনে করিলেন। তিনি তখন দেশের রাজা কী প্রকারে তিনি একশ্রেণীস্থ প্রজাদিগকে মাশুলের দাবি হইতে অব্যাহতি অপর শ্রেণীস্থ লোকের নিকট হইতে মাশুল আদায় করিবেন ? তিনি ন্যায়পরতার অনুরোধ মাশুল আদায়প্রথা একেবারে রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু খ্রীস্টধর্মবলম্বী সুসভ্য ইংরেজ বণিকগণ বলিয়া উঠিলেন যে বাঙালিদিগের নিকট হইতে অবশ্য মাশুল লইতে হইবে। সুদ্ধ কেবল তাহাদিগকে মাশুলের দাবি হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। অখ্রীস্টান কাসিমালি ইংরেজদিগের এই নূতন খ্রীস্টধর্মোচিত ব্যবহারের মর্মগ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। তিনি ইংরেজ রাজনীতির নিগূঢ়তত্ত্বে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত; সুতরাং এইরূপ প্রস্তাবে কখনো সম্মত হইলেন না। ইহাতেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল এবং অবশেষে ইংরেজদিগের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল।*

১৭৬৪ সনে মীরকাসিমের সিংহাসনচ্যুতির সংবাদ বিলাতে পৌঁছিলে পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টগণ মনে করিলেন যে তাঁহাদের কলিকাতাস্থ কর্মচারিগণ যেরূপ অন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, দেশীয় বণিকদিগের উপর তাঁহারা যেরূপ অত্যাচার করিতেছেন,

---

* Vide note (5) in the appendix.

তাহাতে অনতিবিলম্বেই বঙ্গদেশে তাঁহাদের অধিপত্য একেবারে লোপ পাইবে। ডিরেক্টরদিগের মধ্যে সালিবান্ নামক একজন ইংরেজ বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইবের পরম শত্রু। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ক্লাইব একেবারেই ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য লোক; অর্থলোভে সকল প্রকার কুকার্য দ্বারাই হস্ত কলঙ্কিত করিতে সমর্থ ছিলেন।*

ইহারই ভয়ে ক্লাইবের আর ভারতবর্ষে আসিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মীরকাসিমের সিংহাসনচ্যুতির পর, ডিরেক্টরগণ ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এদিকে ক্লাইব নিজেই উপযাচক হইয়া ডিরেক্টরদিগের নিকট ১৭৫৪ সনের ২৭শে এপ্রিল এইমর্মে একপত্র** লিখিলেন যে তাঁহাকে পুনর্বার বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলে তিনি কোম্পানির কার্যকারকদিগকে লবণ, তামাক এবং গুবাকের বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে দিবেন না, ক্লাইব এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন।

ডিরেক্টরগণ ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ১৭৬৪ সনের ১লা জুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলিকাতাস্থ কর্মচারিদিগকে লবণ, তামাক এবং গুবাকের বাণিজ্য বিষয়ে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্বক একখানি সুদীর্ঘপত্র*** কলিকাতা কৌন্সিলে প্রেরণ করিলেন। ডিরেক্টরদিগের সেইপত্রে এইরূপ আদেশ ছিল যে কলকাতার গবর্নর এবং কৌন্সিল মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাবের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্বক লবণ, তামাক এবং গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, নবাবের লাভালাভের প্রতি বিশেষ দৃৎষ্ট রাখিবেন এবং দেশীয় বণিক ও দেশীয় প্রজা সাধারণের যাহাতে অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য স্থাপনপূর্বক নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন।

কিন্তু সে সময়ে ইংরাজগণ কেবল অর্থলোভেই এদেশে আগমন করিতেন। সেই সকল অর্থলোলুপ, স্বার্থপরায়ণ, নীচাশয় ইংরাজ এই সকল উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিলেন। ক্লাইবও তাঁহার অঙ্গীকার একেবারে বিস্মৃত হইলেন। নবাবের সম্মতি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, নবাবের নিকট কোনো কথা জিজ্ঞাসা করাও হইল না। ১৭৬৫ সালের ১০ই অগস্ট তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থ সাধনার্থ এবং বঙ্গদেশের ধন-সম্পত্তি লুন্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে লবণ, তামাক ও গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়ানক নিয়ম**** প্রচার করিলেন। এই নিয়মানুসারে কার্যারম্ভ হইবামাত্র দেশের সর্বনাশ আরম্ভ হইল। দেশীয় প্রজাগণের আর কষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

চতুর্দিক হইতে প্রজার হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

---

* Vide note (2) in the appendix.

** Vide note (6) in the appendix.

*** Vide note (7) in the appendix.

**** Vide note (8) in the appendix.

ক্লাইব এবং তাঁহার কৌন্সিলের মেম্বরগণ কলিকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েশন নামে একটি বণিকসভা সংস্থাপন করিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রায় সমুদায় ইংরেজ কর্মচারি বণিকসভার মেম্বর হইলেন। নিয়ম হইল যে দেশের মধ্যে যত লবণ, তামাক ও গুবাক উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় প্রথমত দেশীয় লোকদিগকে এই বণিকসভার নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। পরে বণিকসভা সেই সকল পণ্যদ্রব্য দেশীয় বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন। দেশীয় বণিকগণ বণিকসভার নিকট হইতে এইরূপে লবণ, তামাক এবং গুবাক ক্রয় করিয়া লইয়া দেশীয় জনসাধারণের নিকট বিক্রি করিতে পারিবে। দেশীয় বণিকগণ দেশীয় লোকের নিকট এই সকল পণ্যদ্রব্য কখনো ক্রয় করিতে পারিবে না।

মূল্য সম্বন্ধে আবার নিয়ম হইল যে বণিকসভা এদেশের লবণ প্রস্তুত কারিদিগের নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা মূল্যে এক এক শত মণ লবণ ক্রয় করিবেন। পরে তাঁহার পাঁচ শত টাকা মূল্যে সেই লবণের এক এক শত মণ দেশীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিবেন। দেশীয় বণিকগণ পাঁচশত টাকা মূল্যে এক এক শত মণ লবণ ক্রয় করিয়া তাহার উপর নির্দিষ্ট লাভ রাখিয়া জনসাধারণের নিকট সেই লবণ বিক্রয় করিবে।

পাঠক! একটু চিন্তা করিয়া দেখ, এ লুট না বাণিজ্য? বঙ্গদেশে এই সময় হয়তো পাঁচ সিকা হারে এক এক মণ লবণ বিক্রয় হইত। প্রজাগণ দুইটি পয়সা দিয়া এক এক সের লবণ ক্রয় করিত। কিন্তু একদিকে দেশের লবণ নির্মাতা মহাজন ও মলঙ্গীদিগকে পাঁচ সিকার স্থানে প্রত্যেক মণ বারো আনা মূল্যে ইংরাজ বণিকসভার নিকট বিক্রয় করিতে হইল। পক্ষান্তরে দেশীয় সমুদয় প্রজাদিগকে পাঁচ সিকার স্থানে সাত টাকা সাড়ে-সাত টাকা হারে লবণ ক্রয় করিতে হইল। সমুদয় লোকেরই লবণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখন দেশীয় বণিকগণকে পাঁচটাকা মূল্যে এক এক মণ লবণ ক্রয় করতে হইল, তখন সাত টাকা সাড়ে-সাত টাকার কমে তাহারা সে লবণ বিক্রয় করিলে তাহাদের কিছুই লাভ হয় না। যাহাতে বণিকসভার অপরিমিত লাভ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমুদয় দেশীয় লোকদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল।

ইংরেজ বণিকসভা লবণের বাণিজ্যে এইরূপ একাধিকার সংস্থাপনপূর্বক দেশের অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। দেশের গরিবদিগের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। অনেকানেক গরিব লবণ ক্রয় করিতে একেবারে অসমর্থ হইল। তাহারা কাষ্ঠ বিশেষের কয়লা জলপাত্রের মধ্যে রাখিয়া পরে সেই কয়লা মিশ্রিত লবণাক্ত জল ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা লবণের অভাব দূর করিতে লাগিল। কিন্তু লবণের মূল্য বৃদ্ধি এবং গরিবদিগের পক্ষে লবণের অভাব নিবন্ধন যে কষ্ট হইল, এ অতি সামান্য কষ্ট। ইহাতেও সকল কষ্টের অবসান হইল না, সকল যন্ত্রণা ফুরাইল না। লবণের বাণিজ্য-উপলক্ষে এই সময়ে বাঙালিদিগের যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, কষ্টের উপর কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাঙালি জাতির যেরূপ

অসাধারণ সহিষ্ণুতা, বাঙালি যেরূপ অম্লানবদনে অবিশ্রান্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বাঙালি যেরূপ সহাস্যবদনে অপমান সহ্য করে, তাহাতে আমাদের পিতামহ প্রপিতামহগণ অনায়াসে এ অর্থদণ্ড সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু এ লবণের বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর নানাবিধ অত্যাচারের সূত্রপাত হইল।

ক্লাইবের কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস সাইক এই সময়ে কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবকে বাধ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত বহু সংখ্যক পরওয়ানা* বাহির করিয়া লইলেন। এই সকল পরওয়ানা দ্বারা লবণ নির্মাতা ও লবণ মহলের জমিদারগণের প্রতি হুকুম জারি হইল যে তাহাদিগকে কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকসভার নিকট এই মর্মে মুচলেকা দিতে হইবে, যে যত লবণ তাহারা প্রস্তুত করিবে তৎসমুদয় ইংরাজ বণিকসভার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। তাহাদের নিকট ভিন্ন কাহারাও নিকট এক কড়ার লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি মুচলেকা না দিয়ে কেহ লবণ প্রস্তুত করে কিম্বা এইরূপ মুচলেকা দিতে বিলম্ব করে তবে তাহার সমুচিত দণ্ড হইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাব তখন ইংরেজদিগের করতলস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজে অপ্রাপ্তবয়স্ক। এসময়ে মহরাজ নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান ছিলেন না, ইংরাজগণ মহারাজ নন্দকুমারের পদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রেজা খাঁ ইংরাজদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি ইংরাজ বণিকদিগের অনুরোধে দেশীয় প্রজাসাধারণের সর্বনাশ করিয়া এইরূপ পরওয়ানা জারি করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার এই সময়ে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকিলে দেশের এরূপ দুরবস্থা কখনোই হইত না।

এই পরওয়ানা জারির পর ইংরাজদিগের লবণের গোলার সাহেব ও গোমস্তাগণ বিনা অপরাধেও দেশের শত শত লোককে ধরিয়া আনিয়া, তাহারা মুচলেকা না দিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়াছে, কিম্বা পরওয়ানার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। আবার যাহারা মুচলেকা দিয়াছিল, তাহাদিগের বিরুদ্ধেও সময়ে সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল যে, তাহারা গোপনে অন্যান্য লোকের নিকট লবণ বিক্রয় করিয়াছে। যাহারা বণিকসভা হইতে লবণ ক্রয় করিত, তাহারা নির্দিষ্ট মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্যে লবণ বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সময়ে দণ্ডিত হইতে লাগিল। সকল প্রজা লবণ ক্রয়-বিক্রয় কার্যে সাতপুরুষের মধ্যেও লিপ্ত হয় নাই, তাহারা পর্যন্ত ব্যবহারার্থ গোপনে লবণ ক্রয় করিয়াছে বলিয়া সময়ে সময়ে জেলে প্রেরিত হইতে লাগিল। এই অভিযোগের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো অনুসন্ধান হইত না। একব্যক্তি অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই অভিযুক্তকে ধৃত করিয়া আনিত এবং কলে-কৌশলে কোনো ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিতে পারিলেই বাঙালি গোমস্তা ও সাহেবদিগের কিছু লাভ হইত। অভিযুক্তকে হয়

*Vide note (9) in the appendix.

অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইত, না হয় জেলে যাইতে হইত। অবস্থা বিশেষে কোনো কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘর-বাড়ি লুট হইত এবং তাহার গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে নানাবিধ অশ্লীলতা পূর্ণ অপমান এবং ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বস্তুত এই সময় হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙালিদিগকে লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় নিবন্ধন যে কী ঘোর অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাষাদ্বারা সহজে প্রকাশিত হয় না। লবণের কুঠির গোমস্তা কিম্বা নিমকের দারোগা গ্রামে আসিতেছে, এই কথা শুনিলে গ্রামসুদ্ধ লোক আপন আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ স্থানান্তরে পলায়ন করিত।

১৭৬৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ক্লাইব এবং তাঁহার কৌন্সিলের মেম্বরগণ লবণ, তামাক ও গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে আর কয়েকটি কঠিন নিয়ম* প্রচার করলেন, নবাবের লাভালাভ কিম্বা প্রজাসাধারণের সুবিধার প্রতি একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিলেন না। কিন্তু পাছে ডিরেক্টরগণ এই নিয়ম নামঞ্জুর করেন সেই আশঙ্কায় এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে লবণ, তামাক এবং গুবাকের বাণিজ্যের বণিকসভার যে লাভ হইবে তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা হারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পাইবৈন, বাকি টাকা গবর্নর, কৌন্সিলের মেম্বর সৈন্যাধ্যক্ষ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছোট বড় সমুদয় কর্মচারিগণ স্বীয় স্বীয় পদমর্যাদানুসারে ভাগ করিয়া লইবেন। এই বাণিজ্যের লাভ হইতে প্রায় কোনো কর্মচারীই বঞ্চিত হইলেন না। খ্রীস্টধর্ম প্রচারার্থ যে দুইজন ধর্মযাজক (Chaplains) কলিকাতায় তৎকালে অবস্থান করিতেন তাঁহারাও কিছু কিছু পাইতেন।**

লবণের বাণিজ্য এইরূপ একচেটিয়া করিবার অব্যবহিত পূর্বে ক্যারাপিট আরাটুন নামক জনৈক আরমানিয়ান বণিক ত্রিশ হাজার মণ লবণ ক্রয় করিয়া তাঁহার দিনাজপুরস্থ গোলায় মজুত রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, দেশের সমুদয় লবণ ইংরাজগণ ক্রয় করিয়া, পরে অত্যধিক মূল্যে দেশীয় বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন বলিয়া স্থানে স্থানে নবাবের পরওয়ানা জারি করাইয়াছেন, তখন তাঁহার নিজের গোলার লবণ বিক্রয় বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি মনে করিলেন যে এই নিময় প্রচারের পর তাঁহাকে লবণের বাণিজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে; কিন্তু এ বৎসর নিয়ম প্রচারের পর লবণের মূল্য পাঁচ গুণ বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং সেই মূল্যের বাজারে আপন লবণ বিক্রয় করিয়া অন্তত এই বৎসরে কিছু লাভ করিতে পারিবেন। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, আরাটুন সাহেব স্বীয় গোমস্তাকে লবণের গোলা বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ তাঁহার গোলার লবণ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ত্রিশ হাজার মণ লবণ তাঁহার গোলায় মজুত রহিয়াছে।

---

*Vide note (10) in the appendix.

*Vide note (11) in the appendix.

এখন এক টাকা হারে মণ ক্রয় করিতে পারিলেও পরে বাঙালি বণিকদিগের নিকট পাঁচ টাকা হারে বিক্রয় করিয়া, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবেন।

বণিকসভার অধ্যক্ষ বেরেলস্ট এবং সাইক সাহেব এই আরমানিয়ান বণিকের লবণ হস্তগত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে দুই টাকা হরে প্রত্যেক মণের মূল্য দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু আরাটুন সাহেব তাঁহার লবণ দুই টাকা হারেও বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ইংরাজগণ বলপূর্বক তাঁহার গোলা ভাঙ্গিয়া সমুদয় লবণ হস্তগত করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন।* বাণিজ্যে লাভ হইলেই হইল; টাকা সঞ্চয় করাই তাঁহাদিগের একমাত্র খ্রীস্টীয়ধর্ম। বণিকসভার অধ্যক্ষ বেরেলস্ট এবং সাইক সাহেব আরাটুন সাহেবের গোলা ভাঙিয়া, তাঁহার দিনাজপুরের গোলার লবণ হস্তগত করিবার নিমিত্ত লেপ্টেন্যাণ্ট ডবসন্‌কে কয়েকজন গোরা ও সিপাহীর সহিত দিনাজপুর প্রেরণ করিলেন। ডবসন্ সাহেব দিনাজপুর পৌঁছিয়া আরাটুন সাহেবের লবণের গোলা ভাঙিয়া, তাঁহার সমুদয় লবণ হস্তগত করিলেন। আরাটুন সাহেব অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে বেরেলস্ট এবং সাইক সাহেবের গোমস্তার নামে কলিকাতায় মেয়রকোর্টে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন।

মেযরকোর্টের কার্যপ্রণালী ও আরাটুন সাহেবের মোকদ্দমার বিচার যথাস্থানে সবিস্তারে বিবৃত হইবে। ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে সেই অনাথা আশ্রয়হীন, অত্যাচার নিপীড়িতা সাবিত্রীর যে কিরূপ দুরবস্থা হইল, তাহাই উল্লেখ করিতেছি। বোধ হয় সহৃদয়া বঙ্গীয় পাঠিকা সাবিত্রীর বিষয় জানিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিকতর উৎসুক হইবেন।

---

*Vide note (12) in the appendix.

ছয়
পিতৃ-বিয়োগ

রজনী ঘোর অন্ধকার। মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। জনপ্রাণীর শব্দ নাই, কেবল ঘন ঘন মেঘগর্জন হইতেছে। বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়িনী কিরণরেখা দ্বারা মুহূর্তে মুহূর্তে পথপার্শ্বস্থিত দু-একটি গৃহস্থের পর্ণকুটির মাত্র দেখা যায়, কিন্তু সে কাহার কুটির, কিম্বা কোন গ্রামস্থ কুটির তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথে, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া যাইতেছে, কোন দিকে যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই জানে না।

কিন্তু যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরুপায়ের উপায়, অনাথের নাথ, যাঁহার করুণাবারি, ধনী-দুঃখী, মূর্খ-জ্ঞানী, সকলের মস্তকে সমভাবে বর্ষিত হইতেছে, তিনি কি আজ এই বন্ধুবান্ধবহীনা যুবতীকে পরিত্যাগ করিবেন? নিষ্ঠুর বঙ্গীয় কুলাঙ্গার রামহরির ন্যায় রেশমের কুঠির বাঙালি গোমস্তাগণ এই বিপন্না রমণীর বর্তমান দুরবস্থা দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্টানুভব না করিতে পারে, স্বার্থপরায়ণ ইংরাজ বণিকগণ অসিতাঙ্গদিগকে বন্যপশু, কিম্বা জন্তু মনে করিয়া ক্রীড়াচ্ছলেও ইহাদিগকে এবম্বিধ কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে; কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চক্ষে শ্বেতাঙ্গ ও অসিতাঙ্গের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই; তাঁহার অমৃতক্রোড় সকলের নিমিত্তই প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; বিপন্নকে তিনি সর্বদাই বিপদরাশি হইতে উদ্ধার করিতেছেন।

ভয় নয় সাবিত্রী! জগন্মাতা তোমাকে এইরূপ বিপদাবস্থায় পরিত্যাগ করিবেন না। যাঁহার কৃপাবলে আজ তোমার ধর্মরক্ষা হইল, যাঁহার করুণায় তুমি রাক্ষসসদৃশ লেপ্টেন্যাণ্ট ডবসনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তিনি তোমার অবসন্ন পদদ্বয়কে তোমার গৃহাভিমুখে পরিচালন করিতেছেন।

অনেকক্ষণ দৌড়াদৌড়াইতে সাবিত্রী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর চলিতে পারে না। আজ সমস্ত দিবস অনাহারে কালযাপন করিয়াছে, আবার হিমালয়পর্বতসদৃশ দুঃখ তার তাহার বক্ষে চাপিয়া রহিয়াছে। ইহাতে কি শরীরে বল থাকে? এদিকে আবার নিজের বিপদাশঙ্কা একটু দূর হইবামাত্র পিতার দুরবস্থা মনে পড়িল। ভাবিতে লাগিল, হয়তো আমার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তখন দুর্বিষহ যন্ত্রণানল হৃদয়মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 'হায়! হায়! মৃত্যুকালে পিতাকে দেখিলাম না;

পিতার মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিলাম না; পিতাকে মৃত্যুকালে হরিনাম শুনাইবার জন্য কেহই সম্মুখে রহিল না!'

পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার কর্ণে সুমধুর হরিনাম প্রবেশ করিল না, এই চিন্তা সাবিত্রীর মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। একশত বৎসর পূর্বে, আমাদের দেশীয় হিন্দুরমণীদিগের অন্তরে প্রগাঢ়, বদ্ধমূল ধর্মসংস্কার ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মনুষ্য এ জীবনে শত শত পাপানুষ্ঠান করিয়াও মৃত্যুকালে হরিনাম শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই বদ্ধমূলসংস্কার-নিবন্ধন সাবিত্রীর মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সে পিতার দুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

এই সময়ে আবার বিদ্যুতালোকে সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে একখানি পর্ণকুটির দেখিতে পাইয়া একটু থামিল। কিন্তু কাহার কুটির তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, কী জানি, যদি ইংরেজদিগের রেশমের কুঠির কোনো প্যাদা কি সিপাহী এ ঘরে থাকে, তবে তো আমার ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইতে পারে। বস্তুত এই সময়ে ইংরেজদের নাম, কিম্বা ইংরেজদিগের রেশমের কুঠির প্যাদা কি গোমস্তার নাম শ্রবণ করিলে দেশীয় সমুদয় লোকের অন্তরেই যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদয় হইত। কোনো শব্দ না করিয়া সাবিত্রী ঘরের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে বৃষ্টিও একটু থামিল। ঘরের মধ্য হইতে রোগীর আর্তনাদ শুনিতে পাইল। কিছুকাল পরে একটি বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিল। বৃদ্ধা বলিতেছে, 'না হয় এদেশ হইতে পলাইয়া যাইতাম। বাপু তুই এমন করিয়া আঙুল কাটিলি কেন?' ভগ্নস্বরে আর একজন প্রত্যুত্তর করিল, 'না! পলাইয়া যাইবার কি আর কোথাও স্থান আছে? কাল শুনিলাম জিলায় জিলায় লবণের কুঠি বসাইয়াছে, কত লোককে ব্যাগার ধরিতেছে। এ পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারি, তবেই নিস্তার।'

সাবিত্রী ইহাদের পরস্পরের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সৈদাবাদের আরাটুন সাহেবের কুঠির রামা তাঁতির ঘর। তখন তাহার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। বুঝিতে পারিল যে, সে পথহারা হইয়া অন্য দিকে যাই নাই, ঈশ্বরেচ্ছায় সোজাপথেই বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সে তখন বাহির হইতে 'রামার মা', 'রামার মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রামার মা কোনো উত্তর করিল না। সে ভাবিতে লাগিল যে এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, ঘোর অন্ধকার রাত্রে, তাহাকে কে ডাকিবে? কোন ভূত কিম্বা অপদেবতা ভিন্ন মনুষ্য কি কখনো এতরাত্রে রাস্তায় চলা-চলতি করে?

রামার মা জানিত যে, ইংরাজগণ এদেশে আসিয়াছে পর, দেশের মধ্যে দুই প্রকার ভূতের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমরাত্রে দেশীয় ভূতগুলি চলা-চল্‌তি করে, কিন্তু গভীররাত্রে কেবল বিলাতি ভূতেরই দৌরাত্ম্য। সুতরাং সাবিত্রীকে বিলাতি ভূত মনে করিয়া আর কোন উত্তর দিল না। সাবিত্রী অনেকবার রামার মাকে ডাকিয়াও কোনো প্রত্যুত্তর পাইল না। অবশেষে কাতরকণ্ঠে বলিল, 'রামার মা, আমি সাবিত্রী, বড় বিপদে পড়িয়াছি,

একবার দরজা খোল, আমাকে ঘরে নেও।' তখন রামা উঠিয়া বসিল, বলিল, 'মা সভারামের মেয়ে সাবিত্রী, বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র দরজা খুলিয়া ওকে ঘরে আন। ও এত রাত্রে কোথা হইতে আসিল? আমার বোধ হয় সভারামের ব্যারাম বৃদ্ধি হইয়াছে, তাই আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে।'

রামার মা চুপে চুপে রামার কানে কানে বলিল, 'ওকে আমি ঘরে আনিব না। মাগীর যেমন কর্ম তেমনি ফল। আমি দুই-তিনদিন রামহরিবাবুকে ওর সঙ্গে গোপনে গোপনে কথা বলতে দেখিয়াছি। ও হয়তো এখন জাত দিয়েছে। কাশিমবাজারে কোনো সাহেব কিম্বা বাঙালিবাবুর কাছে গিয়াছিল, এখন বাড়িতে চলিয়াছে।'

রামা ধীরে ধীরে বলিল, 'না, মা, সাবিত্রী সে রকম মেয়ে না। ও প্রাণ গেলেও এমন কাজ করিবে না। ওর বাপের বোধ হয় ব্যারাম বাড়িয়াছে, তাই আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে। একদিন আমার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, 'রামা, বাবার কোন সময় কি হয় জানি না। ডাকিলে একবার আসিও। মা, তুমি দরজা খুলিয়া ওকে ঘরে আনো।'

রামার মা। তুই শুয়ে থাক। এখন আমি দরজা খুলিতে পারি না।

রামা। তুমি না খোল, আমি খুলিয়া দিব।

এই বলিয়া রামা হাতের বেদনায় কোঁকাইতে কোঁকাইতে উঠিয়া দরজা খুলিল। সবিত্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো নাই। অন্ধকার পরিপূর্ণ একখানি ছোট ঘর। তাহার একদিকে রামার বিছানা, অপরদিকে তাহার বৃদ্ধা জননী শুইয়া আছে। সাবিত্রী গৃহ প্রবেশ করিবামাত্র রামার মা ঘৃণার ভাব প্রদর্শনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁলা, এত রাত্রে কোথা হইতে আসিলি? কাশিমবাজারে গিয়াছিলি বুঝি?'

সাবিত্রী তখন ক্রন্দন করিতে করিতে অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'রামার মা, আমার দুঃখের কথা কী বলিব—আজ রামহরিবাবু কতকগুলি লোকজন সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ি যাইয়া, আমাকে ধরিয়া কাশিমবাজারে নিয়া গেল। রামার মা, আমার মা, ভাই-ভাইজ, সব গিয়াছে। হা পরমেশ্বর, আমারও যদি মৃত্যু হইত! গলার দড়ি দিয়া, কিম্বা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আবার ভাবি মরিয়া গেলে বাবাকে কে একফোঁটা জল দিবে। আহা, বাবার আজ যে কী দশা হইয়াছে বলিতে পারি না! আমার বাবা বুঝি নাই!'

সাবিত্রীর এই সকল কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া রামার সরল মন বড়ই বিগলিত হইল। রামা নিতান্ত অশিক্ষিত, আপনার নাম লিখিতেও জানে না। তাহার বিলম্বণ শারীরিক বল আছে। কিন্তু আজকাল কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এ সংসারে রামা কাহাকেও ভয় করিত না, তাহার অত্যন্ত সাহস ছিল। কিন্তু এখন আর সে সাহস নাই। অত্যাচার নিপীড়িত হইয়া মানসিক বলবীর্য সকলই হারাইয়াছে। সাবিত্রীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রামা বলিয়া উঠিল, 'একদিন শালা রামহরিকে অন্ধকার রাত্রে কোথাও পাই, তবে ওরে খুন করিব। ঐ শালাই তো সাহেব-সুবাদের পরামর্শ দিয়া সকলের মাথা খাইতেছে।'

রামার কথা শুনিয়া তাহার মাতা বলিয়া উঠিল, 'চুপ কর, চুপ কর। রাম-হরিবাবুর কানে এই সকল কথা গেলে, সে তোর মাথা কাটিয়া ফেলিবে। তুই সকলকেই বান্ধব মনে করিয়া সকলের সাক্ষাতে যা মুখে আসে তাই বলিস।' রামার মার এইরূপ বলিবার অর্থ এই যে, হয়তো রামহরির নিকট সাবিত্রী এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। রামার মন অতি সরল, সুতরাং সাবিত্রীর সরলতা পরিপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র রামা তাহার সমুদয় কথা বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু রামার মা সাবিত্রীর একটি কথাও বিশ্বাস করে নাই। যৌবনকালে রামার মা কুচরিত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার মন অত্যন্ত অপবিত্র। সাবিত্রীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সে মনে মনে নানাবিধ সন্দেহ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে, সাবিত্রী স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় করিতে নিজেই কাশিমবাজারে গিয়েছিল, কিন্তু এখন ধরা পড়িয়াছে বলিয়া এইরূপ কপট ক্রন্দন করিতেছে। সাবিত্রীর অকৃত্রিম কাতরোক্তির প্রত্যেক কথা যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইতেছে, তাহার কাতরোক্তির প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যের ভাব, সরলতার ভাব উদগীরিত হইতেছে, তাহা কি পাপান্ধকারে নিমগ্ন, চিরাভ্যস্ত পাপে কলঙ্কিত রামার মার পাপাসক্ত মন ঘূণাক্ষরেও অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? মন পবিত্র না হইলে মনুষ্যগণ কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষত যাহাদিগের নিজের হৃদয় অপবিত্র, তাহারা কস্মিনকালেও অপরের হৃদয়ে যে পবিত্রভাব আছে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। এই জন্য সংসারাসক্ত কুটিল মন জগতে যে সাধু লোক আছে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই নিমিত্ত কপটাচারী লোকদিগকে প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত দেখা যায়, অপর লোকের কথা তাহারা সহজে বিশ্বাস করে না।

রামার মা সাবিত্রীর সকল কথাই অবিশ্বাস করিল, তাহাকে কুলটা স্ত্রী বলিয়া মনে মনে স্থির করিল, এবং ভাবিতে লাগল যে, সাবিত্রী নিশ্চয়ই অর্থলোভে প্রলুব্ধ হইয়া কাশিমবাজারে কোনো বাঙালি কিম্বা ইংরাজের নিকট স্বীয় শরীর বিক্রয় করিতে গিয়াছিল।

কিছুকাল পরে অতি কর্কশস্বরে সে সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তবে এখন এখানে কী চাস? এতরাত্রে তো আমি জাগিয়া থাকিতে পারি না, তোর বাপ একলা ঘরে পড়িয়া আছে, তোর আর বাড়ি যাইতে হইবে না?'

সাবিত্রী তখন কাতরকণ্ঠে আবার বলিতে লাগিল, 'রামার মা, এই অন্ধকারে একলা যাইতে বড় ভয় করে। রামাকে বল, আমাকে বাড়িতে রাখিয়া আসুক।'

সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া রামা কোনো প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার পূর্বেই তার মা ঠাট্টা করিয়া বলিল,

'বাঘ ভাল্লুকে নাই ভয়
ঢেঁকি দেখে চমকে যায়।

হ্যাঁলা, তোর কথা শুনিয়া আমার গা জ্বলে। কাশিমবাজার হইতে এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এত দূর চলিয়া আসিতে পারিলি, আর এখন এইটুকু যাইতে পারিস না! রামার জ্বর হইয়াছে, রামা তোর সঙ্গে এ বৃষ্টির মধ্যে যাইতে পারিবে না। তুই সরিয়া দাঁড়া, তোর কাপড়ের জলে আমার ঘর তো ভাসায়ে দিলি, এখন আমার বিছানা ভিজাস না।'

সাবিত্রী। রামার মা, তবে তুমি বদরন্নেসাকে কুঠি হইতে ডাকিয়া দিবে? আমার এ বিপদের কথা শুনিলে তিনি অবশ্য লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন।

রামার মা। হ্যাঁ, আয়াঝির আর বসিয়া বসিয়া কাজ নাই, এখন এত রাত্রে তোর সঙ্গে দেখা করিবেন। আজকাল তাঁদের যে বিপদ। এ কুঠির রেশমের কারবার বন্ধ হইল। দিনাজপুরের লবণের গোলা লুট হইয়াছে। সাহেব দিনাজপুর গিয়াছেন। আবার আয়াঝি এখন মেমসাহেবের কোঠায় শুইয়া থাকেন। সেখানে এত রাতের কেহ যাইতে পারিবে না। তুই এখন ধীরে ধীরে চলিয়া যা। কিছু ভয় নাই। আমার বড় ঘুম পাইয়াছে, আর ত্যক্ত করিস না।

রামার মার এই সকল কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, রামা তাহাকে থামাইয়া বলিল, 'মা তুমি চুপ কর; ওকে এত বকতেছ কেন? আমি ওর সঙ্গে যাইয়া ওকে ওর বাড়িতে রাখিয়া আসিব।'

রামার মা বলিল 'ওরে পোড়াকপালে! তুই সমস্ত রাত আঙুলের ব্যথায় চিৎকার করিতেছিস, তোর জ্বর হইয়াছে, তুই এ বৃষ্টিতে কেমন করিয়া যাইতে চাস?'

কিন্তু রামা যাহা কিছু করিবে বলিয়া মনে করে সে কার্য হইতে স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহাকে বিরত করিতে পারেন না। সাবিত্রীর কাতরোক্তি শ্রবণে রামার সরল মন বিগলিত হইয়াছিল, সুতরাং সে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, বামহস্তে একখানি বাঁশের লাঠি লইয়া বলিল, 'চল সাবিত্রী, আমি তোমাকে তোমাদের বাটিতে রাখিয়া আসিব।'

রামাকে এইরূপ গমনোন্মুখ দেখিয়া তাহার মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'ওরে হতভাগা! তোর জ্বর হইয়াছে, এই বৃষ্টিতে ভিজিয়া শীঘ্রই যমের বাড়ি যাইতে চাহিস্ নাকি?'

রামা তাহার মাতার কথায় কর্ণপাত করিল না। ঘরের বাহিরে আসিয়া সাবিত্রীকে বলিল, 'বসিয়া রহিলে কেন? চলিয়া আইস।'

সাবিত্রী রামার মার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া এ পর্যন্ত বসিয়াছিল। বারম্বার রামা ডাকিলে পর ঘরের বাহির হইয়া রামার সঙ্গে চলিল।

রামার এদিকে যদ্রূপ সরল মন ছিল, পক্ষান্তরে তাহার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইন্দ্রিয়দোষ কাহাকে বলে তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না। বাল্যকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহার মা অত্যন্ত কুচরিত্রা, রামাকে বিশেষ স্নেহের সহিত প্রতিপালন করে নাই। রামা অত্যন্ত অযত্ন ও অনাদরে প্রতিপালিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই সে কষ্ট

সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছে। পরের দুঃখ দেখিলেই তাহার মন দয়ার্দ্র হয়। কোনো বিষয়ে তাহার বিশেষ একটা আসক্তি ছিল না। পাগলের ন্যায় হাঁটিয়া-চলিয়া বেড়ায়, আপনার মনের সুখে গান করে। বাড়ির নিকটস্থ পল্লীতে কাহার কোনো ব্যারাম হইলে দুই প্রহর রাত্রের সময় রামাকে ডাকিয়া ঔষধ আনিতে বল, কবিরাজ ডাকিতে বল, সে অম্লানবদনে চলিয়া যাইবে; কোনো আপত্তি করিবে না। এইরূপ পরোপকার করিলে যে তাহার ধর্ম সঞ্চয় হইবে, লোকে তাহাকে প্রশংসা করিবে, লোকে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, কিম্বা এই অভিপ্রায়ে সে কোনো কার্য করিত না। সে নিতান্ত অশিক্ষিত, কোনো বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি তাহার ছিল না। লোকে তাহাকে প্রায়ই 'রামা পাগ্‌লা' বলিয়া ডাকিত। কে তাহকে ভাল বলে, কে তাহাকে মন্দ বলে সে বিষয়ে সে কোনোদিন চিন্তাও করিত না। অন্যের কষ্ট দেখিলে তাহার মনে বড় দুঃখ হইত, সুতরাং সুদ্ধ কেবল হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপরের কষ্ট নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিন্তু নিজের কষ্ট হইলে সে অপরের সাহায্যার্থী হইত না। পূর্বে তাহার শরীরে অত্যন্ত বল ছিল, কিন্তু আজকাল দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বামহস্তে বাঁশের লাঠিখানি ধরিয়া রামা আগে আগে চলিয়া যাইতেছে। সাবিত্রী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। কিন্তু সাবিত্রী আর চলিতে পারে না। রামা দুই চারি পা চলিয়া সাবিত্রীর নিমিত্ত বার বার থামিতেছে। তাহার দক্ষিণহস্ত একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছে এবং অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

রামা চলিয়া গেলে পর তাহার মাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রামা নষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী অত্যন্ত সুন্দরী, সুতরাং তাহার প্রতি রামার মন আকৃষ্ট হইয়াছে।

কতক দূরে গেলে পর সাবিত্রী রামাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রামা, তোমার ডান হাতে কী হইয়াছে?'

রামা। বড় আহাম্মকি করিয়াছি। (হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া) এই আঙুলটা দা দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছি। ভাল অস্ত্র দ্বারা কাটিলে এমন হইত না। দুই কোপে কাটিয়া ফেলিয়াছি, তাই এত কষ্ট পাইতেছি।

সাবিত্রী। (অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া) হাতের বুড়ো আঙুল কাটিলে কেন?

রামা। আমাদের এ কুঠির তাঁতিদের যে কী বিপদ হইয়াছে তাহা শোন নাই?

সাবিত্রী। না, আমি বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি তো আর শীঘ্র বাড়ির বাহির হই নাই।

রামা। আমাদের এ-কুঠির তাঁতিদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন হাতের আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছে। এখন শালা নবাব একেবারে কোম্পানি বাহাদুরের গোলাম। কোম্পানির লোকেরা একেবারে সকলের সর্বনাশ করিতেছে। সেদিন আমাদের কুঠির সমুদয় তাঁতিদিগকে ইংরাজের লোকেরা ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল।* আরাটুন সাহেব আমাদিগকে রাখিতে পারিলেন

*Vide note (13) in the appendix

না। সাহেবের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, 'মহারাজ নন্দকুমার নাই, রেজা খাঁ দেওয়ান; কোম্পানির লোক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে।'

সাবিত্রী। সেজন্য আঙুল কাটিলে কেন?

রামা। আজ সতের দিন হইল আমাদিগকে ধরিয়া নিয়া কোম্পানির কুঠিতে কাজ করাইতেছে। কাজের সময় জমাদার কাছে বসে। একটু কাজে গাফিলি হইলে চাবুক মারে। তামাক খেতে দেয় না। তারপর মাসে মাত্র দেড় টাকা করিয়া মাহিয়ানা দিবে। সে আবার মাস কাবার না হইলে দিবে না। সেই টাকা হইতে রামহরিবাবুর তহরী ছয় পয়সা কাটিয়া নিবে। জমাদার ও প্যাদাদিগের তহরী এক আনা। মোট এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা পাব। তাও আবার পরের মাসে। বল দেখি কি খাই? এখানে আড়াই টাকা করিয়া মাহিনা পাইতাম। হিন্দু পর্ব, মুসলমানি পর্ব, সকল পর্বেই মেমসাহেব দুই আনা করিয়া সকলকেই পার্বণী দিয়াছেন। ঘরে চাউল না থাকিলে, মা আয়াঝির কাছে গিয়াছে, মেমসাহেব গোলা হইতে চাউল দিতে হুকুম করিয়াছেন। আর কি এমন মনিব মিলিবে? মেমসাহেব যেন ঠিক মা লক্ষ্মী! লোকের উপর বড় দয়া!

সাবিত্রী। তাতে আঙুল কাটিলে কেন? সাহেবেরা কি আঙুল কাটিয়া দিয়াছে?

রামা। সাহেবরা আঙুল কাটিবে কেন? আমরা নিজে নিজে আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না। আমরা আঙুল কাটিয়া সাহেবকে বলিয়াছি, দেখো সাহেব আমার আঙুল নাই; আমি রেশম তুলিতে পারি না।

সাবিত্রী। সাহেব কি তাহাতে তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছে?

রামা। প্রথম যে দুইজন কাটিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু অনেকে আঙুল কাটিয়াছে পরে ভারি গোল আরম্ভ হইয়াছে। কী হয় বলিতে পারি না। আঙুল নাই, এখন রেশম তুলি কী করে? শালা সাহেব কাজেই ছাড়িয়া দিবে।

রামার এই কথা সমাপ্ত হইতে-না-হইতে, তাহারা দুইজনে সভারামের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল। সাবিত্রীর পরিধেয় বস্ত্র পূর্বেই ভিজিয়া গিয়াছিল। রামার বাড়ি হইতে আসিবার সময়ও একটু একটু বিষ্টি পড়িতেছিল। সুতরাং রামার কাপড়ও এখন ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার জ্বর ছিল। সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'সাবিত্রী দেখ তো আগুন জ্বালিতে পার কি না, আমার বড় শীত করিতেছে।'

সাবিত্রী অন্ধকারের মধ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার পিতার গাত্র বস্ত্র জলে ভিজিয়া রহিয়াছে। শরীর একেবারে শীতল হইয়া পড়িয়াছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। সে তাহার পিতাকে বারম্বার ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পিতা অচৈতন্যবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কোনো উত্তর পাইল না। তখন সে বাহির হইতে কিছু শুষ্ক খড় সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিল, পিতার গাত্রের সিক্তবস্ত্র উঠাইয়া ফেলিল, তাহার শরীর উষ্ণ করিবার নিমিত্ত নিজের হাত অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। কিন্তু

তাহার পিতার আর চেতনা হইল না। সাবিত্রী পূর্বে কখনো কাহারও মৃত্যু দেখে নাই। লোকের মৃত্যুকালে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা সে জানিত না। সুতরাং তাহার পিতার যে মৃত্যুকাল উপস্থিত তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু রামা শত শত লোকের মৃত্যু-শয্যায় তাহাদিগকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে। গ্রামস্থ লোকের বাড়িতে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, প্রায় সকলেই রাত্রি জাগরণ করিবার নিমিত্ত রামাকে ডাকিত। রামা যে কেবল রোগীর শুশ্রূষা করিত এমন নহে, রোগীর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করিবার নিমিত্ত নিজে মাথায় করিয়া দোকান হইতে কাষ্ঠ আনিত এবং চিতা খনন করিত। যাহা কিছু পরিশ্রমের কার্য তাহা লোকে রামার দ্বারা করাইয়া লইত, কোনো কোনো লোকের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে সে সাতরাত্র একাদিক্রমে জাগরণ করিয়াছে। সভারামকে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে দেখিয়া রামা তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। রামা লোকের নাড়ী দেখিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিত।

নাড়ী দেখিয়া অতিশয় ত্রস্ততার সহিত রামা সাবিত্রীকে বলিতে লাগিল, 'সাবিত্রী আর কী দেখিতেছ? তোমার বাবা এখনই মরিবেন। আর বড় দেরি নাই। এ যে মৃত্যুকাল উপস্থিত। দেখ নারায়ণক্ষেত্রর কোনো যোগাড় করিতে পার কি না। বুড়া সভারামের নারায়ণক্ষেত্র হবে না? তোমাদের বাড়িতে নিমগাছ, আর বেলগাছ তো আছে। এখন বড় কেন্দে-কেটে অস্থির হইও না। না, তুমি কিছু পারিবে না। আমি বেলের ডাল তুলসীগাছ আনিতেছি।' এই বলিয়া রামা তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল।

সাবিত্রী চমকিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বারম্বার অশ্রুপূর্ণ নয়নে ডাকিতে লাগিল, 'বাবা! বাবা! বাবা!' কিন্তু কোনো উত্তর নাই।

নারায়ণক্ষেত্র রচনা করিতে, যে যে গাছের আবশ্যক হয়, তৎসমুদয় রামা ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে লাগিল। রামার দক্ষিণহস্ত সবল থাকিলে কিছুই কষ্ট হইত না। বামহস্ত দ্বারা সকল কার্য সহজে করিতে পারিল না। অতিকষ্টে বামহস্ত দ্বারা একটা তুলসীগাছ সমূলের উৎপাটন করিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ফুলগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া গৃহের প্রাঙ্গণে নারায়ণক্ষেত্র প্রস্তুত করিল। তৎপর আবার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সভারামকে কষ্টের সহিত শ্বাস ফেলিতে দেখিয়া বলিল, 'সাবিত্রী, তোমার পিতাকে ধর, এখন ঘরের বাহির করিতে হইবে।'

সাবিত্রী হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কিন্তু রামা বারম্বার তাহার পিতাকে ধরিয়া উঠাইতে বলিতে লাগিল। সে কান্দিতে কান্দিতে পিতার মস্তকের দিক ধরিয়া উত্তোলন করিল। রামা বামহস্ত দ্বারা তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। অতিকষ্টে দুইজনে সভারামকে গৃহের বাহির করিয়া, রামা যে স্থানে নারায়ণক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল, সেই স্থানে আনিয়া রাখিল। সে মৃতবৎ মৃত্তিকার উপর পড়িয়া রহিল। বাহিরে এখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। গগনে আর মেঘ নাই। সাবিত্রী পিতাকে বারম্বার ডাকিতে লাগিল, বারম্বার করুণস্বরে বলিতে লাগিল,

'বাবার মৃত্যুকালে যদি তাঁহার একটি কথা শুনিতে পাইতাম! আর তো বাবার মুখের কথা শুনিব না!'

রামা বলিল, 'সাবিত্রী, তুমি তোমার পিতার কানের কাছে হরিনাম বল। আমি দেখিয়াছি অনেক লোক নারায়ণক্ষেত্রেও হরিনাম শুনিয়া জাগিয়া উঠে।'

সাবিত্রী বারম্বার পিতার কানের নিকট বলিতে লাগিল, 'হরি হরি, বিপদভঞ্জন হরি, —দয়াময় ঠাকুর হরি,—রাম—রাম।'

অনেকক্ষণ সভারামের কানের নিকট হরিনাম বলিতে বলিতে, তাহার চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হইল, নির্নিমেষদৃষ্টি সাবিত্রীর মুখোপরি আবদ্ধ হইয়া রহিল, যেন সে কী এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা জাগ্রত হইয়াছে।

সাবিত্রী ডাকিল, 'বাবা!' বৃদ্ধের ওষ্ঠদ্বয় নড়িতে লাগিল, বোধ হইল, যেন কী বলিতে চাহিতেছে; কিন্তু কথা ফুটিল না, তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল।

সাবিত্রী আবার বলিল, 'বাবা! বাবা! আমাকে ফেলিয়া চলিলে? বাবা! একটি কথা কও, আমি তোমার সাবিত্রী।'

বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক অতিকষ্টে বলিল, 'যা—ই—হলধর—ম—হ—র—'

ইহার দুই এক মুহূর্ত পরেই সভারাম মুখ বিকৃত করিল। এই তাহার অন্তিমকাল। শারীরিক সকল কষ্ট অতিক্রম করিয়া আত্মা অমৃতধামে চলিল। দেখিতে না দেখিতে সভারামের শরীর জীবনশূন্য হইল।

নিতান্ত দীনদুঃখীর বেশে বঙ্গের একজন বিখ্যাত তন্তুবায় সভারামও সংসার পরিত্যাগ করিল। ইহার নির্মিত বস্ত্র সর্বদাই নবাবের রাজপ্রাসাদ সুশোভিত করিয়াছে; ইহার নাম বঙ্গদেশের সমুদয় ঐশ্বর্যশালিনী ভদ্র মহিলাদিগের নিকটেও পরিচিত ছিল। অনাহারে আজ সভারামের মৃত্যু হইল। কিন্তু পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এখনও সভারামের শয়ন গৃহের মৃত্তিকার নিচে পড়িয়া রহিয়াছে। এ সংসারের কষ্ট যন্ত্রণা কেবল ধন-সম্পত্তির দ্বারা নিবারিত হয় না।

মনুষ্যের হৃদয়স্থিত স্বার্থপরতা, দ্বেষ ও হিংসা সর্বদা বিষ উদগীরণ করিতেছে। সামাজিক বায়ু সেই কালকূট সংস্পর্শে বিষাক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংসারের দ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতা সমূলে বিনষ্ট না হইলে, কেহই এ সংসারে সুখ-শান্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কে আজ সভারামকে দীনহীনের বেশে এ সংসার হইতে বিদায় দিল? সভারামের শেষাবস্থার এইরূপ দুঃখ যন্ত্রণার মূল কারণ কে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলিবেন যে কাশিমবাজারের ইংরাজ বণিকগণই ইহার মূল কারণ, কেহ বলিবেন সেই বঙ্গীয় কুলাঙ্গার রামহরি চট্টোপাধ্যায় ইহার একমাত্র কারণ; রামহরির পরামর্শেই ইংরাজগণ সভারামের পুত্রদিগকে দাদনের টাকা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু পাঠক কার্যকারণের শৃঙ্খল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একবার পর্যালোচনা কর। বঙ্গীয় সমাজে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের

সহানুভূতির অভাব, বঙ্গীয় সমাজ প্রচলিত জনবিশেষের ঘোর স্বার্থপরতাই সভারামের এই দুরবস্থার একমাত্র মূল কারণ ছিল। রামহরি কিরূপে ঈদৃশ কুৎসিত চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল? বঙ্গের তৎসাময়িক সামাজিক অবস্থাই শত শত রামহরি উৎপাদন করিয়াছিল। বঙ্গবাসীদিগের স্বার্থপরতা সম্ভূত কাপুরুষতা, বঙ্গবাসীদিগের পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব ইংরাজদিগের এইরূপ অবৈধ আধিপত্য সংস্থাপনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমাজ প্রচলিত স্বার্থপরতা ও পাপরাশি সময়ে সময়ে দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমাজস্থ সমুদয় নরনারীকে এইরূপে ভস্মীভূত করে। হীনবুদ্ধি লোক মনে করে সংসারে অন্যের কষ্ট, অন্যের দুঃখ হইলে আমার কী ক্ষতি হইবে? আমার স্ত্রী পুত্রের কোনো কষ্ট না হইলেই হইল। কিন্তু কোনো এক পল্লীর এক প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র গৃহে আগুন লাগিলে যেমন ক্রমে ক্রমে সেই অগ্নি অপর প্রান্তস্থিত গৃহগুলি পর্যন্ত ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার সমাস্থিত কোন এক শ্রেণীস্থ লোকের দুঃখ দারিদ্র্য বিবিধ পাপরাশি উৎপাদন পূর্বক তদ্দ্বারা সমুদয় মানব সমাজকে দগ্ধ করিতে থাকে। পাঠক যদি সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর, যদি আপনার মঙ্গল চাও, তবে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা কর, সমাজ-প্রচলিত সর্বপ্রকার পাপ দুঃখ ও দারিদ্র্যের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হও। যতদিন এ সংসারে পাপ ও অত্যাচার থাকিবে, যতদিন জনবিশেষের স্বার্থপরতা সামাজি সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবে, ততদিন সেই দাবাগ্নিস্বরূপ প্রজ্জ্বলিত পাপানলের আক্রমণ হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।

এই সময়ে যদি বঙ্গীয় সমাজের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহানুভূতি থাকিত, একজনের দুঃখ কষ্ট দর্শনে যদি অপরের হৃদয় ব্যথিত হইত, প্রত্যেকেই যদি আপন প্রতিবেশীকে অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, তবে কি আজ সভারামের এইরূপ দুরবস্থা হইত? তবে কি আজ বঙ্গদেশ সভারামের ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্মাতা পরিশূন্য হইত? তবে কি আজ মুর্শিদাবাদ প্রায় তন্তুবায় শূন্য হইয়া পড়িত?

সংসারের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ হইতে নির্মুক্ত হইয়া সভারাম সেই অমৃতময়ের অমৃতধামে চলিয়া গেল। তাহার দুঃখিনী অনাথা কন্যা সাবিত্রী পিতার মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া ধরাতলে বসিয়া রহিল। সে ক্রন্দন করিতেছে না, তাহার চক্ষু হইতে একবিন্দু জল পড়িতেছে না। পাঠক ও পাঠিকাগণ মনে করিবেন সাবিত্রীর হৃদয়ে পিতৃবাৎসল্য ছিল না না। কিন্তু শোকাকুলাবস্থায় বিলাপ করিবার নিমিত্ত অবকাশের প্রয়োজন হয়। দুঃখিনী অনাথা সাবিত্রীর বিলাপ করিবারও অবকাশ নাই। যাহার শোকের উপর শোক, দুঃখের উপর দুঃখ, কষ্টের উপর কষ্ট, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা সে কি অশ্রু বিসর্জন করিতে সময় পায়? আর মনুষ্যের চক্ষে কত জলই বা সঞ্চিত থাকিতে পারে? আজ সাতমাস পর্যন্ত এই দুঃখিনীর চক্ষের জল অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। আজ ইহার চক্ষে আর জল নাই। চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হৃদয় দুঃখভারে একেবারে স্পন্দনরহিত হইয়া পড়িয়াছে। বক্ষের

উপর একখানি ক্ষুদ্র ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইলে শারীরিক বেদনা প্রাপ্তি-নিবন্ধন শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে, কিন্তু পর্বতসদৃশ গুরুভার শিশুর বক্ষে স্থাপন করিলে আর সে ক্রন্দন করিতে পারে না। যে পরিমাণ শোক দুঃখ উপস্থিত হইলে লোক বিলাপ পরিতাপ করিয়া হৃদয়ভার দূর করে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিকতর শোক দুঃখ সাবিত্রীর হৃদয় পেষণ করিতেছে। পর্বত সদৃশ দুঃখভার তাহার বক্ষ চাপিয়া রহিয়াছে। তাই সাবিত্রী ক্রন্দন করিল না, তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইল না। এখন সেই দুঃখভারাক্রান্ত মন হইতে স্নেহ, দয়া ও মমতাকে বিদায় দিয়া, সে কেবল কঠিন কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল।

সাবিত্রী তাহার পিতার একমাত্র কন্যা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে বিশেষ আদরের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের কন্যাদিগকে যদ্রূপ বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ গৃহকার্য করিতে হয়, সাবিত্রীকে বাল্যকালে সেইরূপ গৃহকার্যে লিপ্ত হইতে হয় নাই। তাহার তিনজন ভ্রাতৃবধূ ছিল। তাহারাই সমূদয় গৃহকার্য করিত। সভারাম এবং তাহার পুত্রগণ সাবিত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। তাহারা বাল্যকালে সাবিত্রীকে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতে শিখাইয়াছে। কীর্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী ইত্যাদি সেই সময়ের পাঠ্যপুস্তক সাবিত্রী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিত। কখনো কখনো সভারামের নিকটে বসিয়া তাহাকে এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইত। এই সকল পুস্তক প্রতিপাদিত ধর্ম সংস্কার সাবিত্রীর মজ্জাগত ভাব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহার পিতার মৃত্যু হইবামাত্র তাহার মনে হইল যে রাত্র থাকিতে থাকিতে পিতার মুখানল না করিলে, তাহার পরলোকগত আত্মার অনিষ্ট হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, অতি কাতরকণ্ঠে রামাকে সম্বোধনপূর্ব বলিতে লাগিল, 'রামা! আর বড় রাত নাই। রাত থাকিতে বাবাকে দাহ করিতে আরম্ভ না করিলে, বাবা বাসিমড়া হইবে। সে বড় পাপ। আমার বাবার শেষকালে তো এই দুর্গতি হইল। পরকালেও আবার দুর্গতি হইবে। এখন কী কবির বল। কোথায় কাঠ পাইব, কিরূপেই বা চিতা খনন করিব? হা বিধাতা! আমার একজন নয়, দুইজন নয়, তিনজন ভাই। আমার স্বামীকে দেখাইয়া বাবা বলিতেন যে, আমার এখন চারিপুত্র। আজ তাঁহার চারিপুত্র কোথায় রহিল? আজ তাঁহারা কাছে থাকিলে কি বাবার এই দশা হইত? রামা আমার ভাই নাই, স্বামী নাই, সকলই গিয়াছে, এখন তুমিই আমার ভাই। তুমিই আমার দাদা। আমার বাবাকে যাহাতে রাত্রি থাকিতে দাহ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, অন্যের কাতরোক্তি শুনিলে রামার হৃদয় বড়ই বিগলিত হইত। বিশেষত মিষ্ট ভাষায় রামকে কেহ কোনো কার্য করিতে বলিলে, সে প্রাণ বিসর্জন করিয়াও তাহার সম্পাদন করিতে যত্ন করিত। কিন্তু কর্কশ বাক্য বলিয়া, কিম্বা ধমকাইয়া রামা দ্বারা কোনদিনও কেহ কোনো কার্য করাইতে পারিত না।

রামা সাবিত্রীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, 'ভয় নাই। আমি রাত্রি থাকিতে থাকিতে, এ

বুড়াকে শ্মশানে উঠাইয়া দিব। রামা থাকিতে আমাদের বুড়া সভারাম বাসিমড়া হইবে? তুমি বড়-একটা কান্নাকাটি করিয়া আমাকে ত্যক্ত করিও না।'

এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া, রামা বড় একটা আমগাছে উঠিয়া যত শুষ্ক ডাল ছিল, তাহা বামহস্ত দ্বারা ভাঙ্গিতে লাগিল। এই প্রকারে একঘণ্টার মধ্যে দুই-তিনটা আমগাছের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল। পরে একটি চিতা খনন করিয়া রাত্রি অবসানের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব সভারামকে দাহ করিতে আরম্ভ করিল। সাবিত্রী অগ্রে সভারামের মুখে অগ্নি প্রদান করিল। যখন সভারামের শরীর প্রায় অর্ধ দগ্ধ হইয়াছে তখন রাত্রি অবসান হইল। এত দুঃখের মধ্যেও সাবিত্রী মনে মনে একটু আরাম বোধ করিতে লাগিল। রাত্রের মধ্যেই যে তাহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই তাহার বর্তমান আনন্দের একমাত্র কারণ।

এদিকে রাত্রি অবসান হইবামাত্র রামার মা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই, সক্রোধে বকিতে বকিতে আরাটুন সাহেবের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের যে প্রকোষ্ঠে বদরন্নেসা ও আরাটুন সাহেবের স্ত্রী বসিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল, 'দেখ আয়া-ঝি, সভারামের মেয়ে সাবিত্রীর যন্ত্রণায় এ পাড়ায় লোক থাকিতে পারিবে না। কাল রাত্রে সে কাশিমবাজারে কোন সাহেব-সুবার বাড়ি গিয়াছিল। রাত দুপুরের সময় আমার বাড়ি আসিয়া আমার রামাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছে। আমার রামা পাগল হউক, মূর্খ হউক, তার এ সব দোষ কোনোদিন ছিল না। কিন্তু কাল যে সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়াছে আর সমস্ত রাত্রেও ফিরিয়া আসে নাই। এত বেলা হইয়াছে এখনও আসিল না। আমি এখন সভারামের বাড়ি যাইয়া, রামাকে ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে লইয়া আসিব।'

আরাটুন সাহেবের স্ত্রী এবং বদরন্নেসা রামার মার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। সাবিত্রী রাত্রে কাশিমবাজারে গিয়াছে, এ কথা তাঁহারা কখনো বিশ্বাস করিলেন না। আরাটুন সাহেবের স্ত্রী বলিলেন, 'রামার মা তুই স্বপ্ন দেখিয়াছিস নাকি যে সাবিত্রী তোর বাড়ি আসিয়া রামাকে নিয়া গিয়াছে? সাবিত্রীকে আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষরূপে জানি। সাবিত্রী রাত্রে কাশিমবাজারে গিয়াছে, পরে তোর রামাকে ডাকিয়া নিয়াছে, এ তো আমি স্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না।'

রামার মা। মেমসাহেব আপনি লোকের ভাবগতিক কিছুই বোঝেন না। সকলকে ভালমানুষ মনে করেন। আমি মানুষটা দেখলেই তাহার পেটের কথা বুঝিতে পারি। লোকের ভাবগতিক দেখতে দেখতে তিন কাল গেল।

বদরন্নেসা। সত্য সত্যই সাবিত্রী রাত্রে তোর বাড়ি আসিয়াছিল? তবে আমাকে খবর দিলি না কেন?

রামার মা। আয়া-ঝি! আপনাকে খবর দিতে বার বার আমাকে সে বলিতেছিল বটে।

ও সব লোকের আর কি আর লজ্জা আছে? কতই রঙ্গ করিতে লাগিল। তাই আমি আর ওর কথায় ভুলিব। একবার কাঁদিতে লাগিল।

বদরন্নেসা। তোর নিকট কী বলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল?

রামার মা। আর বলিবে কী। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আজ রামহরিবাবু লোকজন সঙ্গে করিয়া আমার বাড়ি গিয়াছিল, আমাকে ধরিয়া কাশিমবাজারে নিয়া যায়, পরে পলাইয়া আসিয়াছি। আমার বাবার কী হইয়াছে বলিতে পারি না। আমার ভয় করে। রামাকে বল আমাকে বাড়ি রাখিয়া আসুখ।'

আরাটুন সাহেবের স্ত্রী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত বলিলেন, 'আহা, সর্বনাশ হইয়াছে। বোধহয় সেই হতভাগা রামহরি আবার এই অনাথা মেয়েটাকে যন্ত্রণা দিতেছে।' তখন আবার বদরন্নেসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মা! সাবিত্রীর কী হইয়াছে একবার জানিয়া আইস। না হয় আমাদের কুঠিতে এই অনাথা দুঃখিনীকে কুঁড়ে তুলিয়া দিব। তাহার বুড়া বাপকে নিয়া আমাদের বাড়িতে থাকিবে।'

আরাটুন সাহেবের পত্নী বদরন্নেসাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বদরন্নেসা অতি সত্বর বস্ত্র পরিধান পূর্বক রামার মাকে সঙ্গে করিয়া, সভারামের বাড়ির দিকে চলিল।

পথে রামার মা বলিল, 'আয়া-ঝি, আমাদের মেমসাহেব লোকের চালচরিত্র কিছুই বোঝেন না। মেমসাহেব এখনও যেন সেই কচি মেয়ে। তুমি তো বুড়া হইয়াছ। তুমি এ সব কিছু না বুঝিতে পার তা নয়।'

বদরন্নেসা সাবিত্রীর দুঃখের বিষয় মনে মনে ভাবিতেছিল। রামার মার কথায় বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিল না। সে মৌনাবলম্বনপূর্বক ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু রামার মা তাহাকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল যে, বদরন্নেসাও সাবিত্রীকে কুলটা রমণী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কিন্তু রামার মার ন্যায় বদরন্নেসার অন্তরাত্মা অপবিত্র ছিল না। সে সাবিত্রীকে কখনো ভ্রষ্টা বলিয়া মনে করে নাই।

কিছুকাল পরে উভয়েই সভারামের বাড়ি পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল যে, সাবিত্রী এবং রামা সভারামের মৃতদেহ দাহ করিতেছে। বদরন্নেসা সাবিত্রীর বিষাদ ও নিরাশাপরিপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া, আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু রামার মা বিস্মিতক্ষেত্রে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে রামার মা বদরন্নেসার কানের নিকট মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল, ইহার তো কিছু ভাব বুঝিতে পারি না। সাবিত্রী রামাকে লইয়া পলাইয়া যাইবে বলিয়া, ইহারা দুজনে পরামর্শ করিয়া এই বুড়া সভারামকে মারিয়া ফেলিয়াছে নাকি?' রামার মার এই কথা শুনিয়া বদরন্নেসা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। রামার মাকে হস্তদ্বারা ধাক্কা দিয়া বলিল, 'হারামজাদী আমার কাছ থেকে দূর হ, তুই চিরকাল কুকার্য করিয়াছিস, তাই তুই সকলকেই কুচরিত্র মনে করিস।'

রামার মা চুপ করিয়া রহিল। প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। বদরন্নেসা আরাটুন সাহেবের গৃহের কর্ত্রী। আরাটুন সাহেবের স্ত্রী তাহাকে মাতার ন্যায় সম্মান করেন, সুতরাং রামার মা তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু মনে মনে বলিল, 'আমি চিরকাল কুকার্য করিয়াছি, তুমি বড় ভাল!' বদরন্নেসা রামার মাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিলে পর সে আর কখন সাবিত্রীর বিরুদ্ধে কোনো কথা মুখে আনে নাই। এই দিন হইতে সাবিত্রীর প্রতি সে মুখে সর্বদাই ভালবাসা প্রকাশ করিত।

বঙ্গীয় পাঠকগণ, বিশেষত পাঠিকাগণ হয়তো রামার মাকে বড় মন্দলোক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকের মধ্যেও, শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বঙ্গদেশীয় অনেকানেক মহাত্মা ভদ্রমহিলাদিগের চরিত্র সমালোচনা করিবার সময়, ঠিক একেবারে রামার মা হইয়া পড়েন। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকানেক রামার মা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর অশিক্ষিতা রামার মা যে বড় গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী, তাহা আমরা মনে করি না। মানুষ শিক্ষিতই হউক, আর অশিক্ষিতই হউক, যদি তাহার নিজের চরিত্র পবিত্র না হয়, যদি তাহার হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ না হয়, যদি কুসংস্কার এবং আত্মম্ভরিতা তাহার হৃদয় হইতে বিদূরিত না হয়, যদি সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তাহার অনুরাগ না থাকে, তবে চিরকালই সে রামার মা হইয়া, পশুজীবন যাপন করিবে, অতি নির্মল চরিত্রেও কলঙ্ক ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু রামার মার ন্যায় অশিক্ষিত মানুষ অপরের ভর্ৎসনার নিকট মস্তক অবনত করে। শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বঙ্গীয় যুবক নিজের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত তর্কশাস্ত্রের কথা বাহির করিতে থাকেন, তাহারা কিছুতেই নির্বাক হইবার পাত্র নহেন।

সাত
আরাটুন সাহেবের পত্নী

সভারামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল—তাহার শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। এ সংসারে আর তাহার অন্য কোনো চিহ্ন রহিল না। রহিল কেবল তাহার জগদ্ব্যাপ্ত শিল্প নৈপুণ্যের যশ। কেবল তাহার শেষাবস্থার দুঃখ কষ্টের কাহিনী।

সাবিত্রী স্বহস্তে কলসী ভরিয়া, পুষ্করিণী হইতে জল উঠাইয়া, তাহার পিতার চিতানল নিবাইল, চিতা হইতে অঙ্গার উঠাইয়া ফেলিয়া তাহা পরিষ্কার করিল, পরে মৃত্তিকা দ্বারা চিতার গর্ভ ভরিয়া ফেলিল। রামা তখন একটি তুলসীগাছ সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিল। চিতার উপরিস্থ মৃত্তিকাতে সাবিত্রী সেই গাছটি রোপণ করিল। পরে স্নানার্থ রামা ও সাবিত্রী উভয়েই ভাগীরথীর নিকট আসিল। সাবিত্রী ভাগিরথীতে স্নান ও তর্পণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বদরন্নেসা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সেও সাবিত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বাড়িতে চলিল। রামা ভাগীরথীতে স্নান করিয়াই স্বীয় জননীর সঙ্গে আপন বাড়িতে চলিয়া গেল।

যে ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে সাবিত্রী বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া বাস করিতেছিল, আজ আর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। পিতার শেষাবস্থার দুঃখ কষ্ট স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে এখন সে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এ পর্যন্ত তাহার বিলাপ করিবার অবকাশ ছিল না। কিরূপে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবে, এই চিন্তা তাহার হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে চিন্তা নাই। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়াছে। শোক দুঃখ শূন্য অন্তর প্রাপ্ত হইয়া বেগে তৎক্ষণাৎ হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। এ গুরুতর শোকভার সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া সাবিত্রী গৃহদ্বারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বসিয়া রহিল।

বদরন্নেসা বলিতে লাগিল, 'বাছা ! তুমি এখন একাকিনী এখানে কিরূপে থাকিবে ? তুমি আমার সঙ্গে চল। আমাদের কুঠির পার্শ্বে তোমার নিমিত্ত একখানি কুঁড়ে তুলিয়া দিব। পরে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তোমার বড় ভাই এবং স্বামী যখন জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দেশে আসিবেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আপন বাড়িতে আসিয়া বাস করিবে।'

কোথায় থাকিবে ? কিরূপে জীবন কধারণ করিবে ? এ প্রশ্ন এখন পর্যন্তও সাবিত্রীর

হৃদয়ে সমুদিত হয় নাই। কিরূপেই বা হইবে? পিতার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র চিন্তা পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়া কিরূপে সম্পাদন করিবে। তৎপরে দারুণ শোকানলে তাহার হৃদয় প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। সে অচৈতন্যবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। নিজে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে এ চিন্তা সে পূর্বেও কখনো করিত না। ইহাদের বাড়ি লুঠ হইয়াছে পর সাবিত্রী একটি দিনও নিজের সুখশান্তি ও নিজের সম্বন্ধে কখনো চিন্তা করে নাই। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইয়া, সুদ্ধ কেবল বৃদ্ধ পিতার কষ্ট কিরূপে নিবারণ করিবে, তাহাই চিন্তা করিত। এখন বদরন্নেসার কথা শুনিয়া তাহারও মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল— কোথায় থাকিব? অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী কি একাকিনী এই জনশূন্যগৃহে বাস করিতে পারে! বিশেষত পূর্বরাত্রের ঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিতে লাগিল কী জানি, আবার যদি সেই নরপিশাচ রামহরি আসিয়া আক্রমণ করে! এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বদরন্নেসার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে আরাটুন সাহেবের কুঠিতে চলিল।

ইহারা দুইজনে কুঠিতে পৌঁছিয়াই দেখিতে পাইল যে, আরাটুন সাহেবের স্ত্রী তাঁহার নিজের শয়নগৃহের অনতিদূরে একখানি কুঁড়েঘর নির্মাণার্থ অনেক লোকজন নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা আর দুই চারি ঘণ্টা খাটিলেই গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করিতে পারিব। সাবিত্রীর প্রমুখাৎ আরাটুন সাহেবের পত্নী পূর্বরাত্রের সমূদায় ঘটনা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। মেমের হৃদয় অত্যন্ত দয়াপ্রবণ, সাবিত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

এই সহৃদয়া রমণী সাবিত্রীর প্রতি যার পর নাই দয়া প্রকাশ করিলেন। নিষ্ঠুর রামহরির হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় ভবনে ইহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই রমণী কে, তাহা জানিবার নিমিত্ত পাঠকগণের বিশেষ কৌতূহল জন্মিতে পারে, অতএব পাঠকদিগের এই কৌতূহল তৃপ্তি করিবার অভিপ্রায়ে, সদাশয়া রমণীর এবং বদরন্নেসার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

বঙ্গের সুবাদার আলিবর্দি খাঁর সিংহাসনাধিরোহণের অব্যবহিত পরে ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মীর হোসেনালি নামক আলিবর্দির একজন বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ বীরত্ব এবং রণকৌশল প্রকাশ পূর্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন। আলিবর্দি তাঁহাকে অনতিবিলম্বে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মীরজাফর, মীর হোসেনের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মীর হোসেনালি স্বীয় কনিষ্ঠ মীরজাফরকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিতেন। কিন্তু কামাসক্ত কাপুরুষগণ প্রায়ই ঘোর অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। মীরজাফর গোপনে বিষ প্রদানপূর্বক জ্যেষ্ঠের প্রাণবধ করিলেন। আলিবর্দি হোসেনালির মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিলেন না। সুতরাং হোসেনের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর জাফরালিকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। জাফরালি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্তির

পর স্বীয় ভ্রাতা হোসেনালির প্রধান প্রধান পত্নীদিগকে স্বীয় অন্তঃপুরভুক্ত করিলেন। হোসেনালির দশ বার জন পরমাসুন্দরী বিবাহিতা স্ত্রী এবং শতাধিক উপপত্নী মীরজাফরের অন্দরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু হোসেনালি যৌবনের প্রারম্ভে একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়া, মুসলমান ধর্মানুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই হোসেনালির সর্বপ্রধান পত্নী ছিলেন। হিন্দুরমণীগণ জাতিভ্রষ্ট হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হইতেন না। সতীত্বধর্ম ইহাদিগের প্রকৃতিগত ভাব। হোসেনালির ঔরসে এই ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। ইনি স্বামীর মৃত্যুর পর আপন সতীত্বরক্ষা করিবার নিমিত্ত পুত্র-কন্যার সহিত পলায়ন পূর্বক সৈদাবাদের নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্রের নাম মীরমদন এবং কন্যার নাম বদরন্নেসা ছিল। কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র মীরমদনের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর এবং বদরন্নেসার বয়স চতুর্দশ বৎসর ছিল। মীরমদন যৌবন প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই নবাব সরকারে সেনাপতির কার্যে নিযুক্ত হইলেন, পরে কোনো ভদ্রবংশজাতা মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মীরমদন সর্বাংশেই তাঁহার পিতার প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার বীরোচিত স্বভাব, পিতার সদাশয়তা, পিতার উদারতা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্যেই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু বদরন্নেসা মাতৃপ্রকৃতি লাভ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন বিমাতাদিগকে পরহস্তগত হইতে দেখিলেন, তখন হইতেই মুসলমানদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার মনে অত্যন্ত অবজ্ঞা উপস্থিত হইল।

তিনি মুসলমানদিগের বহু বিবাহ প্রথা সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই মনে মনে স্থির করিলেন, যে, আজীবন অবিবাহিতা থাকিলেও কখনো কোনো মুসলমানের পাণিগ্রহণ করিবেন না। সুতরাং বদরন্নেসার আর বিবাহ হইল না। তাঁহার বিবাহ হইবার কোনো সম্ভাবনাও রহিল না। তিনি মুসলমান কন্যা। তাঁহাকে কি আর নবদ্বীপের ভট্টাচার্য তনয় বিবাহ করিতে আসিবেন ? বদরন্নেসা স্বীয় সহোদর মীরমদনের পরিবারের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। মীরমদনের সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র কন্যা ছিল। সেই কন্যাটিকে অতিশয় স্নেহের সহিত তিনি প্রতিপালন করিতেন, প্রাণাপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসিতেন।

মীরমদনের সহিত সৈদাবাদের আরমানিয়ান বণিক স্যামুয়েল আরাটুন সাহেবের অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। আরাটুন সাহেব প্রায় প্রত্যহই মীরমদনের বাড়ি আসিতেন এবং তাহার সহিত একত্রে আহারাদি করিতেন। স্যামুয়েল আরাটুনের স্ত্রীও কখনো কখনো মীরমদনের বাড়ি আসিয়া মীরমদনের স্ত্রী এবং বদরন্নেসার সহিত একত্রে আহারাদি করিতেন।

কিছুকাল পরে স্যামুয়েল আরাটুন সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী চারি বৎসর বয়স্ক একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। এই বালকটির নাম ক্যারাপিট

আরাটুন। ক্যারাপিট মাতৃ বিয়োগের পর প্রায়ই মীরমদনের বাড়ি থাকিত। বদরন্নেসা তাহাকে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। মুসলমানদিগের স্ত্রীলোকরা কখনো ঘরের বাহির হন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কাহারও দেখিবার সাধ্য নাই। স্যামুয়েল আরাটুন ইতিপূর্বে কখনো বদরন্নেসাকে দেখেন নাই; কিন্তু বদরন্নেসার সহৃদয়তার কথা তাঁহার স্ত্রীর মুখে অনেকবার শুনিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিয়োগের পর বদরন্নেসা যখন ক্যারাপিট আরাটুনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তখন মধ্যে মধ্যে বদরন্নেসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িতেন। বদরন্নেসার সহৃদয়তা, স্নেহ এবং সচ্চরিত্রতা দর্শনে স্যামুয়েল অত্যন্ত মোহিত হইলেন। বদরন্নেসার বয়স এখন ত্রিশ কি বত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি আবার দেখিতে অত্যন্ত রূপবতী। দিন দিন স্যামুয়েল আরাটুনের মন বদরন্নেসার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বিশুদ্ধ প্রণয়ের কী চমৎকার শক্তি। আরাটুন সাহেবের হৃদয়স্থিত গুপ্তপ্রেম অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্টরূপে বদরন্নেসার মনাকর্ষণ করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয়ের ক্রমশ বিকাশ ও পরিবর্ধনের ইতিহাস দ্বারা উপন্যাসের আয়তন বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে, বদরন্নেসার স্যামুয়েল আরাটুনকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, আর আরাটুন সাহেব মনে করিতে লাগিলেন যে, বদরন্নেসাকে বিবাহ করিতে পারিলে তিনি এ সংসারে সকল প্রকার সুখ শান্তিরই অধিকারী হইবেন এ সংসারে তাঁহার আর কিছুই প্রার্থয়িতব্য থাকিবে না।

কিন্তু দেশাচার লোকাচার যে অবস্থাবিশেষে কত কষ্টকর হইয়া উঠে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। আরাটুন সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, বদরন্নেসাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার স্বদেশীয় বণিক সমাজে তাঁহাকে নিতান্ত অপদস্থ ও অবমানিত হইতে হইবে। তাঁহার সহধর্মিণীকে অন্যান্য আরমানিয়ান বণিকগণ গির্জায় যাইতে দিবে না। আরাটুন সাহেব বদরন্নেসা এবং মীরমদনের সহিত এই সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যতা অবধারণার্থ নানা পরামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে এই স্থির করিলেন যে, বদরন্নেসাকে বিবাহ করিয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্বক মাদ্রাজে যাইয়া বাণিজ্য করিবেন। কিন্তু বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার কারবার একেবারে নষ্ট হয়; তাঁহার অর্থ সম্পত্তি কিছুই থাকে না।

বদরন্নেসা দেখিলেন যে, তাঁহার নিমিত্ত আরাটুন সাহেব অর্থসম্পত্তি সমুদায়ই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। পরে অনেক চিন্তা করিয়া আরাটুন সাহেবকে বলিলেন, 'আমি তোমার গৃহে একজন পরিচারিকার ন্যায় থাকিব। আমি তোমার গৃহে আয়া হইয়া তোমার সন্তানকে প্রতিপালন করিব। তাহা হইলে আর তোমাকে কোনো সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে না। ঈশ্বর চক্ষে আমি তোমার ধর্মপত্নী। কিন্তু তোমার স্বদেশীয় লোকের চক্ষে আমি তোমার গৃহের দাসীই রহিব।'

যখন পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে বদরন্নেসা নিজেই এইরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন মীরমদন আর কোন আপত্তি করিলেন না। মীরমদন অত্যন্ত উদারচেতা লোক ছিলেন। কিন্তু আরাটুন সাহেব স্বীয় প্রণয়িনীকে দাসীর ন্যায় গৃহে রাখিবেন বলিয়া মনে মনে বড় কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে অগত্যা তাঁহাদিগকে এই পথই অবলম্বন করিতে হইল। বদরন্নেসার মনোরঞ্জনার্থ আরাটুন সাহেব মুসলমান শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, কারণ বদরন্নেসার অত্যন্ত বদ্ধমুল ধর্মবিশ্বাস ছিল। আর পতিপ্রাণা বদরন্নেসা প্রণয়ের অনুরোধে মানাভিমান বিসর্জনপূর্বক স্বামীর গৃহের পরিচারিকা হইলেন; ঈদৃশ ত্যাগস্বীকার পূর্বক স্বামীকে সামাজিক অবমাননা এবং লোক গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিলেন। বিশুদ্ধ প্রণয়ের কী চমৎকার শক্তি! অতি ভদ্র বংশজাতা বদরন্নেসা, সেনাপতি মীরমদনের সহোদরা, পতির গৃহে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। স্বীয় সহোদর সেনাপতি মীরমদনের কোনো প্রকার লোকলজ্জা না হয়, সেই অভিপ্রায়ে বদরন্নেসা তাঁহার ভগ্নি বলিয়া কাহারও নিকট আজ পর্যন্ত পরিচয় প্রদান করেন নাই। তিনি মীরমদনের গৃহে পূর্বে একজন পরিচারিকা ছিলেন, এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। লোকে বদরন্নেসাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিত, সকলেই তাঁহাকে স্যামুয়েল আরাটুন সাহেবের উপপত্নী বলিয়া মনে করিত, কিন্তু পরমেশ্বরের চক্ষে তিনি আরাটুন সাহেবের ধর্মপত্নী ছিলেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, রামার মাকে যখন বদরন্নেসা ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তখন সে মনে মনে বলিয়াছিল 'আমি পাপীয়সী, তুমি বড় সতী!' রামার মার এই প্রকার বলিবার কারণ ছিল। সে জানিত যে বদরন্নেসা আরাটুন সাহেবের উপপত্নী ছিলেন।

বদরন্নেসার এই গুপ্ত বিবাহের দুই বৎসর পরে, পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁহার ভ্রাতা মীরমদন মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি মীরজাফরের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি অনেক সময় কুকার্য হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সিরাজের কুক্রিয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। কখনো কখনো সিরাজকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করিবেন বলিয়া, স্পষ্টাক্ষরে ভয় প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে কখনো কোনো ষড়যন্ত্র করিবার উদ্যোগ করিতেন না। তিনি জানিতে যে সিরাজউদ্দৌলা দুরাচার হইলেও তাঁর প্রভু; সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ ও ন্যায়বিরুদ্ধ।

সহৃদয় মীরমদন স্বীয় প্রভুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পলাশিক্ষেত্রে জীবন দান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা একেবারে অনাথা হইয়া পড়িল। মীরজাফর সিংহাসনারূঢ় হইয়া সিরাজের এবং মীরমদনের গৃহস্থিত রমণীদিগকে স্বীয় অন্তঃপুরভুক্ত করিলেন। কিন্তু বদরন্নেসা মীরমদনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার কন্যাটিকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিলেন এবং সস্নেহে তাহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ মীরমদনের কন্যা এরফান্নেসা, ওরফে বেগমী বিবি, আরাটুন সাহেবের গৃহে বদরন্নেসার

রক্ষণাধীনে রহিলেন। ইনি বাল্যাবস্থা হইতে আরমানিয়ানদিগের সংসর্গে বাস করিতে লাগিলেন; অত্যল্পকাল মধ্যে আরমানি ভাষাও শিক্ষা করিলেন। পারস্য পুস্তক ইনি এতৎপূর্বেই পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার স্বভাব অত্যন্ত শান্ত এবং বিনীত। অন্যের দুঃখ দেখিলে ইহার হৃদয় বড়ই দয়ার্দ্র হইত। ইহার চিরহাস্যবিরাজিত মুখখানি দেখিবামাত্র দর্শকের মন মুগ্ধ হইত। কি অঙ্গসৌষ্ঠব সম্বন্ধে কি প্রকৃতি সম্বন্ধে, সংসারে ভাব, সংসারের আচরণ ইহার জীবনে বড় দেখা যাইত না। ইহাকে সত্য সত্যই দেববালা বলিয়া বোধ হইত। স্যামুয়েল আরাটুন স্বীয় কন্যার ন্যায় ইহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, স্বীয় তনয় ক্যারাপিট্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত ইহার যাহাতে বিবাহ হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহার আর তৎসম্বন্ধে অধিক চেষ্টা করিতে হইল না। ক্যারাপিট বাল্যাবস্থা হইতেই এরফান্নেসার সহিত একত্রে খেলা করিতেন, একত্রে আহার করিতেন, একত্রে বেড়াইতেন। যৌবনাবস্থায় ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইল। স্যামুয়েল আরাটুনের মৃত্যুর দুই এক বৎসর পর এরফান্নেসার নাম এস্থার হইল। পাঁচ কি ছয় বৎসর হইল ইহাদের বিবাহ হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে এস্থার বিবির দুইটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

আরাটুন সাহেবের পত্নী আরমানিয়ান বংশোদ্ভব নহেন, ইনি মীরমদনের কন্যা, আর বদরন্নেসা মীরমদনের কনিষ্ঠা সাহোদরা! মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সুতরাং আরাটুন সাহেবের স্ত্রী যে সাবিত্রীর প্রতি এত দয়া প্রদর্শন করিতেন এ বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। হিন্দু রমণীগণ মুসলমান কুলকামিনীদিগের প্রতি সর্বদাই পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কখনো পরাজিত জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। হিন্দুদিগকে সর্বদাই সমতুল্যজ্ঞানে বন্ধুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; দেশীয় শাসনকার্যসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান পদে হিন্দুদিগকেই নিযুক্ত করিতেন।

আরাটুন সাহেবের সহধর্মিণী এস্থার বিবি স্বীয় শয়নগৃহের পার্শ্বে সাবিত্রীর নিমিত্ত একখানি কুঁড়েঘর প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তিনি হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বিলক্ষণ জানিতেন। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর হিন্দুদিগকে যে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিতে হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি তাঁহার হিন্দু চাকরদিগের দ্বারা সাবিত্রীর আহারের নিমিত্ত আতপ চাউল ঘৃতাদি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাবিত্রী পূর্বদিনেও কিছু আহার করে নাই। সুতরাং এস্থার বিবি তাহাকে রন্ধন করিবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বহস্তে অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষুদ্রকুটিরে বসিয়া আহার করিল। সাবিত্রীর আহারান্তে এস্থার বিবি স্নান করিয়া, বেলা তিন ঘটিকার সময়ে নিজে আহার করিলেন।

আট
রামদাস শিরোমণির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ

সাবিত্রী আরাটুন সাহেবের গৃহে এইরূপে বাস করিতে লাগিল। তাহার দুঃখ-কষ্ট নিবারণার্থ বদরন্নেসা এবং এস্থার বিবি প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সাবিত্রীর ধর্ম বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার পিতার শ্রাদ্ধ না হইলে আর তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই; শ্রাদ্ধ না হইয়া পর্যন্ত হয়তো তাহার পিতাকে নরকে থাকিয়া দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এই চিন্তা তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল।

সে আবার ভাবিতে লাগিল, 'হায়! ইংরাজদিগের অত্যাচারে আমাদের এই দুরবস্থা না হইলে, আমার ভ্রাতারা পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিত। কিন্তু আজ তাহারা কোথায় রহিল। পিতার যে মৃত্যু হইয়াছে তাহাও তাহারা জানিতে পারিল না।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাবিত্রী একাকিনী বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল। নিজের হাতে একটি পয়সাও নাই, কিরূপেই বা শ্রাদ্ধ করিবে। এস্থার বিবি তাহার ভরণপোষণের ব্যয় দিতেছেন, তাঁহার নিকটই বা কিরূপে আবার শ্রাদ্ধের ব্যয় প্রার্থনা করিবে। হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে কন্যাকে ত্রিরাত্রে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মাসান্তে কোনো প্রকারে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পারে কি না, তাহাই এখন সে চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহার শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, 'হা ঈশ্বর, আমার বাবার কপালে এই ছিল! বাবা তো কখনো কাহারও অনিষ্ট করেন নাই। তবে তাঁহার এত দুর্দশা কেন হইল। হায়, হায়! বাবার আর শ্রাদ্ধও হইল না। এই বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ এস্থার বিবি এই সময়ে তাঁহার কুটিরের নিকট আসিতেছিলেন। তাঁহার কর্ণকুহরে সাবিত্রীর কাতরোক্তির কিয়দংশ প্রবেশ করিল। তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে সাবিত্রীর কুটীরের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

কিছুকাল পরে সে সংজ্ঞালাভ করিলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ তুমি আবার এত কাতর হইলে কেন?' সাবিত্রী কিছুই বলিল না।

এস্থার বিবি বারম্বার আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, 'তোমার নূতন কোনো শোকের কারণ হইয়া থাকিলে আমার নিকট বল। আমি সাধ্যানুসারে তোমার কষ্ট দূর

করিতে চেষ্টা করিব। আমি তোমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি। তোমার দুঃখ দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়।'

তখন সাবিত্রী বলিল, 'আমার পিতার শ্রাদ্ধ হইল না বলিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। শুনিয়াছি লোকের শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে নরকে থাকিতে হয়, শ্রাদ্ধ হইলেই স্বর্গে চলিয়া যায়। তবে আমার পিতাকে বোধহয় নরকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। বাবা শেষকালে এই কষ্ট পাইয়া মরিয়াছেন, তাঁহাকে নরকেও কষ্ট পাইতে হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছে।'

এস্থার বিবি বলিলেন, 'এ কথা তুমি আমার নিকট পূর্বে বল নাই কেন? শ্রাদ্ধে যে কিছু ব্যয় লাগিবে তাহা আমি দিব।'

সাবিত্রী। আজ্ঞে না। আমি আপনাকে আর অধিক ব্যয় করিতে বলি না। আপনাদেরও এখন বিপদের সময়।

এস্থার। শ্রাদ্ধে কত টাকা লাগিবে?

সাবিত্রী। আমার বোধহয় দশ-পনর টাকা হইলেই একরকম হইতে পারে।

এস্থার। আমি এখনই পনর টাকা দিতেছি। শ্রাদ্ধে যাহা কিছু আনিতে হয় বল, আমার লোক দ্বারা আনাইয়া দিব।

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণকে না জিজ্ঞাসা করিলে কী কী জিনিস আনিতে হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। গামছা ইত্যাদি আনিতে হয়।

এস্থার। আমি লোক দ্বারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া দিতেছি।

সাবিত্রী। আপনি রামাকে ডাকাইয়া ব্রাহ্মণ আনিতে বলুন। রামা এ সকল বিষয় জানে। সকল বাড়ির শ্রাদ্ধের সময়ই রামা কাজ-কর্ম করে।

আরাটুন সাহেবের পত্নীর আদেশানুসারে রামা ব্রাহ্মণ ডাকিতে চলিল। কিন্তু সৈদাবাদের চতুর্দিকে তিন ক্রোশের মধ্যেও তাঁতির বামন অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। নিকটস্থ গ্রাম সমূহের সমুদয় তন্তুবায় পলায়ন পূর্বক স্থানান্তরে গিয়াছে। তাঁতির ব্রাহ্মণগণও তাহাদিগের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রামা গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক এই সকল বিষয় আরাটুন সাহেবের পত্নী এবং সাবিত্রীর নিকট বলিল। সাবিত্রী রামার কথা শুনিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল। এস্থার বিবি কী করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। বদরন্নেষা তখন রামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে সকল ভট্টাচার্য পণ্ডিত আমাদের সৈদাবাদের নিকট আছে, তাহাদিগের দ্বারা কাজ চলে না?'

সাবিত্রী বলিল, 'তাঁহাদের দ্বারা কাজ চলিতে পারে। কিন্তু আমরা তাঁতি, নীচ জাতি, এ সকল ভট্টাচার্যি পণ্ডিত আমাকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে স্বীকার করিবেন না।'

বদরন্নেসা বলিলেন, 'টাকার বাঘের চক্ষু কিনতে পারা যায়।—রামা তুই কিছু অধিক টাকা কবুল কর্‌গে। তবে ভট্টাচার্যের বাবা আসিয়া শ্রাদ্ধ করাইয়া যাইবে।'

সাবিত্রী বলি, 'না, তাঁহারা কখনো স্বীকার করিবেন না।'

কিন্তু রামার মনে আশা হইল। সে ভাবিতে লাগিল যে অধিক টাকা দিতে স্বীকার

করিলে দুই-একটা ভট্টাচার্য পাওয়াও যাইতে পারে। এই ভাবিয়া রামা তৎক্ষণাৎ হরিদাস তর্কপঞ্চাননের বাড়ি গেল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, রামা নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক। সংসারের ভাবগতিক কিছুই বুঝিত না। তর্কপঞ্চানন মহাশয় শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। অন্যান্য দুই-চারি জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রামা সেই সকল লোকের সাক্ষাতেই তাহার অভিপ্রেত বিষয়ে প্রস্তাব করিল। তর্কপঞ্চানন মহাশয় রামার কথা শুনিবামাত্র যার-পর-নাই ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। সম্মুখস্থ কাষ্ঠপাদুকা হস্তে লইয়া রামাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সাধুভাষায় বলিয়া উঠিলেন। 'রে পামর! তোর এত বড় আস্পর্ধা! তুই আমাকে তাঁতির শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে বলিতেছিস্! আমি কি কখনো শূদ্রাদির দান গ্রহণ করি?'

রামা অবাক হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল, দ্রুতপদে বাহির বাড়ি চলিয়া আসিল। রামাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা দোলায়মান পৈতার প্রান্ত কানে জড়াইয়া এবং বামহস্তে সম্মুখস্থিত গাড়ুটি লইয়া ধীরে-ধীরে প্রস্রাব করিবার ছলনায় বাড়ির বাহিরে আসিলেন। রামাকে হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'বাপু তুই এক নিতান্ত আহম্মক! এত লোকের মধ্যে এই সকল বিষয়ের প্রস্তাব করিতে হয়? শোন বেটা, দুইশত টাকা দিলে আমি গোপনে যাইয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইয়া আসিব। কিন্তু সাবধান যেন এ-কথা প্রকাশ না হয়।'

রামার চরিত্র পাঠকগণের অবিদিত নাই। তাহাকে কেহ রুষ্ট বাক্য বলিলে আর তাহার সহিত কথা বলে না সুতরাং রামা তখন সক্রোধে বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা ঠাকুর, তুমি থাক, আমাদের বামণ মিলবে।'

এই বলিয়া রামা তৎক্ষণাৎ রামদাস শিরোমণির বাড়ি চলিয়া গেল। শিরোমণি মহাশয়ের এখানেও দুই-চারজন অপরিচিত লোক ছিল কিন্তু এবার আর রামা কাহারও সাক্ষাতে আপন অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিল না। কিছু কাল পরে সেই সকল অপরিচিতলোক চলিয়া গেল। তখন রামা বিদেশীয় রাজদূতের ন্যায় অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিবার পূর্বে ভূমিকা আরম্ভ করিল। যার-পর-নাই বিনয় প্রিদর্শন পূর্বক বলিল, 'ঠাকুর গোসাঞি, একটা দায়ে ঠেকিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।'

শিরোমণি। কি দায়ে?

রামা। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আপনি তো জানেন যে আমাদের বামণগুলো সব দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে।

শিরোমণি। তা যাবে বই কী? তাদের সমুদয় যজমান চলিয়া গেল, তারা কি করিয়া খায়?

রামা। আজ্ঞে, আমাদের জাতের প্রধান সভারাম। কিন্তু সভারামের আর শ্রাদ্ধ হইল না। তার মেয়ে সাবিত্রী শ্রাদ্ধ করিতে চায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ মিলে না।

শিরোমণি। হাঁ বেটা দুষ্ট! তাই আমাকে এখন সেই তাঁতির শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে

বলিস নাকি? তিন কাল গেল, ইহার মধ্যে শূদ্রাদির দান গ্রহণ করিলাম না। এখন বুড়াকালে এই কুকার্য করিব?

রামা। আজ্ঞে, আপনাকে কি আর একথা বলিতে সাহস হয়। তবে না বলিয়াও পারি না। দেশে আর বামণ নাই।

শিরোমণি। আমি জানি সভারামের অনেক টাকা ছিল। তাহা কি ইংরাজেরা সব লুটিয়া নিয়াছে?

রামা। আজ্ঞে, সব নিয়াছে। একটা পয়সাও নাই। আমাদের মেম সাহেব শ্রাদ্ধের খরচ দিবেন।

শিরোমণি। তবে পাঁচ শত টাকা দিলে আমি গোপনে মন্ত্র পড়াইতে পারি। কিন্তু সাবধান কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিবি না।

রামা। আজ্ঞে, এও কি কেহ প্রকাশ করে। তবে মেম সাহেব এত টাকা কি দিবেন? মোট দশ বার টাকার মধ্যে আমরা কাজ সারিতে চাই।

শিরোমণি। যা বেটা, একশত টাকা দিতে পারবি?

রামা। আজ্ঞে, না।

শিরোমণি। তবে যা, বেটা চলে যা। আমি তাঁতির শ্রাদ্ধ করাইতে পারিব না।

রামা বিষণ্ণবদনে উঠিয়া চলিল। শিরোমণি মহাশয় আবার রামাকে বলিলেন, 'আছা দশ টাকা দিস। সভারামের বাড়ি লুট হইয়াছে। তাহার বড় পুত্র জেলে রহিয়াছে। সে বেটা বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কিন্তু সাবধান কোনোপ্রকারে এই সকল কথা প্রকাশ না হইয়া পড়ে।'

রামা। ঠাকুর গোসাঞি, পাঁচ টাকার অধিক হইলে আমাদের চলে না?

শিরোমণি ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, যেরূপ সময় পড়িয়াছে ইহাতে টাকা পাঁচটা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং প্রস্থানোন্মুখ রামাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আরে শ্রাদ্ধ কোন তারিখে হইবে?'

রামা বলিল, 'আজ্ঞে আগামী মঙ্গলবার। চার রবিতে আজ আটাইস হইল। মঙ্গলবার ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ হইবে।'

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, 'গঙ্গার ওপর শ্রাদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট করিতে পারিবি? গোপনে কার্য করিতে হইবে।'

রামা বলিল, 'আজ্ঞে রাত্রি থাকিতে-থাকিতে গঙ্গা পার হইয়া ওপারে যাইবেন। এক প্রহরের মধ্যে শ্রাদ্ধ শেষ হইবে। তৎপরে আগে, আমি আপনাকে এপারে রাখিয়া যাইব, শেষে সাবিত্রীকে পার করিয়া আনিব।'

এই কথা শুনিয়া শিরোমণি বলিলেন, 'বাপু তুই একটা কাজের লোক! আচ্ছা যা, আমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইব। সভারামের মেয়ে বড় বিপদে পড়িয়াছে। এ-বিষয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষা উচিত না। সভারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জেল হইতে খালাস হইয়া আসিলে, ইহার পর বিবেচনা করিস। মনে থাকে যেন।'

রামা। আজ্ঞে শ্রাদ্ধে কী কী লাগিবে তা তো আমরা জানি না। আমরা মূর্খ মানুষ; তাই যদি জানিতাম তবে আর কি আপনাকে এত কষ্ট দিতাম? একটা ফর্দ লিখিয়া দিন। আমি বাজারে যাইয়া কাল সব কিনিয়া রাখিব।

শিরোমণি। একটা একোদ্দিষ্ট মাত্র হইবে। তাহাতে যাহা যাহা লাগবে সে সমুদয়ই আমার ঘরে আছে। যে কয়েকখানা গামছা লাগিবে, কী আর যাহা-যাহা লাগিবে, সব আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। তোমাদের জিনিসের মূল্য ধরিয়া দিলেই হইবে।

রামা ব্রাহ্মণ সাব্যস্ত করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। সে বাড়িতে আসিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় মেমসাহেব, বদরন্নেসা এবং সাবিত্রীর নিকট বলিল।

সাবিত্রী বলিল, 'রামা তুমি সত্য-সত্যই আমার জ্যেষ্ঠ ভাই। আজ তুমিই আমার বাবার শ্রাদ্ধ করাইলে।'

মঙ্গলবার সমাগত হইল। প্রভাত হইতে-না-হইতেই সাবিত্রী এবং শিরোমণি ঠাকুরকে লইয়া রামা একখানি ছোট নৌকায় গঙ্গার অপর পারে গেল। সাবিত্রী গঙ্গায় ডুব দিয়া, সিক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্বক মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। শিরোমণি যাহা যাহা বলিলেন, সাবিত্রী সেইসকল কথা মুখে মুখে বলিল। কিন্তু তাহার একটি শব্দেরও অর্থ বুঝিল না। মাঝে-মাঝে যখন 'পিতা' শব্দ এবং 'সভারাম' শব্দ বলিতে হইল, তখন তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। বেলা একপ্রহর হইতে-না-হইতেই শ্রাদ্ধের কার্য শেষ হইল। সাবিত্রী অত্যন্ত ভক্তির সহিত শিরোমণি ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। সাবিত্রীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আজ তাহার পিতা প্রেতলোক পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই শোক-দুঃখের মধ্যেও সে মনে মনে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল। এস্থার বিবির প্রতি তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইল। রামা শিরোমণি ঠাকুরকে জিনিসপত্রের মূল্য বাবত সাত টাকা এবং শ্রাদ্ধের দক্ষিণা পাঁচ টাকা, মোট বার টাকা দিল। শিরোমণি ঠাকুর কাছার কোণে টাকা বান্ধিয়া, শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। রামা শিরোমণিকে অগ্রে পার করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকায় উঠিল। সাবিত্রী একাকিনী গঙ্গার অপর পারে রহিল।

এদিকে রামার মা এ-শ্রাদ্ধের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়াছে; অল্প রাত্রি থাকিতে রামদাস শিরোমণি যে সাবিত্রীকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে গঙ্গার অপর পারে গিয়াছেন তাহাও টের পাইয়াছে। শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি রামার মার পূর্বের রাগ রহিয়াছে। কিন্তু রামা সে-সকলের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। রামার মা প্রভাতে উঠিয়াই প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় চলিয়া গেল এবং কৃষ্ণানন্দ বাবাজীকে ডাকিয়া বলিল, 'বৈরাগী ঠাকুর তাড়াতাড়ি এদিকে এস। আজ এতদিনের পর শিরোমণির ভণ্ডামি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে।'

কৃষ্ণানন্দ বাবাজী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে?'

রামার মা বলিল, 'দেখ এসে, শিরোমণি ঠাকুর সভারামের মেয়ে সাবিত্রীকে শ্রদ্ধের

মন্ত্র পড়াইতে ওপারে গিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আজ সকল ভণ্ডামি ভাঙ্গিয়া দেও। তোমার সঙ্গে শিরোমণি যে শত্রুতা করিয়াছে।'

কৃষ্ণানন্দ বাবাজী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রামার মার সঙ্গে নদী পারে আসিয়া, এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আজ কৃষ্ণানন্দ বাবাজী গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়া নদীর পারে অপেক্ষা করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ বাবাজী, রামার মা ও শিরোমণি ঠাকুরের মধ্যে পূর্বে কি গোলযোগ হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ না করিলে, পাঠকগণ এই শত্রুতা সাধনের মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন না। কৃষ্ণানন্দ বাবাজী এই প্রদেশের একজন দুঃখী ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। ইঁহার পূর্বনাম নবকিশোর চট্টোপাধ্যায়। অতি বাল্যকালে ইহার পিতৃবিয়োগ হইলে, ইঁহার জননী ইঁহাকে আট বৎসর বয়সের সময় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রায় দ্বাদশ বৎসর ইনি শিরোমণির টোলে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইল, তখন ন্যায়দর্শন এবং যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল, টোলের সমুদয় সহাধ্যায়ীদিগকে তর্ক ও বিচারে সময়ে-সময়ে পরাস্ত করিতেন। ইঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ইঁহাকে প্রাধান্য লাভ করিতে দেখিয়া ঈর্ষা করিত। শিরোমণি মহাশয় নিজেও আশঙ্কা করিতেন যে, নবকিশোর ভবিষ্যতে তাঁহার উপরও প্রাধান্য লাভ করিবে।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, একদিন নবকিশোর শিরোমণির টোলে যাইতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিল। তখন তিনি পথপার্শ্বস্থিত রামার মার কুটিরের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইলেন। রামার মা তখন বাড়ি ছিল না। তাহার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু নবকিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার একজন সহাধ্যায়ীও সেই সময় টোলে যাইতে ছিলেন। তাহাকে নবকিশোর দেখিতে পান নাই। বামাচরণ নবকিশোরকে টোলের মধ্যে সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ সর্বদাই তাঁহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। আজ বামাচরণ নবকিশোরকে রামার মার কুটিরের বারান্দায় দাঁড়াইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিতে ভিজিয়া দৌড়াইতে-দৌড়াইতে শিরোমণি ঠাকুরের নিকট আসিলেন। শিরোমণি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব! আর আপনার টোলে আসিব না। আমাকে পদধূলি দিয়া বিদায় দিন।'

শিরোমণি সসব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে?'

এই সময় শিরোমণি ঠাকুরের একটি বিধবা কন্যার নামে অনেক অপবাদ রটনা হইয়াছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে সেই সম্বন্ধেই বা কোনো গোলযোগ হইয়া থাকিবে।

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'কী হইয়াছে বল না?'

বামাচরণ অনেক এদিক-ওদিক করিয়া বলিল, 'গুরুদেব আপনার টোলের প্রধান শিষ্য নবকিশোর, কিন্তু আজ তাহাকে যেরূপ কুকার্য করিতে দেখিলাম, তাহাতে তার সঙ্গে একত্রে আহার-বিহার করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পতিত হইতে হইবে—পতিত কোনো জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে।'

শিরোমণি এই কথা শুনিয়া একটু সুস্থ হইলেন। কারণ তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা নহে। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নবা কি করিয়াছে বল না? নবাব সম্বন্ধে আমার পূর্ব হইতেই অনেক আশঙ্কা হইতেছিল।'

শিষ্য বলিল, 'গুরুদেব, নবকিশোর যে কুকার্য করিয়াছে, তাহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাহা কি আমি বলিতে পারি? আপনি গুরু, পিতৃতুল্য আপনার সাক্ষাতে আমি সে সকল কথা বলিতে পারিব না। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আসিয়া দেখুন। এখন নবকিশোর সেই কুলটা স্ত্রী রামার মার ঘরে বসিয়া তাহার সঙ্গে একত্র তাম্বুল চর্বণ করিতেছেন।'

শিরোমণি মহাশয় এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার এখন অধিকতর উত্তেজিত হইবার কথা বটে। কারণ তাঁহার নিজের যে আশঙ্কা ছিল তাহা দূর হইয়াছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া শিরোমণি বামাচরণের সঙ্গে সঙ্গে সৈদাবাদ চলিয়া আসিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। রামার মার কুটিরের নিকট আসিয়া দেখিলেন, নবকিশোর সেই কুটিরের বারান্দা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। শিরোমরি নবকিশোরকে দেখিবামার তর্জন-গর্জন পূর্বক সাধুভাষাতে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, 'রে দুরাত্মন্! রে পাষণ্ড! আমি তোকে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলাম সকলই বৃথা হইল। তুই নিতান্ত লম্পট। আমার টোল হইতে তোকে অদ্যই বহিষ্কৃত করিয়া দিব। তুই জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিস্। কোনো ব্রাহ্মণ সন্তানে আর তোকে স্পর্শ করিবে না। তোর স্পর্শ করা জল আর কেহ পান করিবে না।'

নবকিশোর আশ্চর্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল এ কী ব্যাপার! কিন্তু শিরোমণি ঠাকুর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমুদয় শিষ্যগণের নিকট এই কথা বলিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রামস্থ সকলেই নবকিশোরের কুকার্যের কথা শুনিতে পাইলেন। গ্রামের অনেকানেক লোক বলিতে লাগিলেন, 'নবকিশোরের এইরূপ কুচরিত্রের কথা পূর্বাপরই আমি জানি, কিন্তু আমরা কাহারো কোনো কথায় কান দিই না। যাহার যা ইচ্ছা করুক।' কেহ কেহ বলিল, 'শিরোমণি ঠাকুর স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে নবকিশোর রামার মার বিছানার উপর বসিয়া, তাহার সঙ্গে একত্র এক বাটায় পান খাইয়াছে।' একজন বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি বার বৎসর পর্যন্ত কিছুই দেখিতে পান না, তিনি ধীরে-ধীরে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে বাপু, আমি এই গ্রামে সকলের চেয়ে বুড়ো, আজ আমার চক্ষু গিয়াছে। এ-চক্ষু থাকিতে কত না কী দেখিয়াছি। তবে কাহারো অনিষ্ট করা, কাহারো নিন্দা করা, আমার অভ্যাস নাই; তাহা এজন্মে কখনো করি নাই—করিবও না। এই নবাকে আমি রামার মার সঙ্গে একত্রে আহার করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'

কিন্তু বার বৎসর পূর্বে রামার মা সৈদাবাদে বাস করিত না। বিশেষতঃ তখন নবকিশোরের বয়স ৭।৮ বৎসরের অধিক ছিল না। এ-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বার বৎসর পূর্বে নবকিশোরের কুকার্য দেখিয়াছিল।

নবকিশোরের বৃদ্ধা জননী এই কথা শুনিয়া মৃতপ্রায় হইলেন। লোকলজ্জায় গলায়

দড়ি দিয়া মরিবেন, কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে গ্রামস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নবকিশোরকে ‘একঘরে’ করিলেন। নবকিশোরের জননী প্রথমে পুত্রের দোষ থাকাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং দুঃখ ও ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন, ‘হতভাগা, তুই আমার মুখে চুন-কালি দিবি বলিয়া তোকে দশ-মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম! আমি পৈতা কাটিয়া তোকে ভরণপোষণ করিয়াছি, নিজে উপবাস করিয়া তোকে খাওয়াইয়াছি, প্রতিশোধ দিলি!’ এই সকল আক্ষেপোক্তি নবকিশোরের আর সহ্য হইল না। সে তখন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। তাহার জননী আবার তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন। পুত্র আত্মহত্যা করিবে, ইহা কি মাতার হৃদয়ে কখনো সহ্য হয়। তাঁহার মাতা আর ভর্ৎসনা করিলেন না। পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। পরে নবকিশোর জননীর চরণ ধরিয়া কান্দিতে-কান্দিতে, শপথ পূর্বক এই গোলযোগের সমুদায় প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিলেন। ক্রমে তাহার জননী বুঝিতে পারিলেন যে, নবকিশোর সম্পূর্ণ নির্দোষী, বৃষ্টির সময় তিনি যখন রামার মার কুটিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন তখন রামার মা বাড়িতেও ছিল না।

কিন্তু নবকিশোর নির্দোষী হলেও গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে ‘একঘরে’ করিল। এখন কী উপায়ে উদ্ধার হইবেন তাহাই নবকিশোরের মাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ি-বাড়ি যাইয়া তাহাদের পায়ে ধরিয়া কান্দিতে-কান্দিতে নবকিশোরের নির্দোষিতার কথা বলিতে লাগিলেন। একে-একে গ্রামের প্রত্যেক লোকই বলিলেন, ‘নবকিশোর নির্দোষী তাহা আমরা বিলক্ষণ জানিয়াছি, বিশেষতঃ অনেকানেক লোক ইহাপেক্ষা কুকার্য করিয়াও আমাদের সমাজে রহিয়াছে, কিন্তু সমাজের দশজনে তাহাকে ‘একঘরে’ করিলে আমি একাকী কী করিব?—সমাজের অনুরোধে আমিও নবকিশোরকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।’ সমাজের কোন দশজন যে নবকিশোরকে ‘একঘরে’ করিল, নবকিশোরের বৃদ্ধা জননী তাহা আর ঠিক করিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা ঠিক করিবেন। গ্রামের ছোট-বড় প্রত্যেক ব্যক্তিই বলিতে লাগিলেন যে, অপর দশজনে নবকিশোরকে ‘একঘরে’ করিয়াছে বলিয়া তিনিও নবকিশোরকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; নতুবা তিনি নবকিশোরকে কখনো পরিত্যাগ করিতেন না।

নবকিশোরের জননী দেখিলেন সমাজে উঠিবার আর বড় আশা নাই। দিন দিন তাঁহার মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোক জলের কলসী কক্ষে করিয়া সরিয়া যাইত। যে সকল স্ত্রীলোক কিছু অধিক কলহ প্রিয় তাঁহারা নবকিশোরের মাতাকে দেকিলেই বলিয়া উঠিতেন, ‘ওগো আমাকে ছুঁইও না, আমি স্নান করিয়া উঠিয়াছি, এখন জলের কলসী নিয়া ঘরে যাইব।’ এই সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর হৃদয় জ্বলিয়া যাইত।

কিন্তু এক দিন নবকিশোরের মাতা স্নান করিতে গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন, এদিকে নবকিশোরের প্রতিবেশী জগন্নাথ বিশ্বাসের ঘরের একটা দাসী গঙ্গার ঘাট হইতে জলের কলসী নিয়া বাড়ি যাইতেছিল। নবকিশোরের মাতা তাহাকে দেখিয়া রাস্তার পাশ দিয়া

যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাতাসে নবকিশোরের মাতার বস্ত্রের অঞ্চল সেই দাসীর গাত্রস্পর্শ করিবামাত্র সে কক্ষস্থিত জলের কলসী ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ জাতিভ্রষ্টা মাগী গ্রামসুদ্ধ সকলের জাতি মারিবে। আমি কর্তার পূজার জন্য জল নিয়া যাইতেছি, আমাকে ইচ্ছা করিয়া মাগী ছুঁইয়া দিয়াছে।'

এই দাসী চিৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিল। সেখানে আর দশ পনরজন স্ত্রীলোক ছিল। সকলেই একত্র হইয়া নবকিশোরের মাতাকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। একজন বলিল, 'জলের কলসীর পয়সা উহার নিকট হইতে আদায় কর; মাগী অন্য ঘাটে যাইতে পারে না! রোজ রোজ এই ঘাটে আসিয়া সকলকে জ্বালাতন করিবে।'

নবকিশোরের মাতার মুখে আর কথা নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন, অধোবদনে ভূমিতলে চাহিয়া পৃথিবীকে বলিতেছেন, 'বিশ্বমাতঃ পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি; আর এ-সংসারে থাকিতে পারি না।'

উপস্থিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মৃত ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী কিছু বিশেষ তেজস্বিনী এবং বহুভাষিণী ছিলেন। তিনি বড় মানুষের ঘরের বিধবা, পাল্কীতে চড়িয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। ইনি হাত নাড়িতে-নাড়িতে, নবকিশোরের মার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মাগী, লোককে মুখ দেখাস কেমন করে? গঙ্গায় দড়ি দিয়া মরতে পারিস না? তুই এখন গ্রামসুস্থ লোকের জাতিধ্বংস করিয়া সকলকে নরকস্থ করিবি নাকি? আমাদের লোকে একটু নিন্দা করিলেই লজ্জায় মরিয়া যাই। এ মাগী কোন মুখে যে ঘাটে স্নান করিতে আসে, আমি বুঝিতে পারি না।'

নবকিশোরের জননী মনে মনে মৃত্যু কামনাই করিতেছিলেন। 'গলায় দড়ি' এই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মনে যে কী ভাবের উদয় হইল তাহা পরমেশ্বর জানেন। তিনি আর গঙ্গায় স্নান করিলেন না। দ্রুতপদে ফিরিয়া বাড়ি আসিলেন, গৃহের মশারির দড়ি খুলিয়া চারিগাছি দড়ি একত্র করিয়া সেই সময়েই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করলেন। ছিদাম বিশ্বাসের বিধবাই এই নিরপরাধিনী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীকে যেন মৃত্যুর পথ বলিয়া দিল।

কিন্তু ছিদাম বিশ্বাসের বিধবা যখন বলিতেছিল যে, 'আমাদের লোকে একটু নিন্দা করিলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই এ মাগী কেমন করিয়া লোককে মুখ দেখায়'—তখন উপস্থিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সকলেই মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ সরকারের বিধবা ভগ্নী হাসিতে-হাসিতে, গুরুপ্রসাদের মার কানে-কানে কী বলিতে লাগিলেন; কিন্তু কী বলিলেন তাহার কিছুই শুনা গেল না। ছিদামের স্ত্রী চলিয়া গেলে পর তিনি আবার বলিলেন, 'মাগী কি জামাই পাইয়াছিল!'

ইহার দুইঘণ্টা পরে নবকিশোর বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এখন পর্যন্ত নবকিশোর কিছু আহার করেন নাই; আহারের সংস্থান ছিল না বলিয়া, কাসিমবাজারের কোনো দোকানের গোমস্তাগিরি কার্য পান কি-না তাহারই অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে

পাইলেন মাতার মৃতশরীর ঝুলিতেছে। গ্রামের কোনো লোক নবকিশোরের মাতাকে দাহ করিতে আসিল না। সকলেই বলিল, জাতিভ্রষ্টাকে দাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। নবকিশোরের একটি পয়সা নাই যে, মাতাকে দাহ করিবার কাষ্ঠ ক্রয় করেন। তাঁহার পিতার আমলের একখানি শাল ছিল। নবকিশোর সেই শালখানি কাষ্ঠের দোকানে বন্দক রাখিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। দোকান হইতে নিজে মাথায় করিয়া কাষ্ঠ আনিতে লাগিলেন। দুই প্রহরের পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তাঁহার কাষ্ঠ আহরণ এবং চিতা খনন ইত্যাদি কার্যে অতিবাহিত হইল। গ্রামের একটি লোক তাঁহার একটু সাহায্য করিল না, একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না। নবকিশোরের ভগ্নীপতি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত আপন শাশুড়ীকে দাহ করিতে আসিলেন না।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বীয় জননীর মৃতদেহ দেখিতে যাইবেন বলিয়া স্বামীর অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লাঠিহাতে লইয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন এবং বারম্বার বলিতে লাগিলেন; ‘আমার ঘরে আট বৎসরের এক মেয়ে সাত বৎসরের এক মেয়ে রহিয়াছে; এখন তুমি সেই জাতিভ্রষ্টার বাড়ি যাও, আর গ্রামের দশজনে আমাকেও জাতিভ্রষ্ট করুক; আমার মেয়েগুলি চিরকাল অবিবাহিতা থাকুক।’

ব্রাহ্মণকন্যা স্বামীর ভয়ে আর একটি কথাও বলিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে নবকিশোর চিতা খনন করিয়া একাকী স্বীয় জননীকে গঙ্গার পারে দাহ করিলেন। পরে নিজেও আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে; আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে। অনেক চিন্তার পর মনে-মনে স্থির করিলেন তিনি নিষ্কাম যোগ করিবেন, যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া, নবকিশোর মস্তকমুণ্ডন পূর্বক প্রেমদাস বাবাজীর বৈরাগ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বাবাজী ঠাকুর বৈরাগ্যধর্মে দীক্ষিত করিবার সময়ে তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দ নামে অভিহিত করিলেন। কিন্তু এই দুই বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কোনো ব্রতই সাধন হইতেছে না।

কৃষ্ণনন্দ নামধারী নবকিশোর ভগবদগীতা পাঠ করেন, শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে ভক্তির কথা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাহার হৃদয় মন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও তিনি আপন হৃদয় হইতে বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব দূর করিতে পারিতেছেন না। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত তাঁহার উপর যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এ-ভাব সহজে বিদূরিত হইতে পারে না। এই দুইবৎসর পর্যন্ত আপনার হৃদয়স্থিত দ্বেষ হিংসা দূর করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যখনই তাঁহার জননীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ় হয়, তখনই গ্রামস্থ লোকের প্রতি তাঁহার হৃদয়স্থিত দ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং ভগবদগীতার নিষ্কাম যোগের কথা, শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তির কথা, সকলই সেই বিদ্বেষানলের ধূমরাশি

স্বরূপ সমুত্থিত হইয়া, বায়ুর সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। বস্তুত সংসারের অত্যাচারী লোকেরাই অপরাপর লোকদিগকেও ধর্মের পথে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছে।

আজ সেই কৃষ্ণানন্দ নামধারী নবকিশোর প্রতিহিংসাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বীয় পূর্ব গুরু শিরোমণি ঠাকুরকে প্রতিশোধ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিরোমণি ঠাকুরই নবকিশোরকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া ছিলেন। শিরোমণি ঠাকুরের তদ্রূপ আচরণ নিবন্ধনই নবকিশোরের মাতাকে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং নবকিশোর প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া গঙ্গার পারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া গঙ্গার পারে পৌঁছিল। কয়েকখানি নূতন গামছা এবং শ্রাদ্ধের অন্যান্য জিনিস পত্র হাতে করিয়া শিরোমণি ঠাকুর পারে উঠিবামাত্র কৃষ্ণানন্দ বাবাজী শিরোমণি ঠাকুরের হাতের গামছাখানি ধরিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব চিনিতে পারেন? আমি আপনার সেই হতভাগ্য শিষ্য নবকিশোর। আপনি আমার গুরু ছিলেন। আজ আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব বলিয়াই এখানে অপেক্ষা করিতেছি। সভারামের কন্যাকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে ওপারে গিয়াছিলেন!'

শিরোমণির প্রাণ উড়িয়া গেল; বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'বাপু আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোর গুরু ছিলাম।'

প্রতিহিংসাপরবশ কৃষ্ণানন্দ বাবাজী কোপাবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল 'তুমি আমার গুরু ছিলে? তুমি আমার শালা ছিলে। শালা ঐ দেখ আমার নিরপরাধিনী জননীর চিতা। আজ তোর ঘাড় ধরিয়া আগে তোর পরম শত্রু হরিদাস তর্কপঞ্চাননের বাড়ি লইয়া যাইব।' এই বলিয়া কৃষ্ণানন্দ বাবাজী শিরোমণির গলায় গামছা জড়াইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে টানিতে-টানিতে হরিদাস তর্কপঞ্চাননের বাড়ি লইয়া গেল।

হরিদাস তর্কপঞ্চানন আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া কোপানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আমার মুখের গ্রাস বেটা কাড়িয়া নিয়াছে। রামা তাঁতি এ-শ্রাদ্ধের বিষয় প্রথমে আমার নিকটই প্রস্তাব করিয়াছিল। সভারামের কত স্বর্ণ মোহর ছিল। না জানি বুড়া কত মোহরই পাইয়াছে।' কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন, 'রাধামাধব! রাধা-মাধব! এ বুড়া একেবারে ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য হইয়াছে! এই শ্রাদ্ধের কথা রামা তাঁতি যখন আমার নিকট আসিয়াছিল, আমি তাহাকে খড়ম দিয়া প্রহার করিতে উঠিয়াছিলাম। বেটা শেষে দৌড়াইয়া গেল। তা না হইলে নিশ্চয়ই তাকে প্রহার করিতাম। এ কী ঘোরকলি উপস্থিত!' পরে শিরোমণিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, 'তুমি দেশের মধ্যে একজন প্রাচীন লোক। দশজনে তোমাকে সম্ভ্রম করে। তোমার এ কুকার্য, তাঁতির দান গ্রহণ করিলে?'

ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে গ্রামের সর্বত্র প্রচার হইল শিরোমণি ঠাকুর তাঁতির শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইয়াছেন। অনেকে বলিল যে, কেবল শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইয়াছেন? তাঁতির বাড়িতে রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন, তাঁতির নিকট হইতে ভোজন দক্ষিণা পর্যন্তগ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের সমুদয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া শিরোমণিকে 'একঘরে' করিল। শিরোমণির

টোলের ছাত্রগণ পলাইয়া আপন আপন বাড়িতে প্রস্থান করিল। শিরোমণি ঠাকুর দুই মাস পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়াও সমাজে উঠিতে পারিলেন না। নবকিশোরের পরিবার ছিল না, সুতরাং সে জাতিভ্রষ্ট হইলে পর মস্তকমুণ্ডন করিয়া বৈরাগীর আখড়ায় প্রবেশ করিল। কিন্তু শিরোমণির চারিকন্যা এবং স্ত্রী রহিয়াছেন। বৈরাগীরদিগের আখড়া যেরূপ ঘৃণিত স্থান, সেখানে যে সকল কুকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা শিরোমণির অবিদিত ছিল না। সুতরাং স্ত্রী এবং কন্যা লইয়া কিরূপেই বা বৈরাগীর আখড়ায় প্রবেশ করিবেন। একটা সমাজ আশ্রয় না করিলেও চলে না। আজ তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গ্রামস্থ কোনো লোকই দাহ করিতে আসিবেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন, অবশেষে সেই মস্তক মুণ্ডনের পথই অবলম্বন করিতে হইল; সপরিবারে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, গৃহস্থ বৈরাগী হইয়া আপন গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন, জাত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। এইরূপেই বঙ্গদেশে জাতবৈষ্ণবের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

শিরোমণির জাতবৈষ্ণব হইবার পর তাঁহার গুরুত্ব ব্যবসায়ের আয় এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে বিদায় পাইতেন, সে সকল আয় আর কিছুই রহিল না। তাঁহার পিতামহের আমলের কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ছিল, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা সে ব্রহ্মত্র জমি হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ শিরোমণির পূর্ব শত্রু হরিদাস তর্কপঞ্চানন গ্রামের সকলকে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, পতিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র ভোগ করিবার অধিকার নাই, এ-বিষয়ে জমিদারি কাছারিতে দরখাস্ত করিতে হইবে।

গ্রাম্য লোকেরা সেই দরখাস্ত দিয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু শিরোমণি ঠাকুর শেষাবস্থায় বড় কষ্টের সহিত দিনাতিপাত করিয়াছিলেন। শিরোমণি ঠাকুর এবং কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর পরে কী অবস্থা হইল তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

নয়

কলিকাতা যাত্রা

এ-সংসারে মনুষ্য একটা-না-একটা বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। যে সকল লোক নিতান্ত অলস, যাহাদের মন অত্যন্ত অসার হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের জীবনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, যাহারা কোনো প্রকার সদনুষ্ঠানেই লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না, তাহাদের জীবনেরও এক-একটা অবলম্বন রহিয়াছে। যে-অবস্থায় থাকিলে, যেরূপ কার্যে সময়াতিপাত করিলে, তাহাদের কোনো কষ্ট বোধ হয় না, বরং সুখবোধ হয়, সেই অবস্থা এবং সেইরূপ কার্যেই তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এইরূপ অলস এবং অসার লোকদিগকে প্রায়ই হৃদয়হীন দেখা যায়। ইহাদিগের হৃদয় প্রস্রবণ পরিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছে; ইহাদের অন্তরাত্মা জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহাদিগের জীবনে কোনো বিষয় সম্বন্ধেই জীবন্ত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। হৃদয়ই উৎসাহের উৎস। এই হৃদয় প্রস্রবণ হইতেই উৎসাহের স্রোত ও ইচ্ছার স্রোত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহার হৃদয় প্রস্রবণ পরিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছে তাহার জীবন-নদীর মধ্যে স্রোত পরিলক্ষিত হয় না। সেই স্রোত-শূন্য জীবননদী মলিনতা পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইতে সর্বদাই বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীরিত হয়।

সাবিত্রী অশিক্ষিতা, কিন্তু হৃদয়হীনা নহে। তাহার হৃদয় প্রস্রবণ স্নেহসলিলে পরিপূর্ণ। এ-প্রস্রবণের জল ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উপরে উঠিতেছে। প্রবাহিত হইবার সুযোগ নাই। সম্মুখে পর্বতসম বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কিছুতেই উল্লঙ্ঘিত হয় না, প্রাকৃতিক নিয়ম কেহই পরাস্ত করিতে পারে না। যখন এই হৃদয় প্রস্রবণের স্নেহসলিল ক্রমে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তখন হৃদয়স্রোত সম্মুখস্থিত অচল-পর্বত-সদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সে পর্বতখণ্ড ভাসিয়া যাইবে।

বৃদ্ধ পিতাকে কিরূপে প্রতিপালন করিবে, কী প্রকারে পিতাকে সুস্থ রাখিবে, ইতিপূর্বে সাবিত্রীর তাহাই একমাত্র চিন্তা ছিল। এই চিন্তাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে চিন্তা চলিয়া গিয়াছে। পরে কিরূপে পিতার শ্রাদ্ধ করিবে—শ্রাদ্ধ না করিলে তাহার পিতার নরক হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই—এই তাহার দ্বিতীয় চিন্তা—জীবনের দ্বিতীয় অবলম্বন হইল। কিন্তু শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং

এ-চিন্তাও শেষ হইল। এখন,—কী করিব?—এই প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইল। যদি সাবিত্রী হৃদয়হীনা হইত তবে এ-প্রশ্নের উত্তরে তাহার মন বলিয়া উঠিত, 'আর কী করিব? আমি স্ত্রীলোক আমার কী সাধ্য আছে? যত দিন আছি, আরাটুন সাহেবের গৃহে থাকিব। দয়াবতী আরাটুন সাহেবের পত্নী আমার আহার ও পরিধানের সংস্থান করিয়া দিতেছেন, ভবিষ্যতেও দিবেন।' কিন্তু সাবিত্রী হৃদয়হীনা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই নীচ কুলোদ্ভবা অশিক্ষিতা রমণী হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেরূপ দুঃসাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইল, যেরূপ কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিল, যেরূপ অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিল, এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত যুবকদিগের মধ্যে কয়টি লোকের জীবনে এইরূপ মহদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়?

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষিতাবস্থা অপেক্ষা অশিক্ষিতাবস্থাই ভাল? তাহা নহে। যে-শিক্ষা হৃদয়কে স্পর্শ করে না, যে-শিক্ষা দ্বারা হৃদয় সমুন্নত হয় না, পক্ষান্তরে যে-শিক্ষা দ্বারা মানব মনে স্বার্থপরতার বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে থাকে, সে-শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষাই ভাল। যাহার হৃদয় নাই, তাহার জীবনে শিক্ষা দ্বারা কোনো সুফলই ফলিবে না।

এই অশিক্ষিতা সহৃদয়া রমণীর হৃদয়াবেগেই একমাত্র পরিচালক ও নেতা হইয়া ইহাকে কর্তব্যের পথে পরিচালন করিতে লাগিল। পিতার চিন্তা হৃদয় হইতে দূর হইবামাত্র সে তাহার স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে লাগিল, কী উপায় অবলম্বন করিলে স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে তাহাই দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিল। শুনিয়াছিল যে, তাহার স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতার জেলে প্রেরিত হইয়াছে। সাবিত্রী মনে-মনে ভাবিতে লাগিল যে, কলিকাতা যাইতে পারিলে অবশ্যই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু কলিকাতা কতদিনের পথ, সেখানে কিরূপে যাইবে, কাহার সঙ্গে যাইবে, তাহাই এখন নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ-ছয়মাস অতিবাহিত হইল। হেমন্ত ঋতুর অবসানে শীতকাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রী কেবল অহোরাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে পরমেশ্বর, আমাকে কলিকাতা যাইবার সুযোগ করিয়া দেও।' তাহার শরীর একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শরীরে কিঞ্চিৎ মাত্রও বল নাই, কিন্তু মনে বিলক্ষণ সাহস আছে যে, সে অনায়াসে পদব্রজে কলিকাতা যাইতে পারিবে। তাহার কলিকাতা যাইবার আর-কোনো বাধাই সে দেখিতে পায় না, কেবল একমাত্র ভয়, পাছে তাহাকে নিরাশ্রয়া দেখিয়া কোনো দুষ্টলোক তাহার ধর্ম নষ্ট করে। এখানে আরাটুন সাহেবের পত্নী তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং এখানে যতদিন থাকিবে কেহ তাহার ধর্ম নষ্ট করিতে সাহস করিবে না।

অনেক চিন্তার পর সে মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, অনাথা স্ত্রীলোকের ধর্মরক্ষা ঈশ্বরই করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে তিনিই আমার ধর্ম রক্ষা করিবেন। সাবিত্রী রামায়ণ মহাভারতে অনেকানেক উপাখ্যান পাঠ করিয়াছে যে, কত কত স্বাধ্বী স্ত্রীলোক কামাসক্ত

পাষণ্ডদিগের হস্তে পড়িয়াও আপন-আপন সতীত্বধর্ম রক্ষা করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান তাহাদিগের ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। এই চিন্তা আজ তাহার মনে অত্যন্ত সাহস প্রদান করিল। সে নিশ্চয়য়ই অবধারণ করিল যে, অনাথা স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার ভার ঈশ্বরের হস্তে। তাই যদি হইল, তবে আর কলিকাতা যাইতে ভয় কী? সাবিত্রী কলিকাতা যাইবে বলিয়া কৃত সংকল্প হইল। তৎক্ষণাৎ আরাটুন সাহেবের পত্নর এবং বদরন্নেসার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

এস্থার বিবি বলিলেন, 'বাছা! কলিকাতা ছয়-সাত দিনের পথ; তুমি আঠার-উনিশ বৎসরের মেয়ে, একাকিনী কিরূপে কলকাতা যাইবে? পথে কত চোর-ডাকাত আছে।'

সাবিত্রী। আমার তো টাকা কড়ি নাই। চোর-ডাকাত কী করিবে?

বদরন্নেসা। চোর-ডাকাত যদি তোমার ধর্ম নষ্ট করে?

সাবিত্রী। অনাথাদিগের ধর্ম রক্ষার ভার স্বয়ং ভগবানের হস্তে। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে। আমি বৈরাগিনীর বেশে গেলে ভাল হয় না?

বদরন্নেসা। না, না, কখনো না। চোর-ডাকাত বরং ধর্ম নষ্ট করে না। তাহারা অর্থলোভী, অর্থই কেবল অপহরণ করে। কিন্তু হিন্দু বৈরাগীরা বড় নচ্ছার।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, এমন কথা বলিবেন না। ধর্মের জন্য তাহারা সকল ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হয়। তারা কি আর কুকার্য করে?

বদরন্নেসা। ধর্মের জন্য দুই-একটা লোক বৈরাগী হইতে পারে। আর তোমাদের হিন্দুগুলি জাতি যাওয়ার উপক্রম হইলেই বৈরাগী হয়। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল জগন্নাথ বিশ্বাসের ভ্রাতৃবধূ ছিদাম বিশ্বাসের বিধবা স্ত্রী বৈষ্ণবী হইয়াছে। সে কি ধর্মের জন্যই বৈরাগিণী হইয়াছে? জগন্নাথ বিশ্বাসের জাতি যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাই ভ্রাতৃবধূকে বৈরাগীর অখড়ায় পাঠাইয়া দিয়াছে।

এস্থার। মা, ওসব বৈরাগী-বৈষ্ণবের কথা ছাড়িয়া দাও। ওর কী করিব তাই আমি ভাবিতেছিলাম। সাহেব লবণের গোলার মকদ্দমা করিতে কলিকাতা যাইবেন। সেদিন তাঁহার যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে লিখিয়াছেন, দিনাজপুর হইতে চৈত্র মাসে এখানে আসিবেন, পরে বৈশাখ মাসের প্রথমেই কলিকাতা যাইবেন। সাহেবের সঙ্গে আমাদের অনেক হিন্দু চাকর যাইবে। আমি না হয় একজন বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোকও সাবিত্রীর সঙ্গে দিব। সাহেবের সঙ্গে সাবিত্রী কলিকাতা গেলে ভাল হয়?

সাবিত্রী। আজ্ঞে, তাহা হইলে তো ভালই হয়।

বদরন্নেসা। এই বেশ কথা বলিয়াছ। (এস্থার বিবির গলা ধরিয়া) মা আমার সকল বিষয়ই ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা সদুপায় করিতে পারে।

আরাটুন সাহেবের দিনাজপুরের লবণের গোলা বেরেলস্ট এবং ফ্রান্সিস সাইক সাহেবের গোমস্তাগণ যে লুট করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরাটুন সাহেব ইতিপূর্বে

স্বয়ং দিনাজপুর গিয়াছেন। দিনাজপুর হইতে অল্পদিন হইল এক পত্র লিখিয়াছেন যে, চৈত্র মাসে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিয়া, বৈশাখ মাসে কলিকাতা যাইবেন। সেখানে মেয়র কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন। আজ পর্যন্তও কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপিত হয় নাই। মেয়র কোর্টের একজন জজ উইলিয়েম বোল্টম। ইনি কাসিমবাজার ফেক্টরিতে তিনবৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া, দেশীয় লোকের রক্ত শোষণ পূর্বক সুদ্ধ কেবল নিজের বাণিজ্য দ্বারা নয় লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন।*

সাবিত্রী আরাটুন সাহেবের প্রত্যাবর্তনের আশায় ১৭৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিল। কিন্তু মার্চ মাসের শেষে আরাটুন সাহেবের আর-এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল। এই পত্রে সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি দিনাজপুর হইতেই মালদহ এবং রাজমহলের রাস্তা দিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন; তিনি মকদ্দমা রুজু না করিয়া, মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিবেন না; এ মকদ্দমা উপলক্ষে হয়তো একবৎসরের অধিক কাল তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইবে।

এই সংবাদ শ্রবণে সাবিত্রী একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল, কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না, একাকিনী কলিকাতা যাইবে বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল। আরাটুন সাহেবের পত্নী অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সাবিত্রীর মন আর এখানে তিষ্ঠিল না। বদরন্নেসা বলিলেন যে, তোমার স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভাই যাহাতে খালাস হইতে পারেন, সে বিষয়ে আমরা আরাটুন সাহেবকে চেষ্টা করিতে লিখিব। তুমি স্ত্রীলোক, সেখানে যাইয়া কিছু করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ কলিকাতার পথ অতি দুর্গম, স্থানে স্থানে বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু সাবিত্রী তাহা শুনিল না। তখন এস্থার বিবি পঞ্চাশটি টাকা পথ খরচের নিমিত্ত তাহার হস্তে দিলেন।

সাবিত্রী বলিল, 'মা এত টাকা সঙ্গে নিয়া চলিলে বরং বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।'

সে মাত্র দশটি টাকা রাখিয়া, বাকি টাকা এস্থার বিবির হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। বস্ত্রাদি অভাবে তাহার কোনো কষ্ট না হয়, এইজন্য এস্থার বিবি তাহাকে কয়েক খানা বস্ত্র দিলেন।

ঊনবিংশ বর্ষীয়া যুবতী একাকিনী পতি ও ভ্রাতার উদ্ধারার্থ কলিকাতা চলিল। বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, ধন নাই, সম্পত্তি নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণই ভরসা। কিন্তু বিপদের সময় ধন-সম্পত্তি, বন্ধু-বান্ধব, কিছুই কার্যকর হয় না। তখন একমাত্র বিপদভঞ্জন পরমেশ্বর ভিন্ন জীবের আর গতি নাই। সুতরাং সাবিত্রীকে আমরা একবারে আশ্রয়হীনা, সহায়হীনা বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাঙ্গালের বন্ধু অনাথশরণ পরমেশ্বরই তাহার চিরসহায়, বিশ্ব সংসারের রাজাধিরাজ তাহার বন্ধু, তবে আর ভয় কি?

*Vide note (14) in the appendix

দশ
গুরু গোবিন্দ ভক্ত

চৈত্র মাস। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। অতি প্রখর রৌদ্র। পথিকগণ সম্মুখস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাজারে প্রবেশ করিয়া আহারের আয়োজন করিতেছে। বাজারে তিনখানি মাত্র দোকান, আর চারি-পাঁচখানি ছাপড়া। পথিকদিগের মধ্যে যাহারা অগ্রে এখানে পৌঁছিয়াছে, তাহারা ছাপড়ার মধ্যে চুল্লি খনন করিয়া ভাত রান্ধিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা কিছু পরে আসিয়াছে, তাহাদের আর পাক করিবার নিমিত্ত ছাপড়া মিলিল না, বাজারের মধ্যস্থিত বটবৃক্ষতলে চুল্লি খনন করিতেছে। বাজারের মধ্যে তিন-চারটি বটবৃক্ষ রহিয়াছে। এক একদল পথিক এক একটি বটবৃক্ষের তলে বসিয়া পাকের আয়োজন করিতেছে ও নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতেছে।

সাবিত্রী আর হাঁটিতে পারে না; সমুদয় পথিকের পশ্চাতে পড়িয়াছে, এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া এই বাজারের দিকে আসিতেছে। তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত কোনো বৃক্ষছায়া মিলে কি না। সম্মুখে দুইটা বটবৃক্ষতলে কত কত অপরিচিত লোক বসিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ রন্ধনের আয়োজন করিতেছে। ইহাদিগের নিকট যাইয়া বসিতে সাহস হইল না। কিছু দূরে আর একটি বটবৃক্ষ দেখিল। সেখানে দুইটি স্ত্রীলোক ও একটি বৈষ্ণব বসিয়া আছেন। স্ত্রীলোক দুইটি রন্ধনের আয়োজন করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে একজন অপরকে পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিতেছে। বাবাজী ঠাকুর পার্শ্বে বসিয়া তামাক টানিতেছেন। বৈষ্ণবদিগের প্রতি সাবিত্রীর বিশেষ ভক্তি ছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট দুইটি স্ত্রীলোকও দেখিতে পাইল; সুতরাং তাহারা যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিল সেই বৃক্ষের তলে যাইয়া বসিল। বাবাজী ঠাকুর সাবিত্রীকে দেখিয়া, হুঁকাটি হাতে করিয়া তাহার কাছে আসিয়া আবার তামাক খাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সাবিত্রীকে সম্মোধন পূর্বক বলিলেন, 'বাছা! তুমি কোথায় চলিয়াছ? তোমাকে পূর্বে কোথায় দেখিয়া থাকিব।'

সাবিত্রী। আজ্ঞে, আমি কলিকাতা যাইব।

বাবাজী। তোমাকে গৃহস্থের কন্যা বলিয়া বোধ হয়, তুমি কলিকাতা চলিয়াছ কেন?

সাবিত্রী। আজ্ঞে, আমাদের বড় বিপদ। কোম্পানির লোকে আমার ভাইকে কলিকাতার জেলে পাঠাইয়াছে।

বাবাজী। তুমি তাঁতির মেয়ে নাকি?

সাবিত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

বাবাজী। তোমার আর কেহ নাই?

সাবিত্রী। আজ্ঞে, মা বাপ সকলি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

বাবাজী। তোমার স্বামী নাই, তুমি কি বিধবা নাকি?

সাবিত্রী। আজ্ঞে আমার স্বামীও জেলে আছেন।

বাবাজী। আজকাল যে দিন পড়িয়াছে, তা বিচার-আচার একেবারেই নাই। হরে-কৃষ্ণ-হরে-কৃষ্ণ! তোমার পিতার নাম ছিল কী?

সাবিত্রী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভাবিল আত্মপরিচয় দিবে কি না। কিন্তু শেষে মনে করিল বৈষ্ণব ঠাকুর অত্যন্ত ধার্মিক, ইহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানে কোনো অনিষ্ট হইবে না।

এই ভাবিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি সভারাম বসাকের মেয়ে।'

বাবাজী। ওঃ—সভারাম বসাকের মেয়ে? সৈদাবাদের নিকট তোমাদের বাড়ি? সভারামের মৃত্যু হইয়াছে?

সাবিত্রী আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি চিনিলেন কিরূপে?

বাবাজী। সভারামের নাম দেশসুদ্ধ ছোট, বড় সকলেই জানে। অমন কারিকর তো আর মিলিবে না। প্রেমানন্দ অধিকারী ঠাকুর তো তোমাদিগের গুরু ছিলেন? (প্রেমানন্দ নাম বলিবামাত্র বাবাজী ঠাকুর প্রণাম করিলেন।) আমি পূর্বে তাঁহার আখড়ায়ই ছিলাম। তিনি আমারও গুরু ছিলেন। আমাদের আখড়ার নিকটই তাঁহার আখড়া ছিল। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, তাঁহার আখড়া কাটোয়াতে ছিল না? এই দুই বৎসরের মধ্যে আর তাঁহার কোনো তত্ত্ব খবর পাই নাই।

বাবাজী। আমাদের আখড়াও কাটোয়াতে। আমি এখন ভক্তদাস বাবাজীর আখড়ায় থাকি। সম্প্রতি তোমাদের বাড়ির নিকটই উদয়চাঁদ ঘোষের বাড়ি গিয়াছিলাম। উদয়চাঁদ আমাদের শিষ্য। তুমি কি কাটোয়ার রাস্তা দিয়া কলিকাতা যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছ?

সাবিত্রী। আজ্ঞে, আমি রাস্তা পথ কিছুই জানি না। শুনিয়াছি কাটোয়া দিয়া গেলেই সহজে যাইতে পারিব।

বাবাজী। তবে আমাদের সঙ্গে একত্রেই চল। তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এখানে আহারের আয়োজন করিবে না? ঐ দোকানে ডাব পাওয়া যায়। আগে একটু জল পান করিয়া সুস্থ হইবার চেষ্টা কর, পরে আহারের আয়োজন করিবে। এ রৌদ্রে চলা যায় না। বেলাশেষে আমাদের সঙ্গে একত্রেই যাইতে পারিবে।

বাবাজীর সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক। তাহার একজনের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের

অধিক হইয়াছে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বয়োধিকা স্ত্রীলোকটি ভাত রাঁধিতেছে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি সমুদয় আয়োজন করিয়া দিতেছে ও জল আনিতেছে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির কার্যে একটু ত্রুটি হইলেই বয়োধিকা অতি কর্কশ স্বরে তাহাকে তিরস্কার করে। কিন্তু বাবাজী ঠাকুর যখন সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তখন সেই বয়োধিকা স্ত্রী একাগ্রতার সহিত স্থিরনেত্রে বাবাজী ঠাকুর ও সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উনুনের আগুন নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাহার একেবারেই মনোযোগ নাই। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে উনুনের আগুন নিবিয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গিনী অন্যমনস্ক হইয়া বাবাজী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সে তখন বয়োধিকা স্ত্রীলোকটিকে বলিল, 'ওগো উনুনের আগুন যে নিবিয়াছে'—বয়োধিকা স্ত্রীলোক অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলিলেন, 'যাউক নিবে—'এই বলিয়া আবার উনুনের আগুন জ্বালিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী পুষ্করিণীতে যাইয়া স্নান করিল। পরে দোকান হইতে একটি ডাব আনিয়া, জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইল।

বাবাজী ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার আর স্বতন্ত্র পাক করিবার প্রয়োজন নাই, আমাদের এক পাকেই আহার করিতে পারিবে। তোমরা তো আমাদেরই শিষ্য ছিলে। আমাদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে কোনো দোষ নাই।'

'বাবাজীর এই কথা শুনিয়া বয়োধিকা স্ত্রীলোকটি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, 'এখানেও আবার মহোৎসব হইবে নাকি? মোটে তিন জনের চাউল লইয়াছি।'

বাবাজী বলিলেন, 'ছি ছি এমন কথা মুখে আনিও না। ঠাকুর দয়া করিয়া পথে একটি অতিথি জুটাইয়া দিলেন, অতিথি সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব না?'

বয়োধিকা স্ত্রীলোক বলিলেন, 'হাঁ আমি জানি, নানা স্থানেই তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিতেছ।'

বাবাজীর আচরণদৃষ্টে তাঁহার প্রতি সাবিত্রীর বিশেষ ভক্তি হইল। কিন্তু বাবাজীর সঙ্গিনী দুইটি স্ত্রীলোককে বারবার ঝগড়া করিতে দেখিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিল। আহারান্তে বাবাজী আবার সাবিত্রীর নিকট বসিয়া, তাহার সহিত নানা কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রীকে তাঁহার সঙ্গিনী দুইটি স্ত্রীলোকেই অতিশয় বিদ্বেষপূর্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। নিতান্ত সরলা সাবিত্রী ইহার নিগঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাবাজী। বাছা কলিকাতা অনেক দূর। পথে অনেক চোর ডাকাত আছে। আমি ভাবিতেছি তুমি কাটোয়া হইতে একাকিনী কিরূপে যাইবে। আর তুমি সেখানে যাইয়াও তো তাহাদের দেখা পাইবে না। বড় বিপদে পড়িবে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, কলিকাতায় আমাদের সৈদাবাদের আরাটুন সাহেব আছেন। তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে তিনিই সকল ঠিক করিয়া দিবেন।

বাবাজী। বাছা, অমন কাজ করিও না। ম্লেচ্ছ জাতিকে বিশ্বাস নাই। তোমাকে জাতিভ্রষ্টা করিতে পারে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, এমন কথা বলিবেন না। তাঁহার স্ত্রীকে আমি মা বলিয়া ডাকি। ছোট বেলা হইতে তিনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন।

বাবাজী। ম্লেচ্ছ জাতির কি কোনো ধর্ম জ্ঞান আছে? তুমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর। ঘরে বসিয়া স্বামী পুত্র পাইবে। ঠাকুরের কৃপায় কি না হইতে পারে? কৃষ্ণই সকলের স্বামী। কৃষ্ণই জগতের পতি। সেই নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে যাহাকে পতি বলিয়া মনে করিবে তিনিই তোমার স্বামী।

বাবাজীর এই শেষ বাক্যের অর্থ সাবিত্রী কিছুই বুঝিতে পারিল না। 'নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে যাহাকে পতি বলিয়া মনে করিবে তিনিই তোমার স্বামী' এ-কথার অর্থ কী? সাবিত্রী ভাবিল এ ধর্মশাস্ত্রের কোনো ভক্তির কথা হইবে। বাবাজীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোক দুইটির আর কোনো সন্দেহ রহিল না। তাহারা অত্যন্ত কোপদৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী সাবিত্রীকে আবার বলিলেন, 'বাছা, তুমি কলিকাতা গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। যাহাতে ভক্তদিগের সঙ্গে থাকিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পার, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কি না হইতে পারে? ঘরে বসিয়াই স্বামী পাইবে। তুমি গৃহস্থের মেয়ে—এ দুর্গমপথে অনেক বিপদ রহিয়াছে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, আমার মা বাপ সকলই গিয়াছ। এখন আমার ভাই আমার ধর্ম, ভাই আমার সাধুসঙ্গ।

সাবিত্রী লজ্জায় স্বামীর নাম উল্লেখ করিল না।

বাবাজী। আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একত্রে কাটোয়া পর্যন্ত তো চল, তার পর যাহা হয় করিবে। আমাদের আখড়ায় গেলে পর আবার সাধুসঙ্গ সংস্পর্শে ঠাকুর তোমার মন ফিরাইতেও পারেন। যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে, আর ঠাকুর তোমাকে ধর্মের পথে নিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য তোমার ধর্ম লাভ হবে।

বেলা অবসান হইল। এখন আর বড় রৌদ্রের উত্তাপ নাই। পথিকগণ সকলেই আপন-আপন জিনিসপত্র বান্ধিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাবিত্রীও এই বাবাজীর সঙ্গে একত্র হইয়া চলিল এবং দুই দিনের পর ভক্তদাস বাবাজীর আখড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভক্তদাস বাবাজীর কপালে এবং বুকে মৃত্তিকার ফোঁটা, মাথায় চুল নাই, টাকপড়া মাথা। আখড়ার মধ্যে একখানি মাত্র বড় ঘর, তাহাতে ভক্তদাস বাবাজী এবং তাঁহার তিন-চারিটি সেবাদাসী বাস করেন। আর ছোট-ছোট আট-নয়খানি ঘরে এক-একজন বাবাজী স্বীয়-স্বীয় সেবাদাসীগণ সহ অবস্থান করেন। গুরু গোবিন্দ বাবাজীর সঙ্গে বয়োধিকা

স্ত্রীলোকটি পূর্ব হইতে এই আখড়ায় বাস করিতেছিলেন। ইনি গুরু গোবিন্দ বাবাজীর সেবাদাসী, ইহার নাম কুঞ্জেশ্বরী। ইনি আখড়ায় সকলের নিকটই পরিচিত। কিন্তু সাবিত্রী এবং বাবাজীর সঙ্গে দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটি আজ প্রথম এখানে আসিয়াছে। ভক্তদাস বাবাজী ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, গুরু গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গিনী দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি আপনার শিষ্য উদয়চাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেকৃষ্ণের পত্নী। হরেকৃষ্ণের মৃত্যু পর ইনি সর্বদাই নামামৃত পানে প্রবত্ত থাকিতেন, সংসারের কাজকর্ম ইহার কিছুই ভাল লাগিত না। এবার উদয়চাঁদের বাড়ি যাইবার পর, ইনি একেবারে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভেক ধারণ পূর্বক সাধু সঙ্গে দিনাতিপাত এবং ভক্তগণের চরণ সেবা করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। উদয়চাঁদ ইহার ধর্মনিষ্ঠাদর্শনে বড় আহ্লাদিত হইলেন। তাই এখন ইনি ভেক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন। আর এই মেয়েটি মুর্শিদাবাদের সভারাম বসাকের কন্যা। সভারামের বাড়ি ইংরাজেরা লুট করিয়া নিয়াছে। সভারাম মরিয়া গিয়াছে। তাহার পুত্র জেলে আছে। ইহার অল্প বয়স। কু-লোকের পরামর্শানুসারে এ কলিকাতা যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই ইহাকে রাস্তায় পাইয়া আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। সভারাম প্রেমানন্দ বাবাজীর শিষ্য ছিল।' (প্রেমানন্দ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র বাবাজী প্রণাম করিলেন)।

ভক্তদাস বাবাজী এই নবাগত স্ত্রীলোকদ্বয়ের পরিচয় শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ইহাদিগকে আনিয়াছ, ভালই করিয়াছ। ইহাদিগের থাকিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঘর তো আর নাই, সুতরাং আমার এই ঘরেই সম্প্রতি থাকিতে পারিবে।'—ভক্তদাস বাবাজীর একজন সেবাদাসী তখন বাবাজীর নিকট বসিয়া তাঁহার পা টিপিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'এ-ঘরে কি আর জায়গা হইবে? আমাদের ধরে না।'

ভক্তদাস বাবাজী অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি জন্য যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, বুঝিতে পারি না। কোনো অভ্যাগত অতিথিকে গৃহ ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে শয়ন করিতে হইবে। ঘরে না ধরে, তোমরা কেহ কেহ বাহিরে থাকিবে। বৈষ্ণবের আবার ঘর কী?'

ভক্তদাসের কথা শুনিয়া বৈষ্ণবী চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী এই আখড়ায় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগের যেরূপ ঘৃণিত কুব্যবহার দর্শন করিল, তাহা উল্লেখ করিতে হইলে এই পুস্তক অশ্লীলতা পরিপূর্ণ হইবে, বঙ্গীয় পাঠিকাদিগের অপাঠ্য হইবে। সুতরাং তাহা এই স্থানে আর উল্লেখ করিলাম না। সাবিত্রী, গুরু গোবিন্দ বাবাজী এবং ভক্তদাস বাবাজীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত ত্রাসিত হইল, 'হা দয়াময় ঈশ্বর! হা দয়াময় ঈশ্বর! আমার ধর্ম রক্ষা কর—' এই বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কী করিবে তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার সঙ্গে যে আরাটুন সাহেবের স্ত্রী দশটি টাকা দিয়াছিলেন তাহার পাঁচ টাকা বদরন্নেসা তাহার কাপড়ের বোচকার মধ্যে

বান্ধিয়া দিয়াছিলেন, আর পাঁচ টাকা তাহার পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধা ছিল। গুরু গোবিন্দ বাবাজী রাস্তায় সাবিত্রীকে বলিয়াছিল যে, তোমার সঙ্গে টাকা রাখিলে হারাইয়া যাইতে পারে, আমার নিকট রাখ। সাবিত্রী তখন অঞ্চলের বাঁধা পাঁচ টাকা বাবাজীর হাতে দিয়াছিল। সে টাকা বাবাজীই আত্মসাৎ করিলেন।

যে দিবস সাবিত্রী এই আখড়ায় আসিয়াছিল, তাহার পর দিন ভক্তদাস বাবাজী সাবিত্রী এবং হরেকৃষ্ণের বিধবাকে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ভেক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী ভেক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সাবিত্রী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলল যে, আমি কখনো ভেক লইব না। আপনারা আমাকে এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে না দিলে এখনই আমি আত্মহত্যা করিব।

এই কথা শুনিয়া বাবাজীদিগের বড় ভয় হইল। আখড়ার মধ্যে একটা আত্মহত্যা হইলে আবার কে খুনের দায়ে পড়িবে? বৈষ্ণবেরা প্রায়ই কাপুরুষ এবং নিতান্ত ভয়ার্ত। তাহারা সাবিত্রীকে চলিয়া যাইতে বলিল। সে আপন বস্ত্রাদি লইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি আখড়া হইতে বাহির হইল। গুরু গোবিন্দ বাবাজী যে টাকা নিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট চাহিল না। আর চাহিলেও বোধ হয় বাবাজী তাহাকে সে টাকা দিতেন না।

হরেকৃষ্ণের স্ত্রী সেই দিনই মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ভেক গ্রহণ করিল। তাহার পূর্ব নাম আদরমণি ছিল। এখন ভক্তদাস তাহাকে ললিতমুঞ্জরী নামে অভিহিতা করিলেন। এই স্ত্রীলোক বিধবা হইবার পর, ইহার চরিত্র অত্যন্ত দূষিত হইয়াছিল বলিয়াই, ইহার ভাশুর উদয়চাঁদ ঘোষ, বৈষ্ণবদিগের দলে ইহাকে ভুক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বৎসর তাঁহার দৌহিত্রের নামকরণ উপলক্ষে ভক্তদাসের প্রতিনিধি স্বরূপ গুরু গোবিন্দ বাবাজী তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। সুতরাং এই সুযোগে ভেক গ্রহণার্থে গুরু গোবিন্দের সঙ্গে ইহাকে ভক্তদাস বাবাজীর আখড়ায় প্রেরণ করিয়াছেন।

এগার

ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী

সাবিত্রী ভক্তদাস বাবাজীর আখড়া হইতে বাহির হইয়াই অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। সে মনে-মনে স্থির করল পথে আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না; পথিকগণ যে পথে কলিকাতা যায় তাহাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সেই পথ দিয়াই বরাবর চলিয়া যাইবে। তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও মনে-মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, যাহা দেখিলাম এই কি বৈষ্ণব ধর্ম? বৈরাগিগণ কি এইরূপ কুকার্য করিয়া থাকেন? বদরন্নেসা যাহা বলিয়াছেন তাহা তো কিছুই মিথ্যা নহে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে বদরন্নেসা সাবিত্রীর নিকট বলিয়াছিলেন যে, 'হিন্দু বৈরাগি বড় নচ্ছার।'

হাঁটতে-হাঁটতে ক্রমে সে দুই ক্রোশ পথ চলিয়া গেলে পর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একটু বিশ্রাম না করিয়া আর হাঁটিতে পারে না। সম্মুখে পথের পার্শ্বে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবে বলিয়া মনে-মনে স্থির করিল। কিন্তু বৃক্ষের তলে আসিয়াই দেখিল যে একটি বয়োধিকা স্ত্রীলোক ভিখারিণীর বেশে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার পরিধান জীর্ণ মলিন বস্ত্র। স্ত্রীলোকটির বয়স এখন চল্লিশ বৎসর হয় নাই। কিন্তু বাতব্যাধিরোগে চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে। তাহার দুইহাতে দুইখানি যষ্টি। দাঁড়াইবার শক্তি নাই, দুইখানি যষ্টি ভর করিয়া বসিয়া-বসিয়া এক স্থান হইতে অতিকষ্টে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। তাহার নাসিকার অগ্রভাগ এবং ওষ্ঠদ্বয় হইতে পুঁজ রক্ত নির্গত হইতেছে। স্ত্রীলোকটি সাবিত্রীকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'মা আমাকে একটি পয়সা—আমাকে দয়া করিয়া একটি পয়সা দেও—আমি কালও কিছু খাইতে পাই নাই। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় প্রাণ যায়।'

স্ত্রীলোকটির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি সাবত্রীর বড় দয়া হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গে পয়সা নাই। পাঁচটি মাত্র টাকা আছে। তখন সাবিত্রী বলিল, আমার সঙ্গে পয়সা নাই, টাকা আছে; এখানে কোথাও টাকা ভাঙ্গাইতে পারিলে পয়সা দিতে পারি। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হয়। অধিক টাকা সঙ্গে থাকিলে তোমাকে একটি দিতাম।'

ভিখারিণী বলিল, 'মা লক্ষ্মী পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন, তোমার আশা পূর্ণ করুন। ঐ সম্মুখেই বাজার দেখা যায়, ওখানে টাকা ভাঙ্গাইতে পারিবে, তুমি বস। আমি নিতাইকে ডাকিয়া আনি, সে তোমার টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া দিতে পারিবে।'

এই বলিয়া ভিখারিণী বিশেষ উৎসাহের সহিত দুইহাতে দুইখানি যষ্টি লইয়া, সেই যষ্টি ভর করিয়া, বৃক্ষতল হইতে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে একখানি কুটিরের নিকট যাইয়া 'নিতাই নিতাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সেই কুটিরের পশ্চিমে আর একখানি কুটির ছিল। এই শেষোক্ত কুটির হইতে দশ-বার বৎসর বয়স্ক একটি বালক বাহির হইয়া আসিল। ভিখারিণী সেই বালককে সঙ্গে করিয়া আবার সাবিত্রীর নিকট আসিল এবং সাবিত্রীকে সেই বালকের হস্তে টাকা দিতে বলিল। সাবিত্রী বালকের হাতে টাকা দিল। সে তৎক্ষণাৎ বাজারে টাকা ভাঙ্গাইতে চলিয়া গেল।

বালকটি চলিয়া গেলে পর ভিখারিণী সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা লক্ষ্মী! তুমি কোথায় যাইবে?'

সাবিত্রী। আমি কলকাতা যাইব।

ভিখারিণী। বাছা! একাকিনী কলিকাতা যাইবে? কলিকাতা তো অনেক দূর। বাছা! তুমি বুঝি বাড়ি হইতে কাহারও সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছ। এমন কাজ করিও না। এ বুদ্ধি ছাড়। বাছা! আমার এই দুর্দশা দেখ। আমার অনেক টাকা কড়ি ছিল। আমার পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার গহনা ছিল। কেনই বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। আর এখন যে দুর্দশা তাহা পরমেশ্বরই জানেন। বাছা এই দেখ আমি এই ছেঁড়া কাপড় পরিতেছি। একখানি ভিন্ন দুইখানি কাপড় নাই। আমি কত লোককে কত কাপড় দিয়াছি। সভারাম তাঁতির বুনান বত্রিশ টাকা জোড়ার রেশমির কাপড় ভিন্ন সূতার কাপড় ছুঁইও নাই।

সাবিত্রী স্ত্রীলোকটির মুখে তাহার পিতার নাম শুনিয়া বড় আশ্চর্য হইল। সে তখন মনে-মনে ভাবিতে লাগিল ইহার বাড়ি নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী কোনো স্থানে ছিল।

কিছুকাল পরে সাবিত্রী স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পূর্বে কোথায় আপনার বাড়ি ছিল?'

ভিখারিণী। সৈদাবাদের একটু উত্তরে—বি—পাড়া।

সাবিত্রী। আমাদের বাড়িও সৈদাবাদের নিকট তাঁতিপাড়া।

ভিখারিণী। তোমার বাপের নাম কী?

সাবিত্রী। আমার বাপের নামই সভারাম বসাক। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভিখারিণী। তুমি সাভারাম বসাকের মেয়ে? (একটু অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত হইয়া। তবে তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে। সৈদাবাদের বিশ্বাসদিগের নাম শোন নাই?

সাবিত্রী। কোন বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন? সৈদাবাদের তো অনেক বিশ্বাস আছে। তবে নাম ডাকের লোক ছিদাম বিশ্বাস, জগন্নাথ বিশ্বাস?

ভিখারিণী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ঐ আগে যে নাম করিলে তিনিই আমার স্বামী ছিলেন।

সাবিত্রী। (অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া। আপনি ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী! আহা! আপনার এই

দুরবস্থা ! আপনি এখনই বাড়িতে খবর পাঠান, জগন্নাথ বিশ্বাসের পুত্র যাদবেন্দ্র বাবু পাল্কী করিয়া আপনাকে লইয়া যাইবেন। তাঁহাদের কি টাকা কড়ির অভাব আছে। আমরা শুনিয়াছি যে আপনি সংসার ধর্ম ছাড়িয়া ভেক লইয়াছেন ?

ভিখারিণী। ভেক নিয়াছি না মাথা খাইয়াছি। হা পরমেশ্বর এ-সংসারে যেন আর কেহ বৈরাগী হয় না। বৈরাগীর ন্যায় অধার্মিক, বৈরাগীর ন্যায় বেইমান আর কি কোথাও আছে। বাছা ! পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনাপত্র আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আমি এই আখড়ায় আসিয়াছিলাম। আজ আমার এই দুর্দশা। নিজে এখন হাঁটিয়া চলিয়া গৃহস্থের বাড়ি ভিক্ষা করিতে যাইতে পারি না। এই গাছতলায় বসিয়া পথিকদিগের নিকট ভিক্ষা করি। যেদিন দুইটি পয়সা মিলে সেইদিন ঐ বৈষ্ণবীর ছেলেটিকে দিয়া চাউল ডাইল আনাইয়া দুইটি আহার করি। আর যেদিন কিছু না মেলে, সেদিন পেটে অন্ন পড়ে না। কাল সমস্ত দিন এই গাছতলায় বসিয়া ছিলাম একটি পয়সাও মিলে নাই।

স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া সাবিত্রীর দুই চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ সাবিত্রী ইহার পূর্বকৃত কুকার্যের বিষয় কিছু জানিত না। সুতরাং যেন মনে করিতে লাগিল, যে, কেবল ধর্মানুষ্ঠান করিতে আসিয়া ইহার এই বিপদ হইয়াছে। সৈদাবাদের সাবিত্রীর সমবয়স্কা অন্যান্য মেয়েরা ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর বিষয় জানিত। কিন্তু সাবিত্রী অন্যান্য যুবতীদিগের ন্যায় পরের ঘরের কথা নিয়া বড় গল্প করিতে না, কিম্বা অন্যের ঘরের কোনো কথা কেহ তাহার নিকট বলিতে আসিলেও সে তাহাতে মনোযোগ দিত না। আর এই ভিখারিণী এখনও নিজের পূর্ববৃত্তান্ত যেভাবে বলিতেছিল, তাহাতে বোধহয় যেন তাহার নিজের কোনো দোষই ছিল না, বৈরাগীদিগের দ্বারাই প্রতারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চিরাভ্যস্ত পাপ দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় কলঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাদের সহজে আত্মকৃত দোষের উপর দৃষ্টি পড়ে না। এই পাপীয়সীর অন্তরে এখনও পর্যন্তও অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই। তাহা হইলে কি আর বৈরাগীদিগকেই কেবল নিন্দা করিত ? বৈরাগীদিগের সহস্র দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এই ভিখারিণীর নিকট তাহারা বড় অপরাধী ছিল না।

এই ভিখারিণী ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী কিন্তু কিরূপে ইহার এইরূপ দুরবস্থা হইল এবং ইহার স্বামী ছিদাম বিশ্বাসই বা কে ছিল, এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত পাঠক ও পাঠিকাদিগের বিশেষ কৌতূহল হইতে পারে। অতএব সৈদাবাদের বিশ্বাস পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করিব। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে এতৎপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুঃখিনী নিরপরাধিনী নবকিশোরের বৃদ্ধা জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

বার

বিশ্বাস পরিবারের পূর্ব বিবরণ

সৈদাবাদে জগাই ও ছিদাম নামে দুই সহোদর ছিল। সামান্য কৃষিকার্য অবলম্বন পূর্বক ইহারা জীবিকানির্বাহ করিত। ইহরা নিতান্ত গরিব ছিল। জগাইর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল কিন্তু অর্থাভাবে এ-পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারে নাই। ইহারা শূদ্র কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহাদিগের বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। পিতাকে কে ছিল তাহা বোধহয় ইহারা জানিত না।

জগাই ও ছিদাম এই দুই সহোদরের মধ্যে জগাই বাড়ি বসিয়া কৃষিকার্য করিত। ছিদাম ক্ষেত্রের আলু পটল ইত্যাদি তরকারি বাজারে বিক্রয় করিত। একবৎসর ছিদাম আলু পটল বিক্রয় ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক ফেরিওয়ালাদের ন্যায় কমলালেবু মাথায় করিয়া, কাশিমবাজারে ইংরাজ, ফরাসি, আরমানিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাতে ছিদামের সহিত অনেকানেক ইংরাজ বণিকদিগের পরিচয় হইল। ইহার কিছুকাল পরে, সে ইংরাজদিগের রেশমের কুঠিতে দালালি করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজদিগের কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির আসিস্টাণ্ট ওয়ারেন হেস্টিংস ছিদামকে বিশেষ কার্যদক্ষ মনে করিয়া তাহাকে রেশমের কুঠির প্যাদার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। পলাশির যুদ্ধের পূর্বেও ইংরাজ বণিকগণ কলে-কৌশলে দেশীয় তন্তুবায় ও অপরাপর বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকদিগের সর্বনাশ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু তখন কাহার উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, নবাব আলিবর্দি খাঁর ভয়ে সর্বদা সঙ্কুচিত থাকিতেন। তখন কেবল একমাত্র প্রবঞ্চনার দ্বারই উন্মুক্ত ছিল। সুতরাং সমধিক অর্থ লাভাশায় এই সকল ইংরাজ কোন প্রকার প্রবঞ্চনামূলক কার্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত ধূর্ত, এবং প্রবঞ্চনা, প্রতারণার কার্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারাই কেবল ইংরাজ বণিকদিগের প্রিয়পাত্র হইত। তাহারা ইংরাজ বণিকদিগের বিবিধ অবৈধ আচরণের এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাহায্য করিয়া অনায়াসে ধন-সম্পত্তি লাভ করিত। এই সকল ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য নরপিশাচসদৃশ প্রবঞ্চক বাঙ্গালি, ইংরাজ বণিকদিগকে তৎসাময়িক কুকার্যের সাহায্য করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইল; সুতরাং তাহাদের পৌত্র-প্রপৌত্রগণ মধ্যে অনেকেই বর্তমান সময়ে বঙ্গের অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ছিদাম রেশমের কুঠির প্যাদার কার্যে নিযুক্ত হইয়া, অত্যল্পকাল মধ্যেই হেস্টিংস সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। এই সময়ে রেশমের কুঠির প্যাদাদিগেরও বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইত। রেশমের কুঠিতে পূর্ণ তিন মাস কার্য করিবার পূর্বেই ছিদাম তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগাইর বিবাহের আয়োজন করিল। জগাইর বিবাহ না হইলে সে নিজে বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং প্রথমে জগাইর বিবাহ হইল। জগাইর বিবাহের একমাত্র পরে সে নিজে চতুর্দশ বৎসর বয়স্কা একটি শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। ছিদামের স্ত্রীর নাম বদনমণি; তাহার গাল দুইখানি একটু স্ফীত ছিল। সেই স্ফীত গণ্ডদ্বয় দ্বারা প্রায় চক্ষু কর্ণ ঢাকিয়া পড়িত। তজ্জন্য বাল্যকালে তাহাকে সকলে বদনী বলিয়া ডাকিত। বিবাহের সময় তাহার নাম বদনমণি হইল। বদনমণির সহিত ছিদামের বিবাহের সাত আট বৎসর পরে মেস্তর উইলিয়ম বোল্টস সাহেব কাশিমবাজারের ফেক্টরের (কুঠির প্রধান অধ্যক্ষের) কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইনি বাঙ্গালিদিগের রক্ত শোষণ করিয়া কয়েক বৎসরে প্রায় বিরানব্বই লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। পরে আবার কলিকাতাস্থ মেয়র কোর্টের জজের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছিদামের কার্যতৎপরতা দেখিয়া উইলিম বোল্টস সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ছিদামকে রেশমের কুঠির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু শেষে আবার কী মনে করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের যে বাণিজ্য ছিল সেই বাণিজ্যের দেওয়ানের পদে ছিদামকে নিযুক্ত করিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এ-বিষয় বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন কোম্পানির প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নিজ বাণিজ্য ছিল।

রেশমের কুঠির গোমস্তাদিগের মধ্যে ছিদামের ন্যায় কার্যদক্ষ লোক অতি অল্পই ছিল। ছিদাম কোনোপ্রকার কুকার্য কোনো প্রকার নৃশংস আচরণ করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং ছিদাম বোল্টস সাহেবের নিজের বাণিজ্যের গোমস্তাগিরি কার্যে নিযুক্ত হইলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যেরও অনেক কাজকর্ম তাহাকে দেখিতে হইত। অনেক বিষয়েই তাহার উপদেশ ও পরামর্শের আবশ্যক হইত। বোল্টস সাহেব বলিতেন ছিদাম আমার দক্ষিণ হস্ত। ছিদাম একপ্রকার বোল্টস সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যত অর্থলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ইংরাজ তখন এদেশে বাণিজ্য করিতে, তাঁহারা সকলেই ছিদামের প্রশংসা করিতেন। ছিদাম গোমস্তাগিরি পদে নিযুক্ত হইলে পর চৌদ্দ মাসের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিল। ছিদামের সহায়তা প্রাপ্তি নিবন্ধন বোল্টস সাহেব শুদ্ধ কেবল তাহার নিজের বাণিজ্য দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যে নয় লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যেও বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। বোল্টস সাহেবের সময়েই মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক তন্তুবায় স্বীয়-স্বীয় ঘর বাড়ি পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল।

এইরূপে অর্থোপার্জন পূর্বক ছিদাম নবাবের সরকার হইতে ক্রমে দশ বার খানা

তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইল এবং বাড়িতে কোটা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও যাইতে হইলে পাল্কী ভিন্ন চলিত না। গ্রামের লোকেরা ছিদামকে এখন ছিদামবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। জগাইকেও সকলেই বাবু বলিত কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু গ্রামের কেহ কেহ তাহাকে জগন্নাথবাবু বলিত। আর অন্যান্য লোকের মধ্যে কেহ 'বিশ্বাস মশাই', কেহ-কেহ বা 'বড়কর্তা' এবং গ্রাম্য বৃদ্ধ লোকেরা জগন্নাথ বিশ্বাস বলিয়া সম্বোধন করিত।

বাবু ছিদামচন্দ্র বিশ্বাস এবং জগন্নাথ বিশ্বাসকে এখন গ্রামের লোকেরা আর শূদ্র বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করিত না। বিপুল অর্থসঞ্চয় পূর্বক তাহারা প্রায় কায়স্থ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা নিজেও আপনাদিগকে কায়েত কিম্বা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্তও সর্ববাদিসম্মত কায়স্থ হইতে পারেন নাই। কায়স্থের মধ্যে দুই একটি প্রধান কুলীনের সঙ্গে কুটম্বিতা না করিলে এরূপ অবস্থায় কেহ রেজেষ্ঠারীকৃত কায়স্থ হইতে পারেন না।

বঙ্গদেশের কায়স্থগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। বঙ্গজ কায়স্থ এবং দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত যশোহরের প্রতাপাদিত্যের সন্তানগণ বঙ্গজ কায়স্থ। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলীনগণ অধিকাংশই বাখরগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের অধিকাংশ কুলীনই হুগলি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর যশোহরের অধিবাসী। ছিদামবাবু এবং জগন্নাথ বিশ্বাস বঙ্গজ কায়স্থ কি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সে-বিষয় এখন পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ছিদাম একজন ঘটকের মুখে শুনিলেন যে হুগলি বর্ধমান কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রদেশে দক্ষিণরাঢ়ী কায়েস্থেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলীনগণ ঢাকা বাখরগঞ্জের অধিবাসী। ঢাকা বাখরগঞ্জ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙ্গালার অশিক্ষিত ছোট লোকদিগের কতকটা কুসংস্কার আছে। সুতরাং ছিদামবাবু বলিলেন যে আমরাও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

এইরূপে ছিদাম দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া কার্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি এখন দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম যে বদনমণি ছিল, কিম্বা তাহার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তাহার স্ত্রীকে বদনী বলিয়া ডাকিত, ইহা ছিদামের কখনো সহ্য হইত না। এখন তিনি বড়মানুষ হইয়াছেন। তাহার স্ত্রীর একটা বড়মান্‌সি নাম চাই। সুতরাং তিনি স্ত্রীর পূর্ব নামের পরিবর্তে তাহাকে স্বর্ণলতা নামে অভিহিত করিলেন। কিন্তু জগন্নাথের স্ত্রীর নাম আর পরিবর্তিত হইল না। তাঁহার পূর্বনাম আহ্লাদিই রহিয়া গেল। বিশেষত জগন্নাথের স্ত্রীর নাম পরিবর্তনের কোনো অবশ্যকতাও পরিলক্ষিত হইল না। ছিদামের জমিজমা তালুক ইত্যাদির বন্দোবস্ত তাঁহার স্ত্রীর নামেই হইত। তাঁরই স্ত্রীর নামই নবাব সরকারে জারি হইবে; সুতরাং ছিদামের স্ত্রীর নাম পরিবর্তনেরই বিশেষ অবশ্যক হইয়াছিল।

ছিদামবাবু অনেক দাস-দাসী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ঘরকন্নার সমুদয় কাজকর্মই প্রায়

জগন্নাথের স্ত্রীকে করিতে হইত। এই সকল দাস-দাসীর দ্বারা জগন্নাথের স্ত্রীর সাহায্য হইত না। পরিবারের মধ্যে ছিদাম অর্থোপর্জন করেন। তাঁহার উপার্জিত অর্থে সকলেই প্রতিপালিত হইতেছেন; সুতরাং ছিদামের স্ত্রীর যে ঘরের কোন কাজ কর্ম করিবে তাহা কি আর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ছিদামের বাড়ি এখন পাঁচ-ছয় জন দাসী এবং আট নয়জন ভৃত্য নিযুক্ত হইল। কিন্তু দুইজন দাসীকে সর্বদাই ছিদামের স্ত্রীর নিকট বসিয়া থাকিতে হইত। আর একজন ছিদামের কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইত। জগন্নাথের স্ত্রীর পাঁচ-ছয়টি সন্তান ছিল। তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। জগন্নাথের স্ত্রী নিজেও গৃহ কার্যে সর্বদা এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, ছোট ছেলেটিকে স্তন্যপান করাইবার সময়ও পাইতেন না। এখন ছিদামের সংসার একটা রাবণের সংসারের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ ত্রিশ চল্লিশ জন লোক ছিদামের বাড়ি আহার করে। জগন্নাথের স্ত্রীকে ইহাদিগের সকলের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। অপরাহ্ণে ছিদাম এবং ছিদামের স্ত্রীর নিমিত্ত জল খাবার প্রস্তুত করিতে হয়। এ বেচারী এক দিনও বেলা চার ঘটিকার পূর্বে আহার করিবার অবকাশ পায় না। যে কয়েকটি ছিদামের স্ত্রীর খাস দাসী ছিল তাহারা ছোটঠাকুরাণীর নিকট প্রায় রাত্র দিন বসিয়া থাকিত। জগন্নাথের স্ত্রী তাহাদিগকে কোনো কাজকর্ম করিতে ডাকিলে তাহারা একটুকু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিত 'ছোট ঠাকুরুণের শরীর আজ যেরূপ অসুখ করেছে তাতে আমরা এখন তাঁকে ফেলে রান্না ঘরের কাজ কর্তে পারি না—না হয় আজ না খেলেম—এক দিন না খেলেইবা কী হয়; —মনিবের সময় অসময় তো দেখতে হয়।' আবার দাসীদিগের মুখে অসুস্থতার কথা শুনিলেই ছিদামের স্ত্রীরও একটা না একটা শারীরিক রোগ তখনই উপস্থিত হইত। হয় তো মাথা ধরিত, না হয় কান কন কন করিত। মনুষ্যের শরীর বিবিধ রোগের মন্দির। 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরং' রোগ শরীরের মধ্যে সর্বদাই বিরাজিত। মুখে বলিলেই রোগ হইল।

ছিদামের স্ত্রীর এই সকল খাস দাসী ভিন্ন আর যে তিন জন দাসী ছিল তাহারাও সর্বদাই ছোট ঠাকুরাণীর মনস্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত দিনের মধ্যে দশবার আসিয়া ছোট ঠাকুরাণীর তত্ত্ব লইয়া যাইত। রন্ধনশালায় তাহাদিগের বড় দেখা যাইত না। জগন্নাথের স্ত্রী তাহাদিগকে কাজ করিতে ডাকিলেই তাহারা বলিয়া উঠিত—বাপ্‌রে বাপ, এ বড় ঠাক্‌রুণের যন্ত্রণায় আর লোক তিষ্ঠিতে পারে না। আজ শোনলাম ছোট ঠাক্‌রুণের শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে, তাই একবার একটু তাঁকে দেখতে এসেছি; ঘরের মধ্যে এক জনের ব্যামো স্যামো হলে কি আমরা একবার চোক্ দিয়ে দেখ্‌তে পাব না। তিনি না-হয় ঘরের কর্তা আছেন, তাই বলিয়া আমরা তো আর ছোট ঠাক্‌রুনকে অমান্য কোর্তে পারি না।'

এই সকল শুনিয়া ছিদামের স্ত্রীও বলিতেন, 'না দিদির মুখের যন্ত্রণায় এ ঘরে চাকর চাকরানী থাকিতে পারে না। কি না কাজ—ইহা তো নিজেও করিতে পারেন—কোন নবাবের মেয়েই ছিলেন;— পাঁচ-ছয়জন দাসী রহিয়াছে; আট নয়জন চাকর, সকলকেই উনি অস্থির করিয়া তোলেন। সর্বদাই সকলের উপর রাগ করেন।'

কিন্তু জগন্নাথের স্ত্রীর মুখে একটি কথাও ছিল না। চাকর চাকরানীর উপর রাগ করা দূরে থাকুক সে সকলকেই ভয় করিয়া চলিত। এইরূপে ছিদামের স্ত্রীর প্রত্যহই একটা না-একটা অসুখ হইত। আবার তাহার এই সকল অসুস্থতা নিবন্ধনে কখনো জগন্নাথের স্ত্রীকে জল গরম করিতে হইত, কখনো সত্বর সত্বর তাহার জন্য পৃথক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ অসুস্থতা নিবন্ধনে নিয়মিত স্নান আহারের কোন বাধা হয় না। সুতরাং ছিদামের স্ত্রীর আহারের আয়োজনও জগন্নাথের স্ত্রীকে আবার সত্বর সত্বর করিয়া দিতে হইত। যৌথ পরিবারের মধ্যে বঙ্গদেশে এখনও অনেকানেক গৃহে রমণীদিগের এরূপ অসুখ হয়। এইজন্য আমরা যৌথ পরিবার প্রথার বড় পক্ষপাতি নহি।

ছিদাম বিশ্বাসের সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র কন্যা। তাহার বয়স প্রায় দশ বৎসর হইয়াছে। ছিদামের স্ত্রীর আর কোনো সন্তানাদি হয় নাই। ছিদাম এত টাকা উপার্জন করিতেছেন তাহার পুত্রসন্তান জন্মিল না। জগন্নাথ বিশ্বাস দেশ-বিদেশ হইতে কত ওঝা, কত লগ্নাচার্য, দ্বারা জল পড়াইয়া ছিদামের স্ত্রীকে খাওয়াইতে লাগিলেন, কত কত গণকের দ্বারা ছিদামের স্ত্রীর হাত দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছিদামের আর সন্তান হয় না। জগন্নাথ বলিলেন পরমেশ্বর আমাকে তিন পুত্র দিয়াছেন, ইহার এক পুত্র আমি বউমাকে দিব। কিন্তু জগন্নাথের স্ত্রী পুত্র দিতে বড় সম্মত ছিলেন না। ছিদামের স্ত্রী তাহার সন্তানগণকে কালভূত বলিয়া ঘৃণা করিত।

ছিদামের স্ত্রী কোনো কাজ কর্ম করিতেন না, দিবারাত্র প্রায় শুইয়া থাকিতেন। কিন্তু অপরাহ্ণে যখন পাড়ার শ্যামার মা, জগার মা, নাপ্তানি প্রভৃতি আসিয়া একত্রে সমবেত হইত, তখন গ্রামস্থ যুবতীদিগের, বিশেষত যুবতী বিধবাদিগের চরিত্র সমালোচনার্থ বিশেষ উৎসাহের সহিত একবার এজলাস করিয়া বসিতে। এইরূপ শুইয়া শুইয়া সময়াতিপাত করিতে করিতে ছিদামের স্ত্রী ক্রমেই স্থূলকায় হইতে লাগিলেন। তখন তাহার সেই বাল্যকালের স্ফীত গণ্ডদ্বয় চক্ষু-কর্ণকে একেবারে আবৃত করিয়া চক্ষু-কর্ণের প্রাচীরস্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ডাক্তারগণ বলেন স্ত্রীলোক আলস্য পরতন্ত্র হইয়া স্থূলকায় হইয়া পড়িলে তাহাদের আর সন্তান হয় না। বোধ হয় ছিদামের স্ত্রীরও সেই জন্যই আর সন্তান হইল না।

ছিদামের কন্যা হেমলতার দশবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বেই জগন্নাথ এবং ছিদাম মনে মনে স্থির করিলেন যে কুলীন কায়স্থের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ববাদিসম্মত রেজিস্টারীকৃত কায়স্থ হইবেন; আর কেহ কখনো তাহাদিগকে শূদ্র বলিতে পারিবে না। কায়স্থের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র— এই চারি শ্রেণীস্থ কায়স্থই প্রধান কুলীন। সুতরাং যত টাকাই ব্যয় হউক না কেন এই চারি ঘরের মধ্যে এক ঘরে কন্যা দান করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রামসুন্দর দাস তৎকালে গ্রামের প্রধান ঘটক ছিলেন। তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ছিদাম হেমলতার সম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। রামসুন্দর প্রথমত গ্রামের প্রধান কুলীন

শ্যামাকান্ত ঘোষের পুত্রের সঙ্গে ছিদামের কন্যার বিবাহের প্রস্তাবকরিবামাত্র ঘোষজা মহাশয় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘটককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয় আমি কি এখন কুলমর্যাদা বিক্রয় করিব নাকি? দত্তদের সঙ্গে ভিন্ন আমার সাত পুরুষের মধ্যেও কেহ অকুলীনের সঙ্গে কার্য করে নাই। একলক্ষ টাকা দিলেও ছিদাম বিশ্বাসের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে যাইব না। ছিদাম বিশ্বাসের টাকা আছে। কিন্তু টাকাতে কুলমান হয় না। টাকা হইলেই লোক কুলীন হইতে পারে না। শুনিয়াছি ছিদাম বিশ্বাস সদ্‌গোপের ছেলে।'

রামসুন্দর ঘটক বলিলেন, 'মশাই আপনি জানেন না। ছিদাম বিশ্বাস মৌলিক বটে, কিন্তু ভাল কায়েতের সন্তান। তাঁহার প্রপিতামহ অনুপনারায়ণ বিশ্বাস এদেশে একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাহার দশটা কুলক্রিয়াও ছিল। নবাবের দরবারে সম্মান ছিল। তিনি অনেকানেক সৎকার্য করিয়াছেন। অনুপনারায়ণ বিশ্বাসের মৃত্যুকালে ছিদামের পিতামহ নাবালক ছিলেন, তাই জমিদারী এবং তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত হইল। সুতরাং ইহারা একেবারে গরিব হইয়া পড়িলেন। এখন আবার ছিদাম বিশ্বাস অনেক সম্পত্তি করিয়াছেন। আজকাল তিনি আমাদের দেশের রাজা। বাঙ্গালা পার্শ্বি দুই এলেমেই উপযুক্ত। ছিদামবাবু মৌলিক হইলেও তিনি বনিয়াদি ঘরের লোক। এ সম্বন্ধের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। হঠাৎ জবাব দিবেন না।'

ছিদাম কি জগন্নাথ জন্মাবচ্ছিনে তাহাদের প্রপিতামহের নাম শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রামসুন্দর ঘটক আজ ছিদামের প্রপিতামহের নাম-ধাম প্রকাশ করিয়া এক নূতন আবিষ্কার করিলেন।

রামসুন্দরের কথার প্রত্যুত্তরে শ্যামাকান্ত ঘোষ বলিলেন, 'না মহাশয়! আমরা একটি পুত্র। আমি টাকার লোভে ছিদাম বিশ্বাসের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিব না। ছিদাম বিশ্বাসের মেয়ের সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দিতে গেলে আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই আমার বাড়িতে আসিবে না।'

রামসুন্দর ঘটক নিরাশ হইয়া অন্য এক গ্রামে লক্ষ্মীকান্ত মিত্রের বাড়ি চলিয়া গেলেন। মিত্রজা মহাশয়ের একটু গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল। সুতরাং তাঁহার মেজাজ কিছু কড়া ছিল। রামসুন্দর ঘটক তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্রের সঙ্গে ছিদামের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিবামাত্র, তিনি অষ্টমে চড়িয়া বলিলেন, 'শালা ঘটক, তুই আমাকে সদ্‌গোপের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে বলিতেছিস? শালা আমার বাড়ি হইতে এখনি চলে যা!'

এই বলিয়া ঘটককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। রামসুন্দর আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই গ্রাম হইতে নিজের বাড়ি প্রত্যাবর্তনকালে পথে কৃষ্ণমোহন দত্তের সঙ্গে রামসুন্দরের সাক্ষাৎ হইল। কৃষ্ণমোহন দত্ত একজন প্রধান তালুকদার। কিন্তু তাহার তালুকের অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে। নবাবের চাক্‌লার প্যাদা আসিয়া দিন দিন ইহার বাড়িতে ধূম-ধাম

করে। শত বৎসর পূর্বে সূর্যাস্তের আইন প্রচলিত ছিল না। তালুকে খাজনা বাকি পড়িলে নবাবের চাক্‌লার প্যাদা আসিয়া তালুকদারদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কৃষ্ণমোহন দত্ত নিজের বাড়ি ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র সহ পলাইয়া অন্য একগ্রামে বাস করিতেছেন।

তিনি রামসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘটক মহাশয় কোথায় গিয়াছিলেন?'

রামসুন্দর বলিনে, 'ভাই ছিদাম বিশ্বাসের কন্যার সম্বন্ধ নিয়া বড় ব্যস্ত আছি। একটি কুলীনের ঘরের ছেলে তল্লাশ করিতেছি।'

কৃষ্ণমোহন বলিলেন 'আমার ছেলের সঙ্গে ছিদাম বিশ্বাসের কন্যার সম্বন্ধ স্থির করুন না! ছিদাম বিশ্বাস যদি দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয় তবে আমি তাহার সঙ্গে কুটুম্বিতা করিব।'

ঘটক বলিলেন, 'তাহারা মৌলিকের সঙ্গে ক্রিয়া করিবে না, তাহারা কুলীনের ঘরের ছেলে চায়।'

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, 'আমার সঙ্গে ক্রিয়া করিলে দেশের সমুদয় কুলীনই সে পাইতে পারিবে। দেশের সমুদয় কুলীনের সঙ্গে আমার কুটুম্বিতা রহিয়াছে। এই সকল কুলক্রিয়া করিয়াই তো আমি শেষ হইয়াছি। আট হাজার টাকা তালুকের খাজনা বাকি পড়িয়াছে। নবাব কোম্পানি বাহাদুরের টাকা দিতে পারে না। খাজনা আদায়ের নিমিত্ত আজ-কাল জমিদার তালুকদারের উপর ভারি অত্যাচার হইতেছে। আপনি ছিদাম বিশ্বাসকে বুঝাইয়া বলিবেন যে আমার সঙ্গে ক্রিয়া করিলে দেশের সমুদয় কুলীন তাহার বাড়িতে বিবাহে যাইবে। তাহার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিবে।'

রামসুন্দর বলিলেন, 'আচ্ছা ছিদাম বিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় পরে বলিব।'

রামসুন্দর ঘটক দুই-তিনমাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলাস্থ কুলীন কায়স্থদিগের বাড়ি যাইয়া ছিদামের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে সকল কুলীনের কিছু অর্থ-সম্পত্তি আছে তাহারা কেহস ছিদামের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে স্বীকার করিল না। মৌলিকদিগের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পাত্র মিলিয়াছিল, কিন্তু জগন্নাথ এবং ছিদাম একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, 'যত টাকা লাগে দিব, প্রধান কুলীনের ঘরের ছেলে আনতে হইবে।'

রামসুন্দর বলিলেন, 'এদেশের কুলীনেরা আমার কথায় বিশ্বাস করে না। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে আপনাদের প্রপিতামহ অনুপনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয় এদেশের একজন প্রধান তালুকদার ছিলেন। নবাবের দরবারে তাঁহার বিলক্ষণ সম্মান ছিল। তিনি দশটা কুলক্রিয়া করিয়াছেন। কিন্তু লোকে বলে 'ও ঘটকের চাতুরী'।

জগন্নাথ এবং ছিদাম ঘটকের এইকথা শুনিয়া বলিলেন, হাঁ তাই তো অনুপনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ই আমাদের প্রপিতামহ ছিলেন। ঘটক মহাশয় ইহা জানেন কেমন করে!'

ঘটক বলিলেন, 'সকলের পূর্বপুরুষের নামই আমার খাতায় লেখা আছে। এ দেশে

এমন ভদ্রলোক নাই যাহার পূর্বপুরুষের নাম আমি জানি না। তবে ছোটলোকের বাপ-দাদার নাম কেই বা জানিতে চেষ্টা করে!'

জগন্নাথ এবং ছিদাম আজ প্রপিতামহের নাম ঠিক করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পিতামহের নাম কী ছিল তাহা জানেন না। লজ্জায় আর ঘটকের নিকট পিতা এবং পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন না। মনে ভাবিলেন সুযোগমতে ঘটকের মুখ হইতে সে দুইটি নামও বাহির হইয়া পড়িবে।

রামসুন্দর ঘটক আবার বলিলেন, 'মশাই এ দেশের কুলীনেরা তো কুটম্বিতা করিতে চাহে না, তাহারা বলে ছিদাম বিশ্বাস সদগোপ। তবে আপনাদের ইচ্ছা হইলে, হয় কৃষ্ণমোহন দত্তের পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করুন, আর না হয় আমাকে খরচ-পত্র দিয়া যশোহর কিম্বা বাখরগঞ্জে পাঠাইয়া দিন। পূর্বাঞ্চলে অনেক কুলীন আছে। তাহারা এ দেশের কুলীন অপেক্ষাও অনেক বড় কুলীন।'

ছিদাম তখন রামসুন্দরকে খরচপত্র দিয়া পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। রামসুন্দর যশোহরের অন্তর্গত চাঁচ্‌ড়াগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে একটি উচ্চ কুলীনের সন্তানও মিলিল।

পাঁচকড়ি মিত্র নামে একজন প্রধান কুলীনের সন্তান বাখরগঞ্জের অন্তর্গত রায়েরকাঠী গ্রামে বাস করিতেন। উপন্যাসের লিখিত এই ঘটনার প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে পাঁচকড়ি মিত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী তিন বৎসর বয়স্ক স্বীয় তনয় সুবলচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে করিয়া যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়া গ্রামে স্বীয় মিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সুবলের পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছিল। এখন তাহার বাইশ তেইশ বৎসর বয়স হইয়াছে। সে চাঁচড়া গ্রামেই আপন মাতুলালয়ে বাস করিতেছে।

রামসুন্দর ঘটক এই সুবল মিত্রের সঙ্গে ছিদামের কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সুবলের চরিত্র একেবারেই যে মন্দ ছিল তাহা বলা যাইতে পারে না। শত বৎসর পূর্বে কন্যা বিবাহ দিবার সময় বরের চরিত্র ভাল-কি-মন্দ সে বিষয়ে ভ্রমেও কেহ অনুসন্ধান করিত না। বর কুলীনের সন্তান কি না তাহাই দেখিতেন। এই বর্তমান সময়েও চরিত্রের প্রতি কেহ বড় অনুসন্ধান করেন না, ছেলেটি বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়াছে কি না তাহাই দেখেন।

সুবলের চরিত্র মন্দ ছিল না। তবে সে একটু গাঁজা খাইত, এবং মন্দ লোকের সংসর্গে ছিল বলিয়া অল্প বয়সেই তাহার লাম্পট্য-দোষ জন্মিয়াছিল। সুবল সর্বদা মদ খাইত না। তবে যদি কখনো কখনো খাইয়া থাকে, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি সে নিজের পয়সা ব্যয় করিয়া কখনো মদ খায় নাই। অন্যান্য লোকের সঙ্গে দু-একদিন খাইয়া থাকিবে। তখন এদেশে সুরাপান নিবারণী সভা ছিল না। সুবল সুরা স্পর্শ করিবে না বলিয়া কখনো কোনো প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে নাই। সুতরাং যদি দুই-একদিন কোথাও সুরাপান করিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহাকে আমরা বিশেষ অপরাধী বলিয়া মনে করিতে পারি না। সুবল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু ছাপার অক্ষর বড়

পাঠ করিতে পারিত না। তখন এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। ছাপার পুস্তক বড় দেখিতেও পাওয়া যাইতে না।

রামসুন্দর ঘটক সুবল মিত্রের সঙ্গে ছিদাম বিশ্বাসের কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ছিদাম ঘটকের প্রমুখাৎ এইরূপ অভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। ঘটককে পাঁচশত টাকা মূল্যের স্বর্ণমোহর এবং দুইশত টাকা মূল্যের একজোড়া কাশ্মীরি শাল পুরস্কার প্রদান করিলেন। আর বিবাহের পর ঘটক মহাশয়ের বিষয় বিবেচনা বলিয়া অস্বীকার করিলেন।

অতিশয় সমারোহের সহিত ছিদাম, সুবল মিত্রকে যশোহর হইতে নৌকাপথে মুর্শিদাবাদে আনাইলেন। বিবাহের দিন ইতিপূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল। কন্যার বিবাহে ছিদাম অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। ভট্টাচার্য পণ্ডিত সকলেরই কিছু কিছু লাভ হইল। পাড়ার নাপ্তানি এবং শ্যামার মা বাড়ি বাড়ি বলিতে লাগিল যে দশ লক্ষ টাকার ফর্দ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু রূপার মা বলিত যে কেবল মাত্র পনর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বিষয়ে ইহাদের মধ্যে যাবজ্জীবন এইরূপ মতভেদ রহিয়া গেল।

ছিদামের আর পুত্রসন্তান নাই। ভবিষ্যতে তাহার জামাতাই তাহার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবেন। সুতরাং জামাতা যাহাতে সর্বপ্রকার বিষয়কার্য বুঝিতে পারেন, যাহতে তাহার শাস্ত্রে জ্ঞান হয়, সে বিষয় ছিদাম বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে লাগিলেন। নিকটে দুইটি টোল ছিল। রামদাস শিরোমণির এক টোল এবং হরিদাস তর্কপঞ্চাননের দ্বিতীয় টোল। ছিদাম নিজে শিরোমণি এবং তর্কপঞ্চাননের বাড়ি যাইয়া তাহার জামাতাকে টোলে শাস্ত্র পড়াইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো জাতির শাস্ত্রাধ্যয়নের অধিকার নাই; অন্য কোনো জাতিকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে শাস্ত্রানুসারে পতিত হইতে হয়।

ছিদামের যে হিন্দুশাস্ত্রে বড় অনুরাগ ছিল এবং তজ্জন্যই জামাতাকে টোলে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা নহে। ছিদাম জানিতেন যে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিলে ভদ্রসমাজে লোকের সম্মান হয় না। সভার মধ্যে যাহারা দুই-একটা সংস্কৃত বচন মুখস্থ পড়িতে পরিতেন তাহারাই এইসময় ভদ্রসভাতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। লোকে তাহাদিগকে প্রশংসা করিত। সুতরাং এইজন্য ছিদাম জামাতাকে টোলে পাঠাইবার নিমিত্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষত ছিদাম নিজে যখন কোনো ভদ্র সভায় যাইতেন, তখন মনে মনে সময়ে সময়ে বড় কষ্টানুভব করিতেন। সভাস্থলে তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। একটা সংস্কৃত শ্লোকও তিনি মুখস্থ পড়িতে পারিতেন না। ছিদামের অর্থ-সম্পত্তির কোনো অভাব নাই। কিন্তু ভদ্র সমাজে কেহ তাহাকে সমাদর করে না। সভার মধ্যে তাহার কথা বলিবার সাধ্য নাই। এইদুঃখে তিনি প্রায়ই কোনো সভাস্থলে উপস্থিত হইতেন না।

ছিদাম লেখা-পড়া কিছুই জানিতেন না। অতিকষ্টে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছিলেন। সেও সৌভাগ্যক্রমে নামটি ছিদাম ছিল বলিয়াই এত সহজে নাম দস্তখত করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয় কিংবা গঙ্গাগোবিন্দ হইলে (ঞ্জ) কিম্বা (ঙ্গ) লিখিতে মহাবিপদ উপস্থিত হইত। কিন্তু যাহার টাকা থাকে সে মূর্খ হইলেও কেহ তাঁহাকে মূর্খ বলে না। গ্রামের ছোটলোকেরা বলিত, 'ছিদাম বিশ্বাসের বাঙ্গালা, পার্সি, নাগরী-তিনটা কলম চলে।' আর একবৎসর রামসুন্দর ঘটক অনেকানেক লোকের নিকট বলিয়াছেন যে বিশ্বাসের বাঙ্গালা এবং পার্সি দুই এলেমই বিলক্ষণ অধিকার আছে; তাহার পার্সি জবান বড় দুরস্ত। ঠিক মৌলবীদিগের ন্যায় পড়িতে পারে।

তর্কপঞ্চানন এবং শিরোমণি ঠাকুর ছিদামের জামাতাকে টোলে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতে অসম্মত হইলেও ছিদাম একেবারে তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। ছিদাম বোল্টস সাহেবের গোমস্তা। কার্য-কর্মের কৌশল বিলক্ষণ জানেন। তিনি গোপনে হরিদাস তর্কপঞ্চাননকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মশাই আপনাকে মাস মাস দুইশত করিয়া টাকা দিব, আপনি গোপনে আমার জামাতাকে সংস্কৃত পাড়াইতে আরম্ভ করুন।' হরিদাস তর্কপঞ্চানন মহাশয় এত টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সুবলকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

ছিদাম যখন জামাতাকে সময় সময় জিজ্ঞাসা করিতেন বাবা এখন কী পড়িতেছ। সুবল মিত্র প্রায়ই বলিতেন, 'আজ্ঞে মুগ্ধরস ব্যাকরণ পড়িতেছি।' পাছে জামাতা মনে করেন যে তিনি সংস্কৃত জানেন না, এই জন্য ছিদাম বলিতেন, 'হাঁ মনোযোগপূর্বক পড়াশুনা কর, মুগ্ধরস ব্যাকরণ পাঠ করিলে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের দেবার্চনা প্রভৃতির সকল কথাই জানিতে পারিবে, তোমার শাস্ত্র জ্ঞান হইবে।

ছিদাম বিশ্বাস কাসিমবাজারের কুঠি হইতে প্রত্যহ রাত্র নয় ঘটিকার সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাঁহার পাল্কীবেহারাগণ রাত্র নয়টার সময় পাল্কী লইয়া কুঠিতে উপস্থিত হইত। কিন্তু ছিদামের কন্যার বিবাহের চারি-পাঁচ মাস পরে একদিন রাত্র সাতটার সময়ই ছিদামের অফিসের কাজ-কর্ম সমাপ্ত হইল। তিনি পাল্কীর নিমিত্ত আর বিলম্ব করিলেন না। একজন লোক সঙ্গে করিয়া পদব্রজেই বাড়ি চলিলেন। কাসিমবাজার হইতে অর্ধ ক্রোশ পথ চলিয়া আসিলে পর বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া রাস্তার দুইপার্শ্ব হইতে দুইজন লোক আসিয়া ছিদামের পৃষ্ঠে ও মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। ছিদাম তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গের লোকটি দৌড়াইয়া কাসিমবাজারের কুঠিতে গিয়া খবর দিল, এবং কুঠি হইতে পাঁচ সাতজন হিন্দুস্থানী লোক সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রাস্তার উপর ছিদামের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, আর অন্য লোকজন সেখানে নাই। সকলেই সন্দেহ করিল যে, হলধর তাঁতি ছিদামকে খুন করিয়াছে। ইহার কিছুকাল পূর্বে ছিদাম বোল্টস সাহেবের দাদনের টাকার নিমিত্ত হলধরের বাড়ি লুট করিয়াছিল, হলধরের কন্যা ও স্ত্রীকে যারপরনাই অপমান করিয়াছিল। কাসিমবাজারের কুঠি হইতে হলধর তাঁতির অনুসন্ধানে

দলে দলে প্যাদা ছুটিতে লাগিল। কোথাও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। কিন্তু ছিদামের মৃত্যুর পরদিন গঙ্গার মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোকের এবং একটি পুরুষের শব ভাসিতেছিল। সেই পুরুষের শব দেখিয়া অনেকেই বলিল যে, এই হলধর তাঁতির মৃতদেহ।

হলধরের গৃহ লুট করিবার সময় ছিদাম তাহাকে বলিয়াছিল যে, আমাকে তিনশত টাকা না দিলে তোর কেবল বাড়ি লুট করিয়া ছাড়িব না, তোর পরিবারদিগকে অপমান করিব। হলধর তখন তিনশত টাকা দিতে পারিল না। সুতরাং ছিদাম হলধরের নিরপরাধিনী স্ত্রী ও কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া * * ** ইত্যাদি লোমহর্ষণ ব্যাপার আরম্ভ করিল।

যখন এই দুইটি অনাথা নিরপরাধিনী রমণীর উপর এইরূপ নৃশংস, ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন তাহারা শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল। ঊর্ধ্বক্ষেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'পরমেশ্বর তুমি কি এ সংসারে নাই। আমরা কোম্পানির নিকট কোন অপরাধ করি নাই। ইহার বিচার তুমিই করিবে।'

হলধরের হস্ত-পদ তখন বান্ধিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে সেই সময়ই ছিদামের শিরচ্ছেদ করিত। কিন্তু তাহার আর এখন নড়িবার সাধ্য নাই, তিনজন সিপাহী তাহার পৃষ্ঠের উপর বসিয়া আছে।

পাঠক! ১৭৫৭ খ্রিঃ অব্দের পর ছিদামের ন্যায় যে সকল নিষ্ঠুর নরপিশাচ ইংরাজ বণিকদিগের রেসমের কুঠিতে এবং লবণের গোলায় কার্য করিত, আজ তাহাদের পৌত্র-প্রাপৌত্রগণ মধ্যে অনেকেই বঙ্গের অভিজাত (aristocracy) বলিয়া পরিগণিত। এসঅভিজাতদিগকে একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বঙ্গের শিল্পী, বঙ্গের কৃষক, বঙ্গের বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং সর্বপ্রকার শ্রমোপজীবীদিগের শোণিত ইহাদের শরীর পরিপোষণ করিতেছে সেই সকল নিরপরাধী লোকের বিনাশের উপর ইহাদের অভিজাতীয় গৌরবের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ আপনারা গোল্ডস্মিথের এই কথাটি স্মরণ করিবেন;—

Princes and lords may flourish, or my fade,
A breath can make them, as a breath has made
But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can ne'er be *supplied.*

তের

প্রেমানন্দ বাবাজী এবং ভক্তানন্দ বৈরাগী

ছিদামের মৃত্যুর পর জগন্নাথ বিশ্বাস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যাদবেন্দ্রবাবু ছিদামের তালুক ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই যাদবেন্দ্রবাবু মহারাজা যাদবেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

সুবল মিত্র ছিদামের পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ছিদামের স্ত্রী পূর্বেও কোনো গৃহকর্ম করিতেন না, এখন তিনি স্বামীর শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর তাঁহাকে কে সাহস করিয়া গৃহকার্য করিতে বলিতে পারে। বিশেষতঃ ছিদামের নগদ টাকা প্রায় সমুদয়ই তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। ছিদাম নগদ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ টাকা দাদনের উপর আছে। সেই সকল টাকার তমসুক স্ত্রীর নামে লইয়াছিলেন। কিন্তু তমসুকগুলি সমুদয়ই জগন্নাথের নিকট রহিয়াছে। জগন্নাথ তাঁর স্ত্রী আহ্লাদীকে সর্বদাই ছিদামের স্ত্রীর পরিচর্যা করিতে বলিতেন। আহ্লাদী নিতান্ত শান্ত এবং নিরীহ ছিল। কোনোদিন তাহার মুখে কেহ একটি উচ্চকথাও শুনে নাই। বেচারী প্রাণপণে ছিদামের স্ত্রীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল। এখন আর তাহার বড় গৃহকার্য করিতে হইত না। তাহার পুত্র যাদবেন্দ্রবাবু ঘরের কর্তা। দাসদাসীগণ এখন তাহার বড় বাধ্য হইল। আবার তাহার পুত্রবধূ এবং কন্যাগণ এখন বড় হইয়াছেন। তাহারাই গৃহ কার্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। আহ্লাদী ছিদামের স্ত্রীকে স্নান করাইতেন, তাঁহার হবিষ্যের আয়োজন করিয়া দিতেন, কখনো কখনো তাঁহার হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়াও দিতেন। ছিদামের স্ত্রী স্বামীর শোকে প্রায়ই শয্যাগত থাকিতেন। তবে অপরাহ্ণে পাড়ার শ্যামার মা, জগার মা, চাঁপী প্রভৃতি রমণীগণ একত্রিত হইলে তখন সহস্যমুখে যুবতী বিধবাদিগের এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

ছিদামের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই গ্রামের মধ্যে ছিদামের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে লোকে কাণা-কাণি করিত। ছিদামের মৃত্যুর পর এই সকল কুৎসিত কথা সর্বত্রই প্রচার হইতে লাগিল।

ছিদামের জামাতা সুবল মিত্র ছিদামের মৃত্যুর পর আর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিত না। সে প্রত্যহই শাশুড়ীর নিকট হইতে দশ-বার টাকা নিয়া পরম সুখে মদ গাঁদা খাইতে আরম্ভ করিল। গ্রামের আর চারি পাঁচ জন আসিয়া তাহার ইয়ার জুটিল।

ছিদামের কন্যা হেমলতার বয়স এই সময়ে প্রায় এগার বৎসর হইয়াছে। সুবল মিত্রের

বয়ঃক্রম প্রায় চব্বিশ বৎসর ছিল। সে কখনো কখনো মদ খাইয়া আসিয়া হেমলতাকে প্রহার করিত। হেমলতা প্রাহারের ভয়ে আপন স্বামীর নিকট বড় একটা যাইতেন না। রাত্রে আপন জেঠাইমা জগন্নাথের স্ত্রীর সঙ্গেই শুইয়া থাকিতেন। জগন্নাথের স্ত্রীকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। জগন্নাথের স্ত্রী আপন কন্যা অপেক্ষাও ছিদামের কন্যা হেমলতাকে সস্নেহে প্রতিপালন করিতেন।

একদিন হেমলতার কী দুর্বুদ্ধি হইল। তিনি ইতিপূর্বে সুবলকে দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া স্তানান্তরে যাইতেন। কিন্তু আজ নিঃশঙ্কহৃদয়ে সুবলের নিকট যাইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সক্রোধে সুবলকে বলিয়া উঠিলেন, 'আজই তোর মৃত্যু হউক, আমি চিরবিধবা হইয়া থাকিব।'

হিন্দু রমণীগণ স্বামীকে এইরূপ দুর্বাক্য কখনো বলেন না। বিশেতেঃ হেমলতা অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির মেয়ে। কী জন্য যে হেমলতা এইরূপ কোপাবিষ্ট হইলেন, কেহই জানে না। ইহার তিন-চারিদিন পূর্ব হইতে তিনি তাঁহার জননীর গৃহে আর প্রবেশ করিতেন না, জননীর সঙ্গে কথাও বলিতেন না। সুবল মিত্র অন্যান্য দিন হেমলতাকে প্রহার করিত, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে কি পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হইল যে, হেমলতার ভর্ৎসনা শুনিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। অপরাহ্ণে হেমলতা এইরূপে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিলেন। রাতের আর আহার করিলেন না। শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি পূর্বে প্রত্যহ জগন্নাথের স্ত্রীর সঙ্গে শুইয়া থাকিতেন। কিন্তু আজ নিজের শয্যায় আসিয়া শুইয়া রহিলেন। জগন্নাথের স্ত্রী মনে ভাবিলেন যে, বোধহয় আজ স্বামীর শয্যায়ই শয়ন করিবে। এইজন্য ডাকিয়া আনিয়া নিজের কাছে আর শোয়াইলেন না। কিন্তু কী আশ্চর্য! পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময়ও হেমলতার শয়নপ্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। ক্রমে তিনবার জগন্নাথ বিশ্বাসের স্ত্রী হেমতলাকে দ্বার খুলিবার নিমিত্ত ডাকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একবারও তাহারকোন প্রত্যুত্তর পান নাই। চতুর্থবার আসিয়া দ্বারা ধরিয়া ঠেলিতে লাগিলেন, কোন প্রত্যুত্তর নাই। তখন তাঁহার মনে নানা আশঙ্কা হইতে লাগিল। গতকল্য অপরাহ্ণে হেমলতা আহার করেন নাই। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়াছিলেন। সুতরাং জগন্নাথের স্ত্রী স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদবেন্দ্রকে এই সকল কথা বলিলেন। তিনি কপাটের খিল ভাঙ্গিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। কী ভয়ানক দৃশ্য! কী ভীষণ ব্যাপার! হেমলতার মৃতদেহ গৃহমধ্যে ঝুলিতেছে! নির্মলহৃদয়া বালিকা হেমলতা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভদ্রলোকের গৃহের রমণী এইরূপ আত্মহত্যা করিলে, আত্মীয়-স্বজন প্রাণান্তে তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা অতিসারে হেমলতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং অতি সত্বর সত্বর হেমলতার মৃতদেহ দাহ করিলেন।

কিন্তু এই সকল কথা কখনো অপ্রকাশ থাকে না। হেম তার আত্মহত্যার কথা গ্রামের মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ছিদামের স্ত্রীর নামে নানা অপবাদ রটনা

হইতে লাগিল। সুবল মিত্র তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরও শ্বশুরবাড়িতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বিশ্বাস তাহাকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর অলঙ্কারের মূল্য স্বরূপ নগদ পঁচিশ হাজারটাকা দিয়া স্বীয় বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই স্থানান্তরে যাইতে সম্মত হইল না। আবার জগন্নাথের পুত্র যাদবেন্দ্রবাবু সুবল মিত্রকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেই ছিদামের স্ত্রী কন্যার শোকে কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন। সুবল মিত্রকে কেহ কিছু বলিলেই তাঁহার কন্যার শোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

জগন্নাথ এবং যাদবেন্দ্র একদিন গোপনে সুবলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তুমি স্থানান্তরে চলিয়া না গেলে তোমাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিব। কিন্তু সুবলের জন্মস্থান বাখরগঞ্জ, যশোহরের পাঠশালায় তাহার বিদ্যাশিক্ষা, সে সামান্য পাত্র নহে। সে জগন্নাথ এবং যাদবেন্দ্রকে বলিল, ‘তোমরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই বাড়ি হইতে চলিয়া যাও। এই সমূদয় সম্পত্তিই আমার শ্বশুরের স্বোপার্জিত। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার কন্যাকে দান করিয়া গিয়াছেন। সে মানপত্র আমার বাক্সে আছে, আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সকল সম্পত্তি আমার ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? আমি কি আর শাস্ত্র জানি না?

জগন্নাথ সুবলের কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। আর কখনো সুবলকে স্থানান্তরে যাইতে বলিতেন না। কিছু দিন এইভাবেই চলিল। সুবল মিত্র বাখরগঞ্জের লোক, যশোহর তাঁর মাতুলালয়, সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এক জাল দানপত্র প্রস্তুত করাইয়া আনিতে পারিত। কিন্তু সে মনে করিল যে একবার এ বাড়ি ছাড়িয়া গেলে আর তাহার প্রবেশাধিকার থাকিবে না। সুতরাং দান পত্র আর সংগহ করিতে পারিল না।

এদিকে ছিদামের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। জগন্নাথ বিশ্বাস ভাবিতে লাগিলেন যে হয়তো আমাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে।

গ্রামের মধ্যে যে এই সকল কুৎসা রটনা হইতেছে, তাহা ছিদামের স্ত্রী বড় বিশ্বাস করিতেন না। ছিদামের স্ত্রী কেবল গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় ভিন্ন আর কখন বাড়ির বাহির হইতেন না। কিন্তু গঙ্গার ঘাটেও পাল্কী আরোহণে যাইতেন, সুতরাং গ্রামের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কে কী কথা বলে তাহা জানিবার কোনো সুযোগ নাই। পাড়ার শ্যামার মা, জগার মা, রূপার মা, নাপ্তানি প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক সর্বদা তাঁহার নিকট আসিত তাহারা সকলেই তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষিনী ছিল। তিনি তাহাদের কাহাকেও একখানি বস্ত্র দিতেন, কহাকেও দুই-চারিটা পয়সা দিতেন, একদিনও তাহারা কেহ তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত না, সুতরাং সকলেই সাক্ষাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিত।

তাহাদের মধ্যের কেহ বলিত, ‘ছোট ঠাকুরানী, আপনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা, আপনি আছেন বলিয়া এদেশের আমরা দশজন গরিব বাঁচিয়া আছি।’ কেহ বলিত, ‘দেশশুদ্ধ লোকে আপনাকে ধন্য ধন্য করে। এদেশে আপনার ন্যায় সতী-সাধ্বী পুণ্যবতী আর কয়জন

আছে।' নাপ্তানি বলিত, 'আজ্ঞে কত বিধবার কত অখ্যাতি শুনিতে পাই, কিন্তু আপনি বিধবা হইবার পর চন্দ্র-সূর্যও আপনার মুখ দেখিতে পায় না।'

ইহাদের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া ছিদামের স্ত্রী প্রায়ই বলিতেন, 'এখন এ সংসারে এক ধর্ম-কর্ম ভিন্ন আমার আর কী আছে। স্বামীর মৃত্যু হইল, তারপর সন্তানের মধ্যে একটা মেয়ে ছিল, সেও চলিয়া গেল। এখন আমার ঠাকুরের চরণই একমাত্র গতি।'

এ সংসারে আত্মাভিমানী কুচরিত্র স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই অত্যন্ত নির্বোধ দেখা যায়। ছিদামের স্ত্রী ইহাদের কথা শুনিয়া সত্য সত্যই মনে করিতেন যে, দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাকে সাধ্বী-সতী পুণ্যবতী বলিয়া মনে করে।

পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া দিন দিন ছিদামের স্ত্রীকে চণ্ডীপাঠ করিয়া শুনাইত। পূর্বে এ দেশীয় স্ত্রীলোকগণ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ একটি ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পুরোহিত অধিক অর্থ লাভাশায় তাড়াতাড়ি চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত করিয়া সর্বদাই ছিদামের স্ত্রীর প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, 'মা লক্ষ্মী ! আপনার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে দিন দরিদ্রেরও অন্ন মিলে।'

চণ্ডীপাঠকালে ছিদামের স্ত্রী অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতেন। চণ্ডীর এক কথাও তিনি বুঝিতেন না, আর সে সকল কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশও করিত না। কিন্তু পুরোহিতের প্রশংসাবাক্য তাঁহার কর্ণে অবিশ্রান্ত সুধা বর্ষণ করিত।

ছিদামের মৃত্যুর পর প্রায় সাত-আটমাস এইরূপে গত হইল। তৎপর এক দিন জগন্নাথ বিশ্বাসের স্ত্রী তাঁহার স্বামীর নিকট চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, 'তোমার ভ্রাতৃবধূর অবস্থা বড় ভাল নয়, ইহার যা হয় একটা উপায় শীঘ্র কর, নতুবা জাতি মান সকলই যাইবে।'

জগন্নাথ বলিলেন, ইহার কোনো উপায়ই আমি দেখি না।' কিন্তু জগন্নাথের অপেক্ষা তাহার স্ত্রীর বুদ্ধি কিছু প্রখর ছিল। তিনি বলিলেন, 'গুরুঠাকুরকে অনাইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন কিম্বা কাশীধমে পাঠাইয়া না দিলে একেবারে সর্বনাশ হইবে। লোকের নিকট আর মুখ দেখাইতে পারিব না। গ্রামের মধ্যে এই সকল অপবাদের কথা সকলের মুখে শুনা যাইতেছে।'

জগন্নাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ঘরের এ সকল গোপনীয় কথা বাহির করে কে?' তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'এ সকল কথা কখনো অপ্রকাশ থাকে না। বিশেষত শ্যামার মা, রূপার মা, নাপ্তানি, জেলেনি ইহারা প্রত্যহই আমাদের বাড়িতে আসিতেছে। তোমার ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে আসিয়া নানা কথা বলে; সাক্ষাতে তাহাকে প্রশংসা করে; কিন্তু আবার ইহারাই বাড়ি বাড়ি যাইয়া অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে, এক বাড়ির লোকের কথা অন্য বাড়ির লোকের নিকট বলে।'

শতবৎসর পূর্বে এ দেশে বঙ্গবাসী বা দৈনিক প্রভৃতি বাঙ্গালা কোনো সংবাদ পত্র ছিল না। কিন্তু এইসকল সংবাদ-পত্র না থাকিলেও গ্রাম্য লোকেরা স্থানীয় সংবাদ যে একেবারেই

জানিতে পারে নাই তাহা আমরা স্বীকার করি না। তখন গ্রামের রামার মা, শ্যামার মা, জেলেনি, নাপ্তানি প্রভৃতি দেশহিতৈষিণীগণ মুখে মুখে স্থানীয় সংবাদ গ্রামের বাড়ি বাড়ি প্রচার করিয়া বঙ্গবাসী এবং দৈনিকের অভাব মোচন করিত।

স্ত্রীর মুখে জগন্নাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। জগন্নাথ ছোট শূদ্র ছিলেন। এখন পর্যন্ত দশ বৎসরও হয় নাই যে কায়স্থ হইয়াছেন। কিরূপে ভদ্রসমাজের মধ্যে একটু সম্মান লাভ করিবেন, কিরূপে দশজন কুলীন কায়স্থের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইয়া একত্রে আহার-ব্যবহার করিবেন, তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান ছিল। গ্রামের অন্যান্য ছোট শূদ্রের দল তাহাকে হঠাৎ কায়স্থ দলভুক্ত হইতে দেখিয়া সর্বদাই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিত। সুতরাং তাহার ঘরের কোনো অপবাদ শুনিতে পাইলে সেই সকল লোক বিশেষ আনন্দের সহিত তাহা সর্বত্র ঘোষণা করিবে। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে আর জগন্নাথের নিদ্রা হইল না।

তিনি প্রাতে উঠিয়াই স্বীয় গুরুঠাকুরকে আনাইবার নিমিত্ত কাটোয়ায় লোক প্রেরণ করিলেন। কাটোয়ায় প্রেমানন্দ বাবাজী তাঁহার গুরু ছিলেন। এদিকে ছিদামের স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা তুমি এখন তীর্থ-ধর্মে মননিবেশ কর, শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ধর্মকর্ম কর। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইবে।'

ছিদামের স্ত্রী এই সকল ঐশ্বর্য ও অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিতে সম্মত হইলেন না। পরে জগন্নাথের পুত্র যাদবেন্দ্রবাবু তাহাকে অত্যন্ত ধমকাইতে লাগিলেন, বলপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন। তখন ছিদামের স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা শ্রীবৃন্দাবন যাইতে সম্মত হইলেন। গ্রামের মধ্যে অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রচার হইল যে, ছিদাম বিশ্বাসের বিধবা রমণী সংসার এবং ঐশ্বর্য পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিবেন।

পাড়ার শ্যামার মা, জগার মা, রূপার মা, নাপ্তানি প্রভৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিতে লাগিল, 'আহা মা লক্ষ্মী, তুমি দেশ ছাড়িয়া গেলে এ দেশ অন্ধকার হইবে, তোমার মত আর কাঙ্গাল গরিবের দুঃখ কে বুঝিবে? তুমি স্বয়ং অন্নপূর্ণা।'

ছিদামের স্ত্রী বলিলেন, 'আমার এখন আর এসংসারে কোনো সুখ নাই। স্ত্রীলোকের পতিই ধর্ম—পতিই স্বর্গ। তিনি এত টাকা উপার্জন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার জন্য গয়ায় পিণ্ড পড়িল না। লোকের অপমৃত্যু হইলে নাকি যত দিনে গয়ায় পিণ্ড না পড়ে, তত দিন আর মুক্তি হয় না। যাহাতে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়, যাহাতে তিনি পরলোকে সুখে থাকেন, আমার এখন তাহাই চেষ্টা করা উচিত। আমি বিষয় সম্পত্তি ভাশুর পুত্রদিগকে লিখিয়া দিয়া দুই-চারিদিনের মধ্যেই চালিয়া যাইব।'

ছিদামের সমুদায় তালুকই তাঁর স্ত্রীর নামে ছিল। জগন্নাথ পূর্বে এই সকল তালুক

সম্বন্ধে একটা লেখা-পড়া করিয়া লইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শত বৎসর পূর্বে এদেশে এত উকিল আটর্ণীর আমদানি ছিল না। গ্রামের প্রধান মুশাবিদাকারক রামগতি মুন্সীকে ডাকাইয়া আনিলেন। রামগতি ঘোষকে সকলেই রামগতি মুন্সী বলিয়া ডাকিত। যাঁহারা পার্শি জানিতেন, তাঁহাদিগকেই লোকে মুন্সী বলিত। কিন্তু রামগতি নিজে পার্শি জানিতেন না। তাঁহার পিতামহ কিশোরনারায়ণ ঘোষ দশ-বার দিন এক জন মৌলবীর নিকট পার্শি পড়িয়াছিলেন, সেই জন্যই কিশোরনারায়ণের পুত্র-পৌত্রদিগকে সকলেই মুন্সী বলিয়া সম্বোধন করিত, এতদ্ভিন্ন রামগতি পার্শির দুই-একটা কথাও সময় সময় বলিত। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকানেক সভাস্থলে রামগতি 'বিচ মোল্লা হের্ রহোমান্ আর রহিম' ইত্যাদি দুই চারিটা পার্শি কথা অনেকবার বলিয়াছেন। সুতরাং রামগতি যে মুন্সী ছিলেন তাহার কোনো সন্দেহই হইতে পারে না।

জগন্নাথ রামগতি মুন্সীকে বলিলেন, 'মুন্সী মহাশয়, দেশের সকল লোকের দলিলপত্রে মুশাবিদাই আপনি করিয়া দিতেছেন। আপনার হাতের মুশাবিদা না হইলে আমার মনের সন্দেহ দূর হয় না। অনুগ্রহ করিয়া বউমার ত্যাগপত্রে মুশাবিদাটি করিয়া দিন।" রামগতি যে কেবল পাট্টা, কবুলিয়ত, কবলা, দানপত্র ইত্যাদির মুশাবিদা করিতেন তাহা নহে। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অনেকানেক রামপ্রসাদী মালসি রচনা করিতেন। সুতরাং এখন সময়ে সময়ে তাহার লিখিত পাট্টা কবুলিয়তের মধ্যেও রামপ্রসাদী মালসির দুই একটা কথা পড়িয়া যাইত। রামগতি মুন্সী চশমা নাকে দিয়া কলম ধরিয়া কলম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথম একটু ছেঁড়া কাগজে দুইবার দুর্গা নাম লিখিলেন। পরে এক সুদীর্ঘ মুশাবিদা প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা রামগতির সেই সমগ্র মুশাবিদা এক্ষণে উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ। পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এ বড় দীর্ঘ মুশাবিদা। কিন্তু শত বৎসর পূর্বে লোকে যে প্রণালীতে দলিল পত্র লিখিত তাহার আদর্শ স্বরূপ মুশাবিদার দুই একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"লিখিতং শ্রীস্বর্ণলতা ওরফে বদনমণি জওজে মৃত ঁছিদামচন্দ্র বিশ্বাস সাকিন সৈদাবাদ ** কস্য ত্যাগ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমার পরোলোকগত স্বামী মজকুরের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এ যাবত আমার দখলে ছিল। কিন্তু এই অসার সংসারে শ্রীগোবিন্দের চরণই একমাত্র সার। আর এই অনিত্য দেহ কোন সময়ে যে পতন হইবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। যেহেতু আমি সংসার ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক তীর্থবাস সংকল্প করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে ধামে যাইতে মনস্ত করিয়াছি। আমি পতিপুত্র হীনা অবীরা তোমরাই আমার শ্বশুরের একমাত্র পিণ্ডাধিকারি এবং স্বামী মজকুরের উত্তর কালের ওয়ারেশ। অতএব স্বামী মজকুরের তেজ্য সমুদায় স্থাবর অস্থাবর মালামাল ও তালুক ইত্যাদিতে আমার জীবনস্বত্ব তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। তোমরা আমার নাম খারিজে শ্রীলশ্রীযুক্ত মনশুর আল মুলাক হায়বাৎ জাঙ্গ ছানি ছেকন্দর সাহা কুলি মুল্লকে বাঙ্গালা সুবদার নবাব নাজেম আল উদ্দৌলা

বাহাদুরে সরকারে আপন আপন নাম জারি করত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক ইত্যাদি ইত্যাদি—”

ত্যাগ পত্র লেখাপড়ার কিছুদিন পরেই এই বিশ্বাস পরিবারের গুরু প্রেমানন্দ বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিদামের স্ত্রীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বারম্বার তাঁহাকে বলিলেন, ‘মা তুমি অতি সৎপথ অবলম্বন করিয়াছ। তুমি যেরূপ উচ্চ বংশের কন্যা, যেরূপ উচ্চ কুলের বধূ, তাহাতে তোমার যে এইরূপ শ্রীগোবিন্দের চরণে মতি হইবে তাহা আমি পূর্বেই জানিয়াছি। এ অসার সংসারে প্রভুর চরণই একমাত্র সার। শ্রীগোবিন্দের চরণ ভিন্ন সকলই অসার। তোমার এখন সাধু সঙ্গে থাকিয়া সর্বদা সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ এবং নামামৃত পানে মত্ত থাকাই উচিত। তুমি এখানেই ভেক গ্রহণ কর। ভেক গ্রহণ করিয়া পরে আমার সঙ্গে চলিয়া যাইবে। কিছুকাল আমার আশ্রমে থাকিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিবে। পরে বৈশাখ মাসে আমি তোমাকে নিজেই সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে লইয়া যাইব।’

ছিদামের স্ত্রী মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ভেক গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা কালে বাবাজী ইহাকে কী নামে অভিহিত করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ছিদাম বিশ্বাস একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন। রাবণের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ ছিল। তাঁহাকে কলির রাবণ বলিলেও হয়। তাঁহার স্ত্রী আজ ভেক গ্রহণ করিতেছেন। ইহাকে কি একটা ছোটখাটো নামে অভিহিত করা উচিত। ঘণ্টা দুই চিন্তা করিয়া প্রেমানন্দ বাবাজী ছিদামের স্ত্রী স্বর্ণলতাকে ‘ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী’ এই সুদীর্ঘ নামে অভিহিত করিলেন। বাবাজী মনে করিলেন যে, ইনি যে-আখড়ায় থাকিবেন সে-আখড়ায় অন্যান্য বৈষ্ণবীদিগের উপর ইঁহার আধিপত্য অবশ্যই বিস্তার হইবে। ইঁহার অনেক অর্থ আছে। সর্বদা মহোৎসব ইত্যাদি সদনুষ্ঠান করিবেন। সুতরাং প্রাধান্যের চিহ্ন স্বরূপ কোনো একটা নামে ইঁহাকে অভিহিত না করিলে নিতান্ত অন্যায় হয়।

এইরূপে ছিদামের স্ত্রী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলে পর, তাঁহার জামাতা সুবল মিত্র প্রেমানন্দ বাবাজীর নিকট আসিয়া বলিলেন, ‘প্রভু গুরুদেব! আমারও এই অসার সংসারে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমার বাল্যকালেই পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে। পরে শ্বশুরই একমাত্র পিতা ছিলেন, তাঁহারও মৃত্যু হইল। একমাত্র শাশুড়ি আছেন। তিনিই আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। তিনি যখন ভেক গ্রহণ করিয়া তীর্থবাসে যাইতেছেন, আমিও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ভেক গ্রহণ করিব। ইনি বড় ঘরের মেয়ে, কখন কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না। তীর্থ ভ্রমণ কালে রাস্তা-ঘাটে নানা কষ্ট হইবে। আমি সঙ্গে থাকিলে ইঁহার অনেকটা সেবা-শুশ্রূষা চলিবে।’

সুবলকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিতে প্রেমানন্দ বাবাজীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি বারম্বার তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, ‘বাপু তোমার অল্প বয়স, তুমি পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়া এখন গৃহ ধর্ম প্রতিপালন কর।’

কিন্তু সুবল কিছুতেই এই সাধুসঙ্কল্প হইতে বিরত হইল না। সুতরাং প্রেমানন্দ বাবাজী সুবলচন্দ্র মিত্রকে ভেক প্রদান পূর্বক ভক্তানন্দ নামে অভিহিত করিলেন।

পরদিন প্রেমানন্দ বাবাজী, ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী এবং ভক্তানন্দকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই-তিন দিন পরেই কাটোয়াস্থ আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের আখড়ার ন্যায় এই আখড়ায়ও অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর ছিল। তাহার এক-একখানি গৃহে এক-একজন বৈষ্ণব স্বীয়-স্বীয় সেবাদাসীর সহিত একত্রে বাস করিতেন। যে-সকল উচ্চশ্রেণীস্থ বাবাজিদিগের একাধিক সেবাদাসী ছিল, তাঁহাদের নিজের আর কোনো নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। এক-একজন সেবাদাসীর এক-একখানি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। বাবাজিগণ কখনো ইহার ঘরে, কখনো উহার ঘরে বাস করিতেন।

প্রেমানন্দ বাবাজী আখড়ার অধিকারী ছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র আখড়াস্থিত অন্যান্য বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। তিনি সকলকেই সাদরে এবং সস্নেহে সম্ভাষণ করিলেন। পরে ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী এবং ভক্তানন্দের বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণের আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ ইহাদিগের নিকট বিবৃত করিলেন। আশ্রমবাসিনী বৈষ্ণবীগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর হাত ধরিয়া অধিকারী ঠাকুরের গৃহে লইয়া গেলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী তাহার নিজের প্রধান সেবাদাসীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, 'প্রেমেশ্বরী! তুমি এবং বৃন্দেশরী বিশেষ যত্নের সহিত এই নবাগত ব্রজেশ্বরীরাইকিোরীর পরিচর্যা করিবে। ইনি সামান্যা বৈষ্ণবী নহেন। বিশেষ ধর্মতৃষ্ণা এবং ভক্তির ভাব না থাকিলে, এইরূপ ঐশ্বর্য অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া কেহ তীর্থপর্যটনকষ্ট স্বীকার করে না। ইনি আমার শিষ্য সেই অদ্বিতীয় প্রতাপশালী ছিদামচন্দ্র বিশ্বাসের পত্নী। কেবল সাধুসঙ্গ লাভ করিবার নিমিত্তই আমাদের আখড়ায় আসিয়াছেন। আমার নিজের বাসগৃহেই ইঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট কর।' প্রেমেশ্বরী জানিতেন গুরুর বাক্য সর্বদাই প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং আর দ্বিতীয় কোনো বাক্য না বলিয়া কেবল বলিলেন, 'যে আজ্ঞে', কিন্তু কথা বলিবার সময় তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাহার মুখে তখন বিমর্ষের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ভক্তানন্দ নামধারী সুবল মিত্র আখড়ায় প্রবেশ করিয়াই নিজের হুঁকা কল্কী বাহির করিয়া তামাক সাজিল; এবং প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত তামাক টানিতে লাগিল। পনের মিনিটে এক-কল্কী তামাক ভস্মীভূত হইলে, আর এক-কল্কী তামাক সাজিল। সে অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে। এখন তাহার এক-কল্কী তামাকে কখনো শ্রান্তি দূর হইতে পারে না। সে যখন দ্বিতীয়বার তামাক সাজিয়া হুঁকা টানিতে ছিল তখন প্রেমেশ্বরীর নিকট প্রেমানন্দ বাবাজী ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর থাকিবার স্থান তাঁহার নিজের ঘরে নির্দিষ্ট করিতে বলিলেন। সুবল একটু দূরে বসিয়া ছিল। সে তৎক্ষণাৎ হুঁকাটি হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'গুরুদেব, আমাদের নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র গৃহের আবশ্যক হইবে। আপনার

আখড়ায় অধিক ঘর না থাকিলে আমরা আজই লোকজন আনিয়া গৃহ নির্মাণের আয়োজন করিব। ইনি বড়লোকের ঘরের মেয়ে, অন্য কাহারও ঘরে থাকিতে পারবেন না।'

প্রেমানন্দ বাবাজী বলিলেন, 'আচ্ছা, ধীরে ধীরে ঘর প্রস্তুত করিবে। সম্প্রতি ইনি আমার ঘরেই থাকিতে পারিবেন। ইঁহার যাহাতে কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে যত্নের কোনো ত্রুটি হইবে না।'

ভক্তানন্দ বলিল, 'আজ্ঞে না, ঘরের আয়োজন আমাকে আজই করিতে হইবে। এইরূপ ছোট কুঁড়েঘর দিনের মধ্যে পাঁচখানাও প্রস্তুত করা যায়। না-হয় দশ টাকা অধিক ব্যয় হইবে।'

প্রেমানন্দ বাবাজী আর তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। ভক্তানন্দ নামধারী সুবল মিত্রের এই সকল কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সে লোক জন সংগ্রহ করিয়া দিনের মধ্যেই ঘর নির্মাণ করাইল। ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী এইরূপে প্রেমানন্দ বাবাজীর আখড়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভক্তানন্দ নামধারী সুবল মিত্রের বাল্যকাল হইতেই একটু গাঁজা খাইবার অভ্যাস ছিল। এখানে আসিবার পর সর্বদাই কেবল বসিয়া-বসিয়া কাল যাপন করিতে হয়। সুতরাং গাঁজার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে টাকাকড়ির অভাব ছিল না। ছিদামের স্ত্রী বাড়ি হইতে আসিবার সময় নগদ পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা এবং নিজের ও কন্যার সমুদয় গহনা পত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সমুদয় টাকা এবং গহনা-পত্র সুবলের হাতেই ছিল। আখড়ার মধ্যে ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর ব্যয়ে প্রায়ই মহোৎসব হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে ভক্তানন্দ গাঁজার মহোৎসব দিতে লাগিলেন। এই আখড়া এবং নিকটবর্তী দুই-একটি আখড়ার অনেকানেক বাবাজীই গাঁজা খাইতে শিক্ষা করিলেন। বৈষ্ণবীদিগের মধ্যে যাহারা পূর্বে তামাক খাইত, তাহারাও ভক্তানন্দের সঙ্গে দিনের মধ্যে তিন-চারিবার গাঁজা খাইতে আরম্ভ করিল।

প্রেমানন্দ বাবাজীর একটু শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যহ ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীকে তাঁহার নিকট বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ এবং চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু ভক্তানন্দ তাহার শাশুড়িকে বাবাজীর নিকট বড় যাইতে দিত না। ভক্তানন্দ বলিত, 'শ্রীমদ্ভাগবৎ আর আমরা কী শুনিব? সাত কাণ্ড শ্রীমদ্ভাগবৎ আমাদের মুখস্থই আছে। প্রত্যেক বৎসর আমার শ্বশুরবাড়ি পাঠকেরা আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিত। আমাদের বাড়ি শ্রীমদ্ভাগবৎ শুনিতে গ্রামের কত-কত লোক আসিত। এখন আমরা কি অন্য লোকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবৎ শুনিতে যাইব?'

অধিকারী ঠাকুর ভক্তানন্দের ঈদৃশ আচরণ বৈষ্ণবোচিত বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি মনে-মনে ভক্তানন্দের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। কখনো-কখনো তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াও ছিলেন যে ভক্তানন্দ এখান হইতে

চলিয়া না গেলে, ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর ধর্মলাভ হইবে না। এদিকে ভক্তানন্দের মনে মনেও বাবাজী ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী নিজেও প্রেমানন্দ বাবাজীর নিকট বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ কিম্বা চৈতন্য চরিতামৃত শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন না। বাবাজীর দন্তগুলি সকলই নড়িয়া গিয়াছিল। মুখপ্রক্ষালনকালে সজোরে দন্ত মার্জন করিতে পারিতেন না। ইহাতে তাঁহার মুখ হইতে বড় দুর্গন্ধ নির্গত হইত, এবং চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত শ্রোতাদিগের গাত্রে মুখমৃত বর্ষিত হইত। ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী পূর্ব হইতেই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন। সুতরাং বাবাজীর নিকট বসিতে তিনি বড় অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন।

একদিন অপরাহ্নে ভক্তানন্দ নিজেই গাঁজা ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ বাজারে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার প্রায় একসের দেড়েসের গাঁজা দিন দিন খরচ হইতে লাগিল। এই আখড়ার সাত-আটজন বাবাজী এবং তিন চারিজন বৈষ্ণবী বিলক্ষণ গাঁজা খাইতে শিখিয়াছেন। নিকটবর্তী অন্যান্য আখড়া হইতে অনেকানেক বৈরাগী ভক্তানন্দের গৃহে বসিয়া গাঁজা খাইতেন। সুতরাং ভক্তানন্দ মনে করিল যে প্রতিদিন বাজারে যাইয়া গাঁজা ক্রয় না করিয়া, একেবারে অর্দ্ধমণ গাঁজা ক্রয় করিলে অন্ততঃ পনের দিন চলিবে। এই ভাবিয়া ভক্তানন্দ আর দুইটি বাবাজীকে সঙ্গে করিয়া বাজারে গাঁজা ক্রয় করিতে গেলেন। অর্দ্ধমণ গাঁজা এক দোকানে মিলল না। বাজারে যে কয়েকখানি গাঁজার দোকান ছিল, সে সমুদয় দোকান ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ষোল সের মাত্র গাঁজা সংগহ করিলেন। বাজারে আর এক-পয়সার গাঁজাও রহিল না। নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অন্যান্য গাঁজাখোরের সর্বনাশ করিলেন; সাতদিনের মধ্যে আর গাঁজার নূতন চালান পৌঁছিবার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপে ষোল সের গাঁজা সংগ্রহ করিতে রাত্র কিছু অধিক হইল। ভক্তানন্দের পূর্বে একটু মদ খাওয়ার অভ্যাসও ছিল। আজ ষোল সের গাঁজা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মন বড়ই প্রফুল্ল হইল। তিনি যে-বৈরাগ্য ধর্মাবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। আখড়ায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় আজ একটু সুরাপানও করিলেন। পরে বিশেষ উৎসাহের সহিত ষোল সের গাঁজা লইয়া আখড়ায় আসিলেন। নিজের কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী তখন কুটিরে নাই। তিনি প্রেমানন্দ বাবাজীর নিকট বসিয়া চৈতন্য চরিতামৃত শ্রবণ করিতেছেন। অকস্মাৎ ভক্তানন্দের মনে কী ভাবের উদয় হইল তাহা কে বলিতে পারে। তিনি সক্রোধে প্রেমানন্দ বাবাজীর গৃহে প্রবেশ পূর্বক সজোরে তাহাকে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। বাবাজীর তিন-চারটি দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরে বাবাজী ঠাকুরের টিকি ধরিয়া টানিতে-টানিতে ঘরের বাহিরে আনিয়া তাঁহাকে বারম্বার পদাঘাত এবং মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রেমেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরীও বাবাজীর নিকট তখন বসিয়াছিল। তাহারা চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের চিৎকারের শব্দে অন্যান্য বাবাজীগণ সেখানে আসিয়া ভক্তানন্দকে বলিতে লাগিলেন 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' 'ধৈর্যাবলম্বন কর।'

এই বাবাজী মহাশয়েরা এত ভীরু যে একজনও সাহস করিয়া ভক্তানন্দকে ধরিলেন

না। ভক্তানন্দ প্রেমানন্দকে এইরূপে প্রহার করিতে-করিতে মৃতপ্রায় করিলেন; পরে ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর হস্ত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

এদিকে প্রেমেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরীর চিৎকারের শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ আখড়ার বৈষ্ণবগণ এবং গ্রামস্থ গৃহস্থেরা দৌড়িয়া আসিল। তাহারা সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, 'কী হইয়াছে?' প্রেমানন্দ বাবাজী তখনও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব-অধ্যায়ের উল্লিখিত গুরু গোবিন্দ বাবাজী তখন এই আখড়ায় ছিলেন। তিনি প্রেমানন্দ বাবাজীকে তখন বাতাস করিতেছেন। তিনি বড় চালাক, মনে মনে ভাবিলেন যে এই সকল কথা ব্যক্ত হইলে লোকে অপবাদ প্রচার করিবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশপূর্বক বলিলেন যে 'চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে গুরুদেবের মনে প্রবলবেগে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারা স্ত্রীলোক কিছু বুঝিতে পারে নাই, তাই চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া সকলেই প্রেমানন্দ বাবাজীকে একজন প্রকৃত ভক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; এবং তাঁহার প্রশংসা করিতে-করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রেমানন্দ বাবাজী সংজ্ঞালাভ করিলেন। এই ঘটনার পর দিবস তিনি গুরু গোবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ভক্তানন্দের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

গুরু গোবিন্দ বলিলেন, 'এখন ভক্তানন্দকে আখড়া হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব চলুন আমরা কিছুকালের নিমিত্ত তীর্থপর্যটনে গমন করি। ভক্তানন্দ যেরূপ ব্যয় করিতেছে তাহাতে তাহার হাতে অধিক দিন টাকা থাকিবে না। রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িলে সে আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।'

প্রেমানন্দ বাবাজী গুরু গোবিন্দের পরামর্শানুসারেই কার্য করিলেন। গুরু গোবিন্দ এবং কুঞ্জেশ্বরীকে আর তাঁহার নিজের সেবাদাসীদ্বয় প্রেমেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইঁহারা শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলে পর, অপর যে কয়েকজন গাঁজাখোর বৈষ্ণব এখানে ছিলেন, তাহারা ভক্তানন্দের সঙ্গে একত্র হইয়া এই আখড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তানন্দের হাতে অনেক টাকা ছিল। তাহার শাশুড়ি ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী মাসে-মাসে মহোৎসব করিয়া অনেক ব্যয় করিলেন। এদিকে ভক্তানন্দের গৃহে প্রায় প্রতিদিন দুইসের গাঁজার মহোৎসব হইতে লাগিল। এখন ভক্তানন্দ বাবাজীই এই আখড়ার অধিপতি হইলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন না। কিন্তু সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণের মধ্যে প্রায় কেহই ভিক্ষা করিতে

যাইতেন না। সকলের ব্যয়ই ভক্তানন্দ দিতে লাগিলেন। সকলেই আখড়ায় বসিয়া দিবারাত্র গাঁজার হুঁকা নিয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

এই আখড়ার অতি নিকেটই অদ্বৈতানন্দ বাবাজীর আখড়া ছিল। সেই আখড়া হইতে অতি অল্পবয়স্ক ললিতানন্দ বাবাজী মধ্যে-মধ্যে আসিয়া ভক্তানন্দের সহিত গাঁজা খাইতেন। তিনি একদিন বলিলেন, 'সাধু ভক্তানন্দ! অন্যান্য আখড়ার বাবাজীগণ তোমাদের এই আখড়ার বৈষ্ণবগণকে বড় নিন্দা করেন। বোধহয় ভবিষ্যতে আর তোমাদের মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা যোগ দিবেন না। তোমরা বৈষ্ণবদিগের আচার-ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ। প্রেমানন্দ বাবাজীর তীর্থ পর্যটনে যাইবার পর একদিনও তোমাদের আখড়ায় সৎ প্রসঙ্গ হয় না; শ্রীমদ্ভাগবত কিম্বা চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ হয় না; তোমরা কখনো নামসঙ্কীর্তন কিম্বা নামামৃত পান কর না।'

ভক্তানন্দ এই সময় হুঁকা হাতে লইয়া গাঁজায় দম দিতেছিলেন। সুতরাং কথা বলিবার অবকাশ নাই। তাহা না হইলে ললিতানন্দ একেবারে এত কথা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু ললিতানন্দের কথা শেষ হইবামাত্র হুঁকাটি তাহার মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, 'আরে নামামৃত পরে পান করিস; ভাই তুই এখন এই টাটকা অমৃত একবার পান কর। এ-অমৃতের চেয়ে কোনো অমৃতই ভাল লাগিবে না।'

ললিতানন্দ গাঁজার হুঁকা নিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু গাঁজা খাওয়া শেষ হইলে পর আবার বলিলেন, 'ভাই তোমাদের আখড়ায় যদি চৈতন্য চরিতামৃত কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবত না থাকে তবে অন্য এক আখড়া হইতে একখানা চাহিয়া আনিতে পার। প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই দিনের মধ্যে একবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তির দুই-চারটি কথা পাঠ করা উচিত।'

ভক্তানন্দ বলিলেন, 'শ্রীমদ্ভগবত আবার চাহিয়া আনিতে হইবে কেন; সাতকাণ্ড শ্রীমদ্ভাগবত আমার মুখস্থই আছে। আমাকে শাস্ত্র পড়াইবার নিমিত্ত আমার শ্বশুর মাস-মাস হরিদাস তর্কপঞ্চাননকে দুইশত টাকা দিতেন। আমি কি আর শাস্ত্র জানি না? হরিদাস তর্কপঞ্চানন এমন পাজি, অনর্থক আমার উপর সন্দেহ করিয়া আপন বিধবা কন্যাটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিল।'

ললিতানন্দ। যদি শ্রীমদ্ভাবতের শ্লোকগুলি তুমি সমুদয় মুখস্থই বলিতে পার, তবে তাহার দুই-একটা শ্লোক প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র হইয়া আবৃত্তি কর না কেন?

ভক্তানন্দ। আরে বেটা মুর্খ বৈরাগী; শ্রীমদ্ভাগবতের আবার শ্লোক কীরে? সাতকাণ্ড শ্রীমদ্ভগবত আমার শ্বশুরবাড়ি বৎসরের মধ্যে তিনবার পাঠ হইত। পাঠক রাগ-রাগিণী করিত। পরে কথক আসল কথাটা বলিত। আমি আর শ্রীমদ্ভাগবত জানি না? শ্রীমদ্ভগবতে কয়টাই বা কথা—হনুমান তিন লাফে সমুদ্রপার হইয়া লঙ্কায় গেল,—অমৃতফল চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া রাবণ তার লেজে আগুন দিল,—বেটা শেষে লাফাইয়া-লাফাইয়া ঘরগুলো পোড়াইয়াছিল—এই তো তোমার শ্রীমদ্ভাগবত?—আমি এ-সকল বুঝি আর জানি না।'

ললিতানন্দ। তোমার ভুল হইয়াছে। এ যে রামায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক-অনেক ভক্তির কথা আছে।

ভক্তানন্দ। বপু তুই চুপ কর্। আর যে দুই-চারটি কথা আছে তাহাও আমি জানি। হরিদাস তর্কপঞ্চাননের নিকট আমি আস্ত্র (শাস্ত্র) পড়িয়াছি। আমি কি আর জানি না যে, কুম্ভকর্ণ এবং মন্দোদরী পরামর্শ করিয়া বালী বেচারাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিল।

ললিতানন্দ। তুমি কী বলিতে কী বলিতেছ?

ভক্তানন্দ। হাঁ একটু ভুল হইয়াছে। বিষ খাওয়ায় নাই। হরিদাস তর্কপঞ্চানন তাহার কন্যাকে বিষ খাওয়াইয়া ছিল, সে-কথাটা ভুলে বলিয়াছি। এখন আমার স্মরণ হইয়াছে। রাম আর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করে বালীকে মারিয়াছিল।

ললিতানন্দ। তোমার সকলই ভুল। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল ভক্তির কথা।

ভক্তানন্দ। আমি বড় অভক্তির কথা বলিতেছি নাকি? ভক্তির সে কথাটা কি আজ জানি না। বালীর মৃত্যুর পর ভক্তিপূর্বক অঙ্গদ পিতৃশ্রাদ্ধ করিল। সমুদয় বাঁদরেরআনন্দের সীমা রহিল না। যেন আমার শাশুড়ির মহোৎসব আর কী! যত বাঁদর ছিল সকলেই লেজ খুলে বসে পেটভরে বালীর শ্রাদ্ধের দই-চিড়া খাইতে আরম্ভ করিল। আমার শ্বশুরবাড়ি কথক ঠাকুর এই কথা কতবার বলিয়াছেন।

ললিতানন্দ। তোমার রামায়ণেও ভুল। কুম্ভকর্ণ কি বালীকে মারিয়াছিল। বালীর কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীব বালীকে মারিয়াছিল।

ভক্তানন্দ। আরে মূর্খ বৈরাগী তোর শাস্ত্রজ্ঞান একেবারেই নাই। শাস্ত্র তুই বুঝিতে পারিস না। হরিদাস তর্কপঞ্চাননের ন্যায় পণ্ডিত আমাদের এদেশে নাই। তিনি যখন মহারাজ নন্দকুমারের দরবারে গিয়াছিলেন, মহারাজ নন্দকুমারই তখন দেওয়ান ছিলেন। তর্কপঞ্চানন সমুদয় শাস্ত্র খুলিয়া বলিতে লাগিলেন—'মহারাজ! শাস্ত্রে যাহাদের বৃহৎপত্তি (ব্যুৎপত্তি) হইয়াছে, তাহাদের নিকট সকলই এক। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাস্তি। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই হরি, তিনিই খোদা' আরে মূর্খ বৈরাগী তর্কপঞ্চানন নিজমুখে এই কথা মহারাজ নন্দকুমারের নিকট বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে যাহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাহাদের নিকট সকলই এক। তোর বেটা শাস্ত্রবোধ নাই, তাই তুই ভাবিতেছিস কুম্ভকর্ণ একজন আর সুগ্রীব আর একজন। যিনি কুম্বকর্ণ—তিনিই সুগ্রীব। যিনি রাম—তিনিই লক্ষ্মণ—তিনিই সুমিত্রা। একে তিন তিনে এক—এ তো শাস্ত্রের স্পষ্ট কথা। শাস্ত্রে জ্ঞান হইলে জানিতে পারিবি সব এক। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাস্তি।

ললিতানন্দ। ভাই তোমার সঙ্গে কেহ তর্ক করিতে পারে না।

ভক্তানন্দ। তোর শাস্ত্রে জ্ঞান হইলে তর্ক করিতেও জানিবি। বাপু তুই এখন ও-সকল কথা ছেড়ে দে। আমার অজ্ঞাত কোনো শাস্ত্র নাই। দুইবার আমি হরিদাস তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের দরবারে গিয়াছি। আমার শ্বশুর তর্কপঞ্চাননকে বলিতেন,

‘পণ্ডিত মহাশয় আপনি যখন বড়-বড় লোকের সভায় যাইবেন তখন আমার জামাইটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে ভদ্রলোকের সভায় কিরূপে আলাপ ব্যবহার কোত্তে হয়, তাহা শিখিতে পারিবে।’ তাই আমি তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে কত কত সভায় গিয়াছি।

ললিতানন্দ। ভাই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করিলে কোনো ফল নাই। তোমরা নামগান, নামসংকীর্তন এবং নামামৃত পান কর না কেন।

ভক্তানন্দ এই সময়ে আর এক-কল্কী গাঁজা সাজিতেছিল। প্রথম নিজে গাঁজার হুঁকায় দুই দম দিল, পরে হুঁকাটি ললিতানন্দের মুখের নিকট ধরিয়া বলিল, ‘ধর বেটা পেতি বৈরাগী। আর একবার এই অমৃত পান করিয়া তোর আখড়ায় চলিয়া যা। অমৃত না জুটিলে আমার কাছে আসিস। পেটভরা অমৃত দিব। তোর ও সকল নামামৃতের চেয়ে আমার এই অমৃত ভাল।’

ললিতানন্দ তখন প্রস্থান করিল। ভক্তানন্দ নামধারী সুবল মিত্র গাঁজা এবং মহোৎসবে সমুদয় টাকা ছয়-সাত মাসের মধ্যে ব্যয় করিয়া ফেলিল। তাহার মৃত স্ত্রীর এবং তাহার শাশুড়ির যে-সকল স্বর্ণালঙ্কার ছিল তৎসমুদয় বিক্রয় করিয়া একেবারে সর্বস্ব লুঠাইয়া দিল। পরে আর গাঁজা চলে না, আহার চলে না। শাশুড়ির সঙ্গে দিন-দিন ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে গৃহস্থের বাড়ি অন্যান্য বৈষ্ণবীদিগের সঙ্গে ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিত। ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরী ভিক্ষা করিয়া যে কিছু চাউল পাইত তাহা দ্বারা ভক্তানন্দ গাঁজা ক্রয় করিতে চাহিত। তাহার শাশুড়ি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলে তাহাকে প্রহার করিত। একদিন শাশুড়ীকে অত্যন্ত প্রহার করিল। তাহার শাশুড়ি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। ভক্তানন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার শাশুড়ির মৃত্যু হইয়া থাকিবেক। সুতরাং খুনের দায় এড়াইবার নিমিত্ত পলায়নপূর্বক একেবার যশোহরে চলিয়া গেল।

তাহার শাশুড়ির চৈতন্য হইলে পর, কয়েকদিন নিতাইর মা তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিল। কিন্তু সেইদিনের প্রহারের পরই ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর বাতব্যাধি হইয়াছে; চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া পথিকদিগের নিকট ভিক্ষা করেন। এই বৃক্ষতলেই সাবিত্রীর সহিত এই ঘটনার দুই বৎসর পরে সাক্ষাৎ হইল।

এদিকে শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পথে প্রেমানন্দ বাবাজীর এবং প্রেমেশ্বরীর মৃত্যু হইল। গুরু গোবিন্দ বাবাজী কুঞ্জেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরীকে সঙ্গে করিয়া কাটোয়ায় আসিয়া দেখিলেন যে প্রেমানন্দ বাবাজীর আখড়ার বৈষ্ণবীগণ ভিন্ন-ভিন্ন আখড়ায় চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তানন্দ পলায়ন করিয়াছেন। কেবল নিতাইর মা এবং ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীই আখড়ায় আছেন। তিনি তখন কুঞ্জেশ্বরী এবং বৃন্দেশ্বরীকে লইয়া ভক্তদাস বাবাজীর আখড়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

নিতাইর মা প্রেমানন্দ বাবাজীর আখড়ায় একজন বৈষ্ণবী ছিল। এই আখড়ায় আসিবার পর নিতাইর জন্ম হইয়াছে। পুত্রসহ তাহাকে অন্য কোনো আখড়ার বাবাজীরা স্থান দিল না। সুতরাং এই পরিত্যক্ত আখড়ায় ব্রজেশ্বরী-রাইকিশোরীর সঙ্গে একত্রে রহিল। ব্রজেশ্বরীরাইকিশোরীর কুটিরের পশ্চিমদিকে একখানি ছোট কুটিরে নিতাই এবং তাহার মাতা বাস করে। তাহারা মাতা পুত্রে কখনো ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করে, কখনো বা নিতাই বাজারে দোকানদারদিগের ঘরে কাজ কর্ম করিয়া যে দুই-এক পয়সা পায় তদ্দ্বারাই আহারের সংস্থান করে।

যে ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর একটু মাথা ধরিলে ছয়-সাত জন দাসী সেবাশুশ্রূষা করিত, আজ সে রৌদ্র মধ্যে বৃক্ষতলে বসিয়া ভিক্ষা করে। এ-সংসারে পাপের সমুচিত দণ্ড সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কর্মফল কেহই এড়াইতে পারে না। কিন্তু ছিদামের স্ত্রীর অন্তর মধ্যে স্বীয় কুকার্যের নিমিত্ত অনুতাপানল এখনও প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। পাপী যতদিন আত্মদোষ দেখিতে না পায়, তত দিন পর্যন্ত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয় না।

চোদ্দ

বাল বিধবার মৃত্যুশয্যা

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে এতদ্ পূর্বে বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে যে, হরিদাস তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে রামদাস শিরোমণির বিশেষ শত্রুতা ছিল। কিন্তু যে-জন্য ইহাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হইয়াছিল তাহাই এ-স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

হরিদাস তর্কপঞ্চানন সমাজের মধ্যে একজন প্রধান লোক। দেশের মধ্যে অত্যন্ত ধার্মিক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। তর্কপঞ্চাননের তিনটি সন্তান ছিল। ইহাদের মধ্যে সুদক্ষিণা নাম্নী কন্যাই সর্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন। সুদক্ষিণার নবম বর্ষ বয়স অতিবাহিত হইবার পূর্বেই, একটি সদ্বংশজাত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু বিবাহের পর তিন বৎসরগত হইতে-না হইতে তিনি বিধবা হইলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার স্বামীর বয়ক্রম ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি ঊনবিংশতি বৎসরের পূর্বেই নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

সুদক্ষিণা বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম যোড়শ বৎসর হইল। কেন যে পরমেশ্বর সর্ব সুলক্ষণা সুদক্ষিণার অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা লিখিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্যের বলিবার সাধ্য নাই। ইহাকে দেখিলে অতি কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইত। সুদক্ষিণা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রূপরাশি অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়স্থিত সদগুণই সমধিক প্রশংসনীয় ছিল। ইহার হৃদয়ের পবিত্র ভাব, ইহার চরিত্রের নির্মলতা, ইহার পিতৃবৎসলতা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ইহার প্রত্যেক কার্য এবং ব্যবহারের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু দরিদ্রের রাশি-রাশি গুণ থাকিলেও যদ্রূপএক দরিদ্রতা দোষ নিবন্ধন সকলই নিষ্ফল হয়, সেইরূপ বঙ্গবিধবার বৈধব্যাবস্থাই তাহাদের সমুদয় গুণরাশিকে বিনাশ করে।

সুদক্ষিণা যৌবন প্রাপ্তির পর একটি দিনও গৃহ হইতে কখনো বাহির হইতেন না। হিন্দু রমণীগণকে পিত্রালয়ে অবস্থান কালে একবারে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিতে হয় না। পিতৃগৃহে তাহারা কতকটা স্বাধীনতা সহকারে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারেন। কিন্তু বালবিধবা সুদক্ষিণা স্বেচ্ছাপূর্বক আপনাকে সে অধিকার হইতেও বঞ্চিত রাখিতেন।

সুদক্ষিণার মাতা একদিন তাহাকে বলিলেন, 'বাছা! সর্বদাই তুমি গৃহে মধ্যে বসিয়া থাক, ঘরের বাহিরে একটু হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পার না?'

সুদক্ষিণা বলিলেন, ‘মা তুমি বুঝিতে পার না, স্ত্রীলোক বিধবা হইলে লোকে অনর্থক তাহাদিগের নামে কত মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে। আমাদের গ্রামের লোকের আর তো কোনো সদালাপ নাই; কোন বিধবা কিভাবে চলে, কী খায়, কাহার সঙ্গে কখন কথা বলিল, এই সকল বিষয় লইয়া তাহারা সর্বদা চর্চা করে। এই চিরসুঃখিনী বিধবাদিগের সম্বন্ধে তাহারা সময়ে-সময়ে কত মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে। আমার ইচ্ছা হয় যে আমি এ-পৃথিবীতে আছি তাহাও যেন কেহ না জানে। আমার এ-জীবন বৃথা। আমি থাকিলেই বা কী মরিলেই বা কী। কিন্তু লোকে যদি অনর্থক আমার নামে একটা কথা বলে, তাহা হইলে বাবার অপমানের আর সীমা-পরিসীমা থাকিবে না, আর শ্বশুর ঠাকুরও ভদ্রসমাজে মাথা উঠাইতে পারিবেন না। তুমি বুঝিতে পার না যে, আমি এখন দুই-কুলের শত্রু হইয়া পড়িয়াছি।

সুদক্ষিণার মাতা তাহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর আর কখনো তিনি সুদক্ষিণাকে বাহিরে যাইতে বলিতেন না।

যে-গ্রামে সুদক্ষিণার বিবাহ হইয়াছিল, সেই গ্রামে এবং সেই বংশের অপর একটি ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে রামদাস শিরোমণির কন্যা শ্যামারও বিবাহ হইয়া ছিল। শ্যামার বয়স এখন চব্বিশ পঁচিশ-বৎসর হইয়াছে। তিনি আঠার বৎসর বয়সের সময় বিধবা হইয়াছেন। শ্যামা অত্যন্ত সচ্চরিত্রা। তিনি এখন পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। শ্যামা সুদক্ষিণাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনিও বড় ঘরের বাহির হইতেন না। সুতরাং সর্বদা পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতের বড় সুবিধা ছিল না। বিধবাদিগের বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকে যে অনর্থক নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে, অল্প বয়স্কা সুদক্ষিণা তাহা কখনো জানিতেন না। শ্যামাই তাঁহাকে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং শ্যামার উপদেশানুসারেই সুদক্ষিণা যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পর আর ঘরের বাহির হইতেন না। শ্যামাকে সুদক্ষিণা সর্বদা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় সম্মান করিতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কখনো কখনো দুই-তিন মাস অন্তর শ্যামা স্বীয় জননীর সঙ্গে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিয়া সুদক্ষিণাকে দেখিয়া যাইতেন। তখন তাহারা একত্রে পরস্পরের নিকট পরস্পরের মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্যামা বিধবা হইবার পূর্বেই বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। শ্যামার উপদেশানুসারে সুদক্ষিণাও বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়াছেন। এই সময় অত্যল্প স্ত্রীলোকই বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিতে জানিতেন। আর পাঠ্যপুস্তকও অধিক ছিল না। অনেকের গৃহেই কেবল হস্ত লিখিত কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত থাকিত। সেই রামায়ণ এবং মহাভারতই এই সময়ের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল। কিন্তু শতবৎসর পূর্বে বঙ্গ রমণীগণ শুদ্ধ কেবল এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া, এবং যে সকল স্ত্রীলোক পাঠ করিতে জানিতে না, তাহারা এই দুইখানি পুস্তক শ্রবণ করিয়া, যদ্রূপ নির্মল চরিত্র লাভ করিতেন, এখন যে রাশি-রাশি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই, তাহা পাঠ করিয়া

বঙ্গমহিলাগণকে সেইরূপ পবিত্র চরিত্র লাভ করিতে দেখা যায় না। বরং আমরা সর্বদাই শুনিতে পাই যে নব্য বাঙ্গালা গ্রন্থাকারদিগের লিখিত নাটক পাঠ করেন বলিয়াই কলিকাতাস্থ যুবতীগণের মধ্যে হিষ্ট্রীয়া রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

চৈত্র মাসে একদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ব্রাহ্মণী রন্ধন করিতেছেন; তিনি তখন নিজে উঠিয়া যাইতে পারেন না। সুতরাং সুদক্ষিণাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাছা! উনি (তর্কপঞ্চানন) কাল আমের টক খাইতে চাহিয়াছিলেন, ঐ দেখ গাছতলায় অনেক আম পড়িয়া রহিয়াছে, দুইটা আম কুড়াইয়া আন।'

রন্ধনশালা হইতে পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটি আমগাছ ছিল। সুদক্ষিণা সেই আমগাছের তলে আম কুড়াইতে গেলেন। এই আমগাছের পাঁচ-ছয় হাত দূরে গ্রমের স্ত্রীলোকদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র রাস্তা ছিল। স্ত্রীলোকেরা এই পথ দিয়া তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিতেন। কিন্তু কখনো কখনো গ্রামের দুই একজন বিশেষ পরিচিত পুরুষ সোজা পথে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিতে হইলে এই পথ দিয়াই আসিতেন। সুদক্ষিণা যখন আম কুড়াইতে ছিলেন, তখন ছিদাম বিশ্বাসের জামাতা সুবল মিত্র এই রাস্তা দিয়া তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিতেছিল। সুবল মিত্রের এই একটি অভ্যাস ছিল যে, কি পরিচিত কি অপরিচিত, —লোক দেখিলেই সে একমুখ হাসি লইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্বক তাহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিত। সুবল সুদক্ষিণাকে আম কুড়াইতে দেখিয়া হাসিভরা মুখে বলিয়া উঠিল 'কী ঠাকুরানী! আম কুড়াইতেছেন? এদিকে অনেক আম পড়িয়াছে।'

সুদক্ষিণা সুবলকে চিনিতেনও না। তিনি তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলিলেন না। হিন্দু মহিলাগণ অপরিচিত পুরুষ দেখি লে যদ্রূপ লজ্জাবনত মুখে মৌনাবলম্বন করেন, সুদক্ষিণা সেইরূপ মৌনাবলম্বনপূর্বক ভূমিতলে চাহিয়া রহিলে। সুবল মিত্রও আরকোনো কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ তর্কপঞ্চাননের বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তর্কপঞ্চানন এই সময়ে রন্ধনশালায় স্ত্রীর নিকট কী কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। তিনি রন্ধনশালা হইতে দেখিতে পাইলেন যে সুবল মিত্র তাঁহার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া সহস্যমুখে কী বলিতেছে। তর্কপঞ্চানন মহাশয় সুবলকে বড় লম্পট বলিয়া জানিতেন; কিন্তু সুবল সুদক্ষিণাকে যে কী কথা বলিয়াছিল তাহা শুনিতে পাইলেন না। কেবল তাহাকে সহাস্য মুখে কথা বলিতে দেখিয়াছেন। কুটবুদ্ধি তর্কপঞ্চাননের মনে কন্যার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার কন্যা বিধবা, তাহার এখন যৌবন কাল, সুতরাং এ-কন্যার দ্বারা যে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল কলঙ্কিত হইবে তাহার কোনো সন্দেহ নাই।

দুই তিন দিন ক্রমাগত তর্কপঞ্চানন কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে এক রাত্রে তাঁহার স্ত্রীর নিকট বলিলেন, 'কন্যার চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি স্বচক্ষে সুবল মিত্রকে তাহার কন্যার সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছেন।'

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তুমি সুদক্ষিণার ভাব বুঝিতে পার না, সে প্রাণান্তেও ঘরের বাহির হইতে চায় না। সর্বদাই বলে যে আমি দুই কুলের শত্রু হইয়া পড়িয়াছি; কে কোন সময়ে আমার কথা বলিবে আর দুই কুলেই কলঙ্ক পড়িবে।'

তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিলেন; বারম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'সত্য সত্যই সুদক্ষিণা এইরূপ বলিয়াছে?'

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন 'হাঁ, দুই-তিন দিন আমার নিকট বলিয়াছে যে, মা আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হয়।' আহা বাছা আমার যখন মৃত্যু কামনা করে তখন আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমি পূর্বজন্মে কতই না পাপ করিয়াছিলাম তাই বাছার আমার এই যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতেছি।'

স্ত্রীর মুখে এই সকল কথা শুনিলে পর তর্কপঞ্চাননের সন্দেহ শতগুণে বৃৎদ্ধ হইল। পূর্বে সন্দেহ করিয়া ছিলেন যে সুবল মিত্র হয়তো তাঁহার কন্যাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখন একেবারেই সিদ্ধান্ত করলেন যে সুবল মিত্র সর্বনাশ করিয়াছে, তাঁহার কন্যাকে নিশ্চয়ই কুপথগামিনী করিয়াছে। তাহা না হইলে লোকে তাহার সম্বন্ধে কোনোদিন কী কথা বলে, সুদক্ষিণা এইরূপ আশঙ্কা করিবে কেন?—মৃত্যু কামনা করিবে কেন?

কুটিল প্রকৃতির লোক কোনো বিষয় সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইলে এইরূপ যুক্তিই অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা লোকের প্রত্যেক কথা এবং কার্যের মধ্যে কুট অর্থ নির্দেশ করে।

তর্কপঞ্চানন সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাহার কন্যা নিশ্চয়ই কুপথগামিনী হইয়াছে। কিন্তু তাহার কলঙ্ক প্রচার হইবে, সেই আশঙ্কায় তিনি পূর্বেই এই সকল কপট বাক্য দ্বারা পিতা-মাতাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তর্কপঞ্চানন চুপে-চুপে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন *** — ******

তাঁহার স্ত্রী তাঁহার কথা শুনিয়া ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। স্বামীকে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বলিতে লাগিলেন, 'তুমি পিতা হইয়া নিরূপরাধিনী কন্যার সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছ?'

সন্তান বৎসলা ব্রাহ্মণীর আর সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে অবশেষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশপূর্বক বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমি তোমার গৃহ ছাড়িয়া যাইব, আমার চিরদুঃখিনী বাছাকে বুকে করিয়া আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব; আহা আমার বাছা স্বামী কী তাই বুঝে নাই। বাছার আমার সর্বদাই চক্ষের জল পড়িতেছে। বাছার মুখে কথা নাই। বাছাকে বাহিরে যাইতে বলিলেও বাছা আমার ঘরের বাহিরে যাইতে চায় না। হা পরমেশ্বর, আমি পূর্বজন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যে আমাকে এত শাস্তি দিলে? যম, তুমি আমাকে চক্ষে দেখ না? আমাকে এ-সংসার হইতে লইয়া যাও। আমার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। আমার দুঃখের উপর দুঃখ।'

ব্রাহ্মণীর আর সমস্ত রাত্রে নিদ্রা হইল না। কন্যার দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্র ভোর করিলেন।

তর্কপঞ্চানন ভাবিতে লাগিলেন যে তাহার স্ত্রী পূর্বকালের লোক, নিতান্ত হীনবুদ্ধি, সুতরাং কন্যার চাতুরীতে প্রতারিত হইয়াছেন। কিন্তু এখন কী করিবেন তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু বিধবাগণ কুচরিত্রা হইলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা লোকলজ্জা এড়াইবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে বৃন্দাবনে কিম্বা কাশীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তর্কপঞ্চানন বিলক্ষণ জানিতেন যে তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে কন্যাকে তীর্থস্থানে পাঠাইতে তাঁহার সাধ্য হইবে না। তাঁহার স্ত্রী প্রাণান্তেও কন্যাকে এইরূপ স্থানান্তরে পাঠাইতে সম্মত হইবেন না।

দুই-তিন দিন চিন্তা করিয়া অবশেষে মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, ‘লোকের কূল মান না থাকিলে তাহার জীবনই বৃথা। গোপনে লোক যতই পাপ করুক না কেন, সামাজিক লজ্জা সামাজিক কলঙ্ক না হইলেই ভাল। এই বিধবা কন্যাটা সত্যসত্যই দুই কুলের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বাঁচিয়া থাকিলেই বা কী ফল। এ-কন্যা কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহার কলঙ্ক প্রচার হইবার পূর্বেই বিষ প্রদান পূর্বক ইহার জীবন নষ্ট করিলে লোকলজ্জা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। আর কোনো সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে না।

মনে-মনে এই স্থির করিয়া কন্যার প্রাণ বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে বিষ আনিয়া রাখিলেন। স্ত্রীর নিকট এই সকল কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিতে গেলে স্ত্রী পাছে টের পায়, এইজন্য ঔষধ বলিয়া কন্যাকে বিষ খাওয়াইবেন এইরূপ স্থির করিলেন।

সুদক্ষিণার ধর্মের প্রতি বড় নিষ্ঠা ছিল। একাদশীয় উপবাসের দিন এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করিতেন না। আজ একাদশীয় উপবাস। আজ আহার করিতে হইবে না। আজ সমস্ত দিন অবকাশ রহিয়াছে। তিনি মহাভারত হইতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিতেছেন। হস্ত লিখিত পুস্তক ধীরে-ধীরে পাঠ করিতে হয়। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিতে-করিতে বেলা দুই প্রহর হইল। ইহার পর শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান পড়িবেন। মনে-মনে তিনি স্থির করিয়াছেন আজ সমস্ত দিনই মহাভারত পাঠ করিবেন। মহাভারত পাঠ করিলে পড়িবার সময়ে যে মনে সুখ-শান্তি হয়, কেবল তাহা নহে; তিনি বিশ্বাস করিতেন মহাভারত পাঠ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়; পাপীর স্বর্গলাভ হয়। শতবৎসর পূর্বে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল। তাঁহারা পুণ্য সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত মহাভারত পাঠ করিতেন।

সুদক্ষিণা অনাহারে সমস্ত দিন বসিয়া মহাভারত পাঠ করিলেন। ইহাতে রাত্রে তাঁহার অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হইল। দিবসে দময়ন্তীর চরিত্র পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং

রাত্রে নল ও দময়ন্তীর জীবনের ঘটনা সমূহ ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি মধ্যে আর তার নিদ্রা হইল না। তিনি শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননীর চক্ষে আজ বড় নিদ্রা নাই। সুদক্ষিণার একদশীর উপবাসের দিন তাঁহাকে প্রায়ই ক্রন্দন করিতে দেখা যাইত; এবং কোনো-কোনো একাদশী উপলক্ষে তিনি নিজেও আহার করিতেন না। তাঁহাকে কেহ আহার করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, 'আমার বাছা উপবাসিনী থাকিবে, আমি কোন পোড়ার মুখে ভাত দিব।'

সুদক্ষিণাকে ছটফট করিতে দেখিয়া তাহার জননীর মনে হইল যে হয়তো বাছা ক্ষুধায় এইরূপ কষ্ট পাইতেছে।

কন্যার কষ্ট দর্শনে তাহার দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তর্কপঞ্চানন স্ত্রীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কী হইয়াছে?' তাঁহার স্ত্রী একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্বক বলিলেন—'আর নূতন কী হইবে? যে আগুন কোলে করিয়া রহিয়াছি, সেই আগুনেই জ্বলিতেছি। বাছা বোধহয় ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছে। তাই সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিতেছে না।'

তর্কপঞ্চানন তখন কন্যার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুদক্ষিণা তোমার কী হইয়াছে?'

সুদক্ষিণা বলিলেন—'বাবা আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, তাহাতেই ঘুম হইতেছে না।'

তর্কপঞ্চানন তখন কন্যার ললাটোপরি হস্ত স্থাপনপূর্বক বলিলেন—'বাছা তোমার যে একটু জ্বর হইয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই কবিরাজের নিকট হইতে তোমাকে একটা ঔষধের বড়ি আনিয়া দিব।'

রজনী প্রভাত হইল। তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী রাত্রেই কিছু ছোলা ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই কন্যাকে স্নান করিতে বলিলেন। কন্যা স্নান করিতে চলিয়া গেল। তিনি সেই ছোলা ছাড়াইয়া কন্যার জল খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণা স্নান করিয়া আসিয়া জল খাইলেন। তাহার জননী তখন নিজে তাড়াতাড়ি নিরামিষ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গতকল্য সমস্ত দিন রাত্রের মধ্যে কন্যা কিছুই আহার করে নাই। জননীর প্রাণে কি সন্তানের এই সকল কষ্ট সহ্য হয়।

এদিকে তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের মধ্যে তিনি একজন প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং স্তব পাঠের আড়ম্বরটা কিছু অধিক ছিল।

প্রাতঃকালের সমুদয় ধর্মকর্ম একে একে সমাপ্ত করিয়া সুদক্ষিণাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা! গতকল্য তোমার একটু জ্বর হইয়াছিল। আমি তোমার জন্য ঔষধ আনাইয়াছি। এই ঔষধের বড়িটি একটু জল দিয়া গিলিয়া ফেল।'

সুদক্ষিণা বলিলেন ‘বাবা! আমার ঔষধ খাইতে ইচ্ছা হয় না। আমার মৃত্যু হইলেই ভাল; আর জ্বরইবা আমার কোথায়।’

তর্কপঞ্চানন বলিলেন—‘না মা; সে কী কথা। ঔষধ খাইবে না কেন? এই ঔষধ তুমি জল দিয়া গিলিয়া ফেল।’

পিতৃবৎসলা সুদক্ষিণা পিতার আদেশ কখনো লঙ্ঘন করিতেন না। নিজের প্রাণ বিসর্জন করিয়াও পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা করিতেন। সুতরাং পিতৃপ্রদত্ত ঔষধ একটু জল মুখে লইয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী এই ঔষধ খাওয়ার বিষয় কিছুই জানেন না। তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া কন্যার নিমিত্ত নিরামিষ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন।

হা সন্তান বৎসলা জননি! তুমি আর কাহার নিমিত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছ! নানাবিধ কুৎসিত দেশাচার নিবন্ধন এই নরকতুল্য বঙ্গদেশ নর-পিশাচে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জাত্যভিমান পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত আজ পিতা স্বহস্তে কন্যার প্রাণ বিনাশ করিতেছেন।

এই ঔষধ ভক্ষণের প্রায় এক ঘণ্টা পরেই সুদক্ষিণার শরীর ছট ফট করিতে লাগিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, সে অঞ্চল পাতয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। তাহার মাতা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। কিন্তু সুদক্ষিণার আর উঠিয়া যাইবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মণী বারম্বার রন্ধনশালা হইতে কন্যাকে ডাকিতেছেন, কন্যার আহার করিতে যাইতে বিলম্ব দেখিয়া স্বীয় অদৃষ্টকে তিরস্কার করিতে করিতে কন্যার শয়ন গৃহে আসিলেন। কন্যাকে ভূমিতলে শায়িত দেখিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘আমাকে আর কত যন্ত্রণা দিতে চাস। কাল সমস্ত দিনে তুই কিছুই খাস নাই, আমি প্রাতে উঠিয়াই তোর জন্য চারিটি আতপ চাউলের ভাত রাঁধিয়াছি। তুই দুটা না খাইলে আর আমার মনের কষ্ট দূর হয় না।’

সুদক্ষিণা বলিল ‘মা! বাবা কী ঔষধ খাইতে দিলেন, সেই ঔষধ খাইবার পর আমার বড় অসুখ করিতেছে। আমার বমি উঠিতেছে। আমি আর উঠিতে পারি না। আমি এখন আহার করিতে পারিব না। তুমি আমাকে একটু বাতাস কর।’

কন্যার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহার মনে তখনই এই সন্দেহ উপস্থিত হইল যে হয়তো তর্কপঞ্চানন কন্যাকে বিষ খাওয়াইছেন। তর্কপঞ্চানন তখন গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী সত্বর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘সুদক্ষিণাকে কী ঔষধ খাইতে দিয়াছ, সে যে ছটফট করিতেছে।’

তর্কপঞ্চানন গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ‘কাল রাত্রেই সুদক্ষিণার বড় জ্বর হইয়াছিল। সে জ্বরটা ভাল নয়, বিকার সংযুক্ত জ্বর বলিয়া বোধ হইল,—আজ আবার জ্বর বিকারই বা হইয়া থাকিবে—তোমার তো কিছুই বোধ নাই, এত সকালে ওকে স্নান করিতে দিলে কেন?’

ব্রাহ্মণী বলিলেন—‘বিকার না তোমার মাথা!’

দেখিতে দেখিতে সুদক্ষিণার যাতনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী শিরে করাঘাত পূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—‘তোমার মন কি ঈশ্বর পাষাণ দিয়া গড়িয়াছিলেন? সত্য সত্যই মেয়েটাকে বিষ খাওয়াইলে?’

তর্কপঞ্চানন তাড়াতাড়ি স্ত্রীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। সুদক্ষিণা একেবারে বিস্ময়াপন্ন নেত্রে পিতা এবং মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষ ধীরে ধীরে যেন মাতার কথার অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি পূর্বেও অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে হিন্দু বিধবাগণের চরিত্র নষ্ট হইলে তাহাদের পিতা এবং শ্বশুর অথবা আত্মীয় স্বজনেরা লোকলজ্জা নিবারণার্থ বিষ প্রদান পূর্বক তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করে। সুতরাং এখন তাহার বোধ হইল যে পিতা তাহাকে বিষপ্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ইহাতেও তাহার পিতৃভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইল না। তাহার পিতা কবিরাজ আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—‘বাবা! কবিরাজের প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যু হইলেই ভাল।’

তাহার জননীর মুখে আর কথা নাই। কন্যার অবস্থা দেখিয়া তিনি শোক ও দুঃখে একেবারে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন; ভূতলশায়িনী কন্যার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সজলনেত্রে কন্যার সেই নিষ্কলঙ্ক, সরলতা পরিপূর্ণ মুখ খানির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তর্কপঞ্চানন কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

অত্যল্পকাল মধ্যে সুদক্ষিণার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন সে আপনার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া আজ হৃদয় কপাট একেবারে খুলিয়া দিল।

চির প্রচলিত কুৎসিত দেশাচার নিবন্ধন হিন্দু যুবতীগণ পতির সম্বন্ধীয় কোনো কথা পিতা মাতার সম্মুখে কখনো মুখে আনে না। তাহাদিগের হৃদয়াগুণ গোপনে গোপনে হৃদয় মধ্যেই জ্বলিতে থাকে। কিন্তু সুদক্ষিণার এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখন আর তাহার লজ্জা নাই। বিশেষতঃ অত্যধিক শারীরিক যন্ত্রণা প্রযুক্ত প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন। এখন কেবল হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অকপটে মনের সকল কথা বলিতেছেন। বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার শ্রবণ কর বঙ্গীয় বাল-বিধবা মৃত্যুকালে কী বলিতেছে। আর কী বলিবে। বৈধব্য যন্ত্রণা নিবন্ধন প্রতিদিন যাহা চিন্তা করিত এখন তাহাই বলিতেছেন—

‘বাবা আমার বাঁচিয়া কোনো ফল না।—আমার মৃত্যুই ভাল—বাবা! আমাকে বিদায় দেও— (হস্ত প্রসারণ পূর্বক পিতার চরণ ধরিয়া)— বাবা! তোমার শ্রীচরণ আমার মাথায় রাখ—আশীর্বাদ কর যেন পরলোকে যাইয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমি পাপীয়সী—আমি রাক্ষসী—তাই তিনি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন—তাই আমি এমন রত্ন হারাইয়াছি। বাবা! এ সংসারে আমার কোনো সুখ নাই—বড় হইবার পর আমি একটি

দিন সুখে কাটাই নাই—বিধবার সংসারে কী আছে? এসংসারে আমার কাছে সকলই অন্ধকার— স্বামীই স্ত্রীর চক্ষু। আহা তিনি যত দিন বাঁচিয়াছিলেন তখন বুঝিতে পারিলাম না তিনি কী ধন—বুঝিতে পারিলে কী আর তাঁহাকে ছাড়িতাম। সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন—আমি না বুঝিয়া তাঁহাকে কষ্টা দিয়াছি—তবু একটি দিনও আমার উপর রাগ করেন নাই— মুখে তাঁহার সর্বদাই হাসি ছিল। তিনি কত কত পুঁথি পড়িতেন— পুঁথি পড়িবার সময় আমি তাঁহার কাছে বসিলে তিনি ভালবাসিতেন—হায়! হায়! আমি হতভাগিনী—আমি রাক্ষসী। তাঁহার কাছে বসিতে তখন আমার ইচ্ছা হইত না—পলাইয়া শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিতাম—মনে করিতাম শাশুড়ীর কাছে বসিলে আর তিনি ডাকিয়া নিতে পারিবেন না—আহা কত অপরাধই তাঁহার চরণে করিয়াছি—আমি কি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব? আর কি তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার অবাধ্য ছিলাম—তাঁহার চরণে চির অপরাধিনী—তাই তিনি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে আছেন— তিনি তো কখনো কোনো পাপ করেন নাই—তিনি অবশ্য স্বর্গে আছেন—আমি আর এখন তাঁহার অবাধ্য হইব না—অহোরাত্র তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিব—তাঁহার ভালবাসার কথা মনে হইলে আমার বুক ফাটিয়া যায়—এক দিন শাশুড়ী বাড়ী ছিলেন না— তিনি চুপি চুপি আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে আসিলেন—আমার হাত ধরিয়া তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গেলেন—আমার বড় ভয় হইল। তিনি রামায়ণ পড়িতে ভালবাসিতেন—আমাকে বলিলেন— শোন, সীতা রামের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া রামকে কি বলিতেছেন— এই বলিয়া তিনি পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলেন— আমাকে অর্থ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আহা! কি সুন্দর তাঁহার মুখে শুনাইত? সকলেই তাঁহার পড়া শুনিয়া তুষ্ট হইত। সেই সীতার কথা আমাকে মুখে মুখে পড়িতে বলিলেন—সংস্কৃত কথা আমার উচ্চারণ হয় না দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'তুমি এদেশের প্রধান পণ্ডিতের কন্যা হইয়া এই সহজ কথাটা উচ্চারণ করিতে পারনা? —এই শ্লোকটা তোমাকে মুখস্থ করিতে হইবে'—আমার বড় লজ্জা হইল—অনেকবার তাঁহার মুখে পড়িয়া সে শ্লোক মুখস্থ করিলাম। তিনি শ্লোকের অর্থ বলিয়া দিলেন—আহা! কী সুন্দর শ্লোক—কী সুন্দর কথা—তাঁহার মৃত্যুর পর আমি এ শ্লোক প্রত্যেক রাত্রে মনে মনে পড়িয়াছি—শ্যামার সঙ্গে একত্র হইয়া কতবার এ শ্লোক পড়িয়াছি—বড় সুন্দর শ্লোক—

যস্ত্বয়া সহ সঃ স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম! ময়া সহ—

সীতাই ধন্য। তিনি রামকে বলিয়াছিলেন যেখানে তোমার সঙ্গে একত্র থাকি সেই আমার স্বর্গ—তোমা বিনা যেখানে থাকি সেই নরক—ঠিক কথা—শ্যামাও বলিয়াছে যে এ ঠিক কথা—স্বামীর সঙ্গে বৃক্ষতলে থাকিলেও স্বর্গ—আমি পাপীয়সী—আমি রাক্ষসী—তাই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলাম না—তাই স্বামীকে ছাড়িয়া এখানে

রহিয়াছি—সীতা পুণ্যবতী—স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন—বাবা বিদায় দেও—আমি স্বামীর কাছে যাই—তিনি আমার স্বর্গ—তিনি আমার সর্বস্ব—তিনি আমাকে অপরাধিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে না—তিনি তো আমার প্রতি কখনো রাগ করেন নাই—সর্বদাই হাসিয়া হাসিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিতেন—আহা! তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে কী কথাই শুনাইলেন—এমন সুন্দর কথা আর শুনি নাই। তিনি তো এখানে আসিয়াই তিন দিনের জ্বরে স্বর্গে গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় যখন এখানে আসিতেছিলেন—সঙ্গে অন্য কোনো লোক ছিল না—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুঁথি সর্বদাই থাকিত—যেখানে যাইতেন পুঁথিগুলি সঙ্গে করিয়া লইতেন। নৌকায় আমার কাছে পুঁথি পড়িতে লাগিলেন—আমাকে বলিলেন শোন, বালীর মৃত্যুর পর তারা রামকে কী বলিয়াছিল। তারা বলিয়াছিলেন 'হে রামচন্দ্র যে বানদ্বারা আমার স্বামীকে মারিয়াছ সেই বানদ্বারা আমাকেও বধ কর—ইহাতে তোমার স্ত্রী হত্যার পাপ হইবে না—কন্যাদানের ফল হইবে'—বাবা! আমার মৃত্যুতেও তোমার কন্যাদানের ফল হইবে। আমি আজ পরলোকে যাইয়া তাঁর সেই হাসিভরা মুখখানি দেখিব। এবার তিনি রাগ করিলেও তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া থাকিব। বাবা শ্যামাকে ডাক—আমি তাহাকে একবার দেখিয়া যাই—আজ আমি স্বামীর বাড়ী যাইতেছি—আর স্বামীকে ছাড়িয়া এখানে আসিব না—তাই শ্যামার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া যাই—(এই কালে মাতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র)—মা শ্যামাকে ডাক—মা তুমি কাঁদিও না। আমি স্বামীর কাছে যাই—আমাকে বিদায় দেও—আর আমার জন্য প্রতিদিন তোমাকে কাঁদিতে হইবে না। আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমি কেবল তোমার দুঃখ যন্ত্রণার কারণ—আমার দ্বারা তোমার সুখ হইল না।'

এই বলিতে বলিতে প্রায় কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। জিহ্বা ও কণ্ঠ একেবারে পরিশুষ্ক হইল। স্থিরনেত্রে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন—বোধ হইল যেন এখন তিনি মৃত স্বামীকে দেখিতেছেন—তখন অতি কাতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে স্বামীকে সম্বোধন পূর্বক অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—নাথ আমাকে পরিত্যাগ করিও না।—আমাকে নরক হইতে কাছে লইয়া যাও—আমি তোমার চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি—দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর—চিরদাসী করিয়া রাখ—আমি তোমার স্ত্রী হইতে চাহি না—দাসী হইয়া তোমার কাছে থাকিব—এবার যাহাতে তোমাকে সুখী করিতে পারি তাহাই করিব—প্রাণ দিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারিলে প্রাণ দিব—তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব—মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া হইব না—না বুঝিয়া অনেক কষ্ট দিয়াছি।—স্বামী যে কী ধন তাহা তখন বুঝি নাই। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর। বড় হইবার পর তোমাভিন্ন আর কিছু জানি না। তোমার সেই হাসিভরা মুখখানি আমরবুকের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়াছি—দিবারাত্র তোমাকে চিন্তা করিয়াছি—হাঁটিতে চলিতে তোমাকেই দেখিয়াছি—তুমিই আমার

স্বর্গ— তুমিই আমার সর্বস্ব।—তোমাভিন্ন এ সংসারে সকলই আমার কাছে অন্ধকার— দাসীকে গ্রহণ কর—তোমার চরণে স্থান দেও—'

অতি কষ্টে হস্ত প্রসারণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরীর ক্রমেই অবশ হইতেছে, হাত উঠাইতে পারিল না,—'আমাকে ধর—গ্রহণ কর—গ্র—হ'

এই দ্বিতীয়বার গ্রহ—বলিবামাত্র কণ্ঠরোধ হইল। মুখ হইতে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, বাল বিধবার নির্মলাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিল, বৈধব্য যন্ত্রণা দূর হইল। মৃত্যুকালে আবার যেন হস্ত উত্তোলন করিবার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু হাত দুইখানি পূর্বেই একেবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় যেন পরলোকগত স্বামীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঝাঁপ দিয়া স্বামীর প্রসারিত ক্রোধের মধ্যে লুক্কাইত হইল।

সুদক্ষিণার মৃত্যুর পূর্বে সে শ্যামাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা আর শ্যামাকে সংবাদ দিলেন না। শ্যামা লোক মুখে সুদক্ষিণার মৃত্যুকাল উপস্থিত, এই কথা শুনিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিলেন। শ্যামা কখনো প্রায় ঘরের বাহির হইতেন না, কিন্তু আজ শ্যামার আর লোক লজ্জাভয় রহিল না। স্বীয় পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি চলিয়া আসিলেন। সুদক্ষিণার নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় তাঁহার স্পন্দরহিত ক্ষুদ্র দেহখানি মাতৃক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে। তাঁহার মাতা কন্যার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া নানা প্রকার বিলাপ ও আর্তনাদ করিতেছেন। শ্যামার হৃদয় স্নেহ দয়া ও পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। সে পাগলিনীর ন্যায় সুদক্ষিণার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—আমার প্রাণের সখি ! দুঃখভাগিণী ! আমাকে না বলিয়াই চলিয়া গেলে—আমাকেও তোমার সঙ্গে করে লইয়া যাও।'

তর্কপঞ্চানন শ্যামাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। এবং অত্যন্ত বিরক্তিভাব প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে সুদক্ষিণার নিকট হইতে টানিয়া একটু দূরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বারম্বার উঠিয়া সুদক্ষিণার মৃত দেহের নিকট যাইতে লাগিলেন; বারম্বার সেই স্পন্দরহিত মুখের উপর স্বীয় মুখ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা এক এক বার সুদক্ষিণার গলা জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন; তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী শ্যামার গলা ধরিয়া তখন হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

এ দিকে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কপঞ্চানন কবিরাজকে বলিলেন, কাল রাত্রেই জ্বর বিকারের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, প্রাতে ভাল অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর ডাকিতে পাঠাইলাম না; কিন্তু বেলা চারিদণ্ডের সময়ই আবার প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিল, পরে দেখিতে না দেখিতে এই দশা উপস্থিত হইয়াছে।'

কবিরাজ মহাশয় সুদক্ষিণার মৃত শরীরের অবস্থা দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে সহজেই

সমর্থ হইলেন। ইনি একজন বৈদ্যের সন্তান। চিকিৎসা বিষয়ে অধিক পারদর্শিতা না থাকিলেও গ্রাম্য লোকদিগকে চিরকাল এই সকল কুকার্যের সহায়তা করেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে 'শতমারি ভবেৎ বৈদ্য সহস্যমারি চিকিৎসকঃ' কবিরাজ মহাশয়ের হয় তো আজ পর্যন্ত এক শত রোগী জোটেও নাই। সুতরাং এক শত লোকের প্রাণ বিনাশ না করিলে যখন বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হয় না, তখন অগত্যা কবিরাজ মহাশয়কে এক শত নর হত্যা পূর্ণ কবিরার নিমিত্ত এই রূপেও অনেকের প্রাণ বিনাশ করিতে হইয়াছে। তর্ক-পঞ্চাননের গৃহ হইতে প্রস্থান কালে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'মহাশয় সত্বর সত্বর ইহার দাহের আয়োজন করুন। আজ কাল এই এক নূতন জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এরোগ কিছু সংক্রামক। যে বাড়িতে একজনের এই রোগ হয়, সেই বাড়িতে অন্য লোকের এই রোগ হইতে পারে।'

এই কথা শুনিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় তৎক্ষণাৎ টোলের শিষ্যগণকে সুদক্ষিণার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে বলিলেন। টোলের কয়েকটি ছাত্র একত্র হইয়া সেই নির্মলাত্মা সুদক্ষিণার স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় ক্ষুদ্র দেহখানি দুই ঘণ্টার মধ্যে ভস্মীভূত করিল।

সন্তানবৎসলা ব্রাহ্মণী সমস্ত দিনরাত্র ধরাতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৃহস্থিত সকলেই গঙ্গার ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহের যে স্থানে সুদক্ষিণা শুইয়াছিল, ব্রাহ্মণী সেই স্থানেই ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া তাঁহাকে স্নান করাইবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি স্নান আহার কিছুই করিলেন না। হিন্দুদিগের নিয়ম অনুসারে মৃত শব স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে হয় সুতরাং আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া ব্রহ্মণীকে ক্রোড়ে করিয়া বাহিরে আনিল। তর্কপঞ্চাননের টোলের দুইটি ছাত্র গঙ্গার ঘাট হইতে দুই কলসী জল আনিয়া দিল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা সেই জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিলেন। তিনি বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক আর একখান বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্বক মৃত্তিকার উপর শুইয়া রহিলেন। অনেক কষ্টে স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া শয্যার উপর রাখিলেন।

যে দিবস সুদক্ষিণার মৃত্যু হইল সেই দিন দিবারাত্র মধ্যে তাহার জননী আহার করা দূরে থাকুক জলস্পর্শও করিলেন না। তৎপর দিবস আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেই তিনি হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন—'আমি আবার আহার করিব—বাছা আমার একাদশীর উপবাসের পরদিন আহার করিয়াও গেল না,—বাছা আমার উপবাসিনী চলিয়া গিয়াছে—বাছার জন্য আমি প্রাতে উঠিয়া ভাত রাঁধিয়া ছিলাম—' এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণী অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন।

ক্রমে দুই তিন দিন গত হইল। তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী এ পর্যন্ত এক বিন্দু জলও পান করিলেন না। তর্কপঞ্চানন নিজে কখনো তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহার শোকানল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। তখন তিনি উন্মত্তার ন্যায় কোপাবিষ্ট হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন 'এ চণ্ডালের অন্ন—এ প্রাণ যার যাউক, আমি আর চণ্ডালের অন্ন স্পর্শ করিব না। এ চণ্ডালের গৃহ হইতে বাছা আমার উপবাসিনী চলিয়া গিয়াছে—হা

ঈশ্বর ! নির্জলা একাদশীর উপবাসের পরদিন বাছা আমার চলিয়া গেলরে—আমি কাহার জন্য ভাত রাঁধিয়াছিলাম ?'

তর্কপঞ্চানন পরে আর ভয়ে ব্রাহ্মণীকে কখন আহার করিতে অনুরোধ করিতেন না। ক্রমে পাঁচ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। পঞ্চম দিবসের পর ব্রাহ্মণী অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন ঝিনুক করিয়া আত্মীয়স্বজন তাঁহার মুখে একটু একটু দুগ্ধ দিতে লাগিল। যখন অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন তখন দুই এক ঝিনুকে দুগ্ধ গিলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু পুনর্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেই আর কেহ কিছু তাঁহার মুখে দিতে পারিত না। ষষ্ঠ দিবস তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তখন কবিরাজ আসিয়া বলিলেন—'ইহার জীবনের আশা একেবারেই নাই। বোধ হয় অদ্য সন্ধ্যার পূর্বেই ইঁহার মৃত্যু হইবে।'

কবিরাজের এই কথা যখন ব্রহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তখ ন তিনি নিজের আসন্ন মৃত্যু অনুভব করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন— হে পরমেশ্বর এ জীবনে তো আমার আর কষ্টের কিছুই বাকি রহিল না, কিন্তু আবার যদি এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় তবে যেন আমার গর্ভে আর কন্যা সন্তান না জন্মে।' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণী একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; এবং বারম্বার উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—'হে বিধাতা পুরুষ, ব্রাহ্মণ কুলে যেন আর কাহারও কন্যা সন্তান না জন্মে—ব্রাহ্মণকুলে যেন কন্যা না জন্মে—ব্রাহ্মণ কুলে যেন কন্যা জন্মে না'—এ নিদারুণ যন্ত্রণা কি কেহ সহ্য করিতে পারে ?— কে পারে ?—কে পারে ? দেখ—দেখ—আমার বুকে একবার হাত দিয়া দেখ, এ বুক জ্বলিয়া তো ছারখার হইয়াছে—' এই বলিয়া বুকের উপর করাঘাত করিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষাও নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

কবিরাজ বলিলেন যে বাতিকের কার্য একটু অধিক হইয়াছিল তাহাতেই এইরূপ সজোরে কথা বলিয়াছেন। এখন বাতিকের কার্য নিস্তেজ হইয়াছে। আর বড় বিলম্ব নাই ! ব্রহ্মণী ঠাকুরানীকে এখন নারায়ণক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারেন।

তর্কপঞ্চানন তখন স্ত্রীর কানের নিকট মুখ রাখিয়া বলিলেন—'তুমি এখন সেই দুর্গতি নাশিনী দুর্গানাম স্মরণ কর।' স্বামীর কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণীর চেতনা হইল—আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'চুলোয় যাউক তোমার দুর্গানাম—প্রতিদিন লক্ষবার দুর্গানাম জপ না করিয়া জল স্পর্শ করি নাই—সেই দুর্গানাম জপের কি এই ফল হইল ? —আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—বাছা আমার উপবাসী চলিয়া গিয়াছে—হে ঈশ্বর—হে ঈশ্বর—আর যদি পৃথিবীতে জন্ম হয়, ম্লেচ্ছ কুলে যেন আমার জন্ম হয়—মুসলমানের ঘরে যেন আমার জন্ম হয়—তা হইলে আর সন্তানের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ কুলে যেন আর জন্ম না হয়—কলির ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—চণ্ডাল হইতেও অধম—চণ্ডাল হইতেও নিষ্ঠুর—অধম—নিষ্ঠুর—অধম—নিষ্ঠুর—অধ—'

এই কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠাবরোধ হইল। দেখিতে না দেখিতে সন্তান বৎসলা সাধ্বী ব্রাহ্মণী এই কুৎসিত দেশাচার পরিপূর্ণ নরক সদৃশ বঙ্গ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অমৃতময়ের অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

পনের
বঙ্গ বিধবার চরিত্র সমালোচনা

কবিরাজ মহাশয় সুদক্ষিণার মৃত শরীর দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে পথি মধ্যে দুই একটি গৃহস্থের বাড়ী তামাক খাইতে বসিলেন। গৃহস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ‘কবিরাজ মশাই তর্কপঞ্চাননের কন্যার কিরূপ জ্বর হইয়াছিল?’ কবিরাজ মহাশয় প্রথমতঃ বলিতেন, ‘হাঁ, জ্বর বিকারই বটে।’ কিন্তু আবার চুপি চুপি বলিতেন—‘কিসের জ্বর বিকার হইয়াছিল?—মেয়েটা বোধ হয় ভ্রষ্টা হইয়াছিল, তাই নিজেই বিষ খাইয়া থাকিবে, কিম্বা আত্মীয় স্বজন কেহ বিষ খাওয়াইয়া থাকিবে।’

তর্কপঞ্চানন যদি এই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিতেন, তবে কবিরাজ হয় তো এই সকল কথা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন রূপনারায়ণ সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট হইতে। এ দিকে টোলের ছাত্র শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ভুলক্রমে এই রামরূপ সেন কবিরত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সুতরাং ইহাতেই গোলযোগ উপস্থিত হইল।

দুই দিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে প্রচার হইল যে, তর্কপঞ্চাননের কন্যা সুদক্ষিণা বিষপান করিয়া মরিয়াছে। এক এক জন বড় বড় গৃহস্থের বাড়ি যখন অপরাহ্নে পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের অধিবেশন হইত, তখন তাহারা সকলেই বলিতেন ‘বাবা! কলিকালের মেয়ে কেহ চিনিতে পারে না। তর্কপঞ্চাননের মেয়ে সুদক্ষিণার পেটে যে এত বিদ্যা ছিল, তাহা তো আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। মেয়েটিকে দেখিতে এত শান্ত শিষ্ট বলিয়া বোধ হইত যে, ওকে কেহ কোনো দিন সন্দেহও করে নাই। মেয়েটার মুখের কথা কেহ কোনো দিন শুনিতে পায় নাই। কখনো ঘরের বাহির হইত না। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, আমরা যে বুড়া বুড়া স্ত্রীলোক আমরা তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই। তার পেটে এত দুষ্টামি। এ কলিকালের মেয়ে চিনিয়া উঠা আমাদের অসাধ্য।’

কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারাই এই সকল কথা প্রকাশিত হইল। কিন্তু কুটিল লোকের প্রায়ই সত্যাসত্য নির্বাচন করিবার ক্ষমতা থাকে না। তর্কপঞ্চানন মনে করিতে লাগিলেন যে, শিরোমণির বিধবা কন্যা শ্যামাই এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। নিরপরাধিনী শ্যামার বিরুদ্ধে তর্কপঞ্চাননের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি হিংসা করিয়া শ্যামার নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিরূপে শ্যামার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা শিরোমণি ঠাকুরকে অপদস্থ করিবেন, তাহারই চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা হইতেই তর্কপঞ্চানন এবং শিরোমণি ঠাকুরের মধ্যে ঘোর শত্রুতার ভাব সমুপস্থিত হইয়াছিল।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে শিরোমণির নিকট যে দিন তাঁহার ছাত্র বামাচরণ দৌড়িয়া আসিয়া নবকিশোরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ করিবার অভিপ্রায়ে ভূমিকা করিতেছিল, তখন শিরোমণি ঠাকুর প্রথমতঃ বড় চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তাঁহার কন্যার বিরুদ্ধে তর্কপঞ্চানন আবার নূতন কোনো অপবাদ প্রচার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বামাচরণ যখন নবকিশোরের বিরুদ্ধে অপবাদের কথা বলিল, তখন বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহার সঙ্গে যাইয়া নবকিশোরের সর্বনাশ করিলেন।

শিরোমণির কন্যা শ্যামার চরিত্র অত্যন্ত নির্মল ছিল। শ্যামা কিরূপ পবিত্র চরিত্রা, তাহার অন্তরাত্মা কিরূপ ধর্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। কিন্তু এই দ্বেষ হিংসা পরিপূর্ণ নরকতুল্য বঙ্গদেশে অতি পবিত্র চরিত্রেও কেহ কলঙ্ক ঢালিয়া দিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

তর্কপঞ্চানন নিরপরাধিনী বঙ্গবিধবা শ্যামার বিরুদ্ধে ইচ্ছা পূর্বক স্থানে স্থানে অপবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের মধ্যে শ্যামাকে সকলেই কুপথগামিনী বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কে যে শ্যামাকে কুপথগামিনী করিল তাহা কেহই আজ পর্যন্ত জানেন না। সুতরং শিরোমণির উপর অন্য কোন সামাজিক উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইল না। কেবল তাহার কন্যা অসদাচারিণী বলিয়া লোকনিন্দা হইতে লাগিল। হা বঙ্গকুলাঙ্গারগণ! হা হীনবুদ্ধি বঙ্গ মহিলাগণ! এইরূপ মিথ্যা অপবাদ প্রচারদ্বারা যে বঙ্গসমাজ দিন দিন অধঃপতে যাইতেছে, তাহা কি তোমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখ না?

পাড়ার নাপ্তানি, রূপার মা, জগাইর মা প্রভৃতি একদিন অপরাহ্নে গ্রামের বিশেষ সম্ভ্রান্তা রমণী, কাসিমবাজারের রেসমের কুঠির দেওয়ান হরগোবিন্দ মুখজ্যার বিধবা ভগ্নী রাধামণি ঠাকুরানীর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধামণি ঠাকুরানীর এজলাসে এই সকল রমণীবৃন্দ সমাসীন হইলে পর, জগাইর মা শ্যামার কথা তুলিল। রাধামণি ঠাকুরাণী বলিলেন ‘এ হতভাগিনীদিগকে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। আমিও আট বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছি। কিন্তু তিন কাল গিয়াছে, আর এককাল আছে, আজ পর্যন্ত কখনো শুনিয়াছে যে, গ্রামের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কখন বলিতে পারিয়াছে?”

এই কথা শুনিয়া রূপার মা বলিল, ‘সকলে যদি আপনার মত সতী সাধ্বী হইত তবে আর ভাবনা ছিল কী। সেই জন্যই দিদি ঠাকুরানী আপনার এখানে আসিয়া বৈকালে একটু বসি। আর কোন বাড়ী বৎসরের মধ্যে একবারও যাই না।’

রাধামণি ঠাকুরানী বড়মানুষের ঘরের মেয়ে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হর-গোবিন্দবাবু রেসমের কুঠির দেওয়ান। তাঁহার মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা, কিন্তু উপরি পাওনা বিলক্ষণ ছিল। বৎসর বৎসর দেড় লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। কোম্পানির সাহেবেরা তাঁহাকে

বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। হরগোবিন্দবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দবাবু রেসমের কুঠির মুহুরি। মাসিক বেতন বার টাকা। কিন্তু তাঁহারও বার্ষিক আয় সত্তর হাজার টাকার ন্যূন হইবে না। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ঢাকার লবণের গোলার দেওয়ানি পাইতে পারেন। তাহাতে প্রায় এক লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা উপার্জন হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দেশ ছাড়িয়া বিদেশে থাকিলে দেশের তালুক জমি জমার তত্ত্বাবধারণ চলে না।

রাধামণি ঠাকুরানীর দুই ভাই যেন দুইটা ইন্দ্রিজিৎ। সুতরাং ইনি বড় মানুষের ঘরের মেয়ে। ইঁহার কথাগুলো কিছু লম্বা লম্বা; মহোচ্চ নৈতিক ভাব পরিপূর্ণ ছিল। ইনি বড় মানুষের ঘরের মেয়ে না হইলে এই ঘটনার পঁচিশ বৎসর পূর্বে ইঁহাকে বৈষ্ণবাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। ইঁহার চরিত্রে অশেষ দোষ ছিল। এখন ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু চরিত্র গত দোষ এখনও না আছে তাহা নহে। তবে পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ নাই। ইহার পূর্ব জীবনের ঘটনা সকল উল্লেখ করিতে হইলে এই উপন্যাস অশ্লীলতা পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে, পাঠিকাগণের অপাঠ্য হইবে। সুতরাং সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল ইনি বাড়ীর পাহারাওয়ালা জুলমত আলি চৌকিদারের সঙ্গে একত্র হইয়া একবার পলায়নের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কাসিমবাজার পর্যন্ত গেলে পরই ধরা পড়িলেন। রাধাগোবিন্দ বাবু সেই হইতে বাঙ্গালী মুসলমান চাকর রাখেন না। হিন্দুস্থানী দিগকে বাড়ীর পাহারার কার্যে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু রাধামণি ঠাকুরানী বড় মানুষের ঘরের মেয়ে, তিনি তো আর গরিব ব্রাহ্মণী নবকিশোরের মাতা নহেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হরগোবিন্দবাবু এবং রাধাগোবিন্দ বাবুর ঘরে বার চৌদ্দ হাজার টাকা বৎসর বৎসর পাইতেছেন। এইরূপ বড় লোককে কেহ একঘরে করিতে পারে না। সুতরাং রাধামণি ঠাকুরানী সদর্পে ভদ্র সমাজে বিচরণ করিতেছেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদের কথা শুনিলেই বলেন—'আমিও আট বৎসর বিধবা হইয়াছি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে তো কেহ কোনো কথা বলিতে পারে নাই; দোষ না থাকিলে লোকে কাহারও নিন্দা করে না।'

এই প্রকারে স্ত্রী সমিতি মধ্যে শ্যামার চরিত্র সমালোচিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা এখন রাধামণি ঠাকুরাণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া টোলের ছাত্রগণ যেরূপ শ্যামার চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

এক একটি টোলের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া নিরাপরাধিনী শ্যামার চরিত্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় যখন উপস্থিত না থাকিতেন, তখনই ইহার ঈদৃশ সমালোচনার বিলক্ষণ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। হরিদাস তর্কপঞ্চাননের টোলেই অনেক ছাত্র ছিল, তাহাদের একজন বলিলেন শ্যামার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কখনো মিথ্যা নহে। শ্যামার চরিত্র কখনো ভাল হইতে পারে না। শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হইবে নাকি? বিষ্ণু শর্মা বলিয়াছেন—

স্থানং নাস্তি ক্ষণো নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ
তেন নারদ! নারীণাং সতীত্ব মুপজায়তে*

দ্বিতীয় ছাত্র বলিলেন, ঠিক বলিয়াছে। শাস্ত্র কখনো মিথ্যা নহে। বিষ্ণু শৰ্ম্মা আরও বলিয়াছেন—

*ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিত্ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে
গাব স্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্*

তৃতীয় ছাত্রটা নিতান্ত অভদ্র। সে যে শ্লোক পাঠ করিয়া ছিল, তাহার প্রথম পুক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। কোনো পাঠকের ইচ্ছা হইলে তিনি এ শ্লোক হিতোপদেশে পাঠ করিবেন। এ জঘন্য শ্লোক উদ্ধৃত করিলে পুস্তক ভদ্র সমাজের অপাঠ্য হইবে।

সুবেশাং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদিবা সুতম্
* * * * *

টোলের ছাত্রগণ এইরূপ পুস্তকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নারী জাতির চরিত্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু যে দেশীয় লোকের নারীজাতি সম্বন্ধে ঈদৃশ কুসংস্কার রহিয়াছে, যাহারা নারী জাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহাদের জাতীয় জীবন যে নিতান্ত জঘন্য তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ নারীজাতির প্রতি অযথোচিত ব্যবহার, এবং নারীজাতির অবরুদ্ধাবস্থা। কেন নিরপধাধিনী সুদক্ষিণার মৃত্যু হইল ? কেন হরিদাস তর্কপঞ্চানন সুবল মিত্রকে তাহার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতে দেখিবামাত্র, কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাঙ্গালি জাতি স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধাবস্থায় রাখেন বলিয়া তাহাদের চক্ষেই এক প্রকার রোগ জন্মিয়াছে; তাহাদের মন কুসংস্কারপরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টি অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তর্কপঞ্চানন যে ঈদৃশ ভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সামাজিক কুনিয়মের অবশ্যম্ভাবী কুফল সমাজস্থ প্রত্যেক নরনারীর জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ যে জাতীয় লোকেরা নারী জাতি সম্বন্ধে ঈদৃশ কুৎসিত মত পোষণ করেন, তাহাদের মন যে নিতান্ত পৈশাচিক ভাবে পরিপূর্ণ তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য টোলের পণ্ডিতদিগের কথা দূরে থাকুক; পূর্বোক্ত শ্লোকের রচয়িতা এবং ইহার সংগ্রাহক বিষ্ণুশর্মার অন্তরাত্মা যে নরক সদৃশ ছিল তাহা তাঁহার সংগৃহীত এই শ্লোক চতুষ্টয় দ্বারাই বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষের অপেক্ষা নারী জাতির হৃদয় যে সমধিক পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ তাহা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না।

শতবর্ষ পূর্বে দেশের সামাজিক অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় ছিল বলিয়াই বঙ্গবাসিগণকে স্বীয় কুকার্যের প্রতিফল স্বরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গের যেরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল তাহাই এই দুই অধ্যায়ে বিবৃত হইল। এইরূপ সমাজে প্রকৃত দেশহিতষীর কখনো উদ্ভব হয় না। এইরূপ সামাজিক অবস্থা নিবন্ধন প্রত্যেক নরনারীর অন্তর নীচাশয়তার আধার হইয়া উঠে।

---

*হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের এই সকল ঘৃণিত মত প্রতিপাদক শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা পুস্তক অশ্লীলতা পরিপূর্ণ হইবে মনে করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

ষোল
অনাথা কন্যাত্রয়

সাবিত্রী ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর দুরবস্থা দর্শনে মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিল; ভাবিতে লাগিল এ সংসারের ধন সম্পত্তি সকলই অসার। দুই তিন বৎসর পূর্বে ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত আট-দশজন দাসদাসী নিযুক্ত ছিল; তিনি পাল্কী আরোহণে প্রত্যেক দিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন; কিন্তু আজ তাঁহার এই দুর্দশা হইয়াছে।

ছিদামের স্ত্রীর একখানি জীর্ণবস্ত্র পরিধান ছিল, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। আরাটুন সাহেবের পত্নীর প্রদত্ত চারি পাঁচখানি বস্ত্র সাবিত্রীর সঙ্গে ছিল। সে তাহা হইতে দুইখানি বস্ত্র ছিদামের স্ত্রীকে দিল। পরে তাহার নিকট বিদায় হইতে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সাবিত্রী অন্যান্য পথিকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। সে সর্বদাই সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। এইরূপ সমুদয় পথিকের পিছে থাকিবার দুইটি কারণ ছিল। সে দ্রুতপদে অনেকক্ষণ হাঁটিতে পারি না, সুতরাং ধীরে ধীরে চলিত। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাপূর্বক অন্যান্য পথিক হইতে কিছু দূরে থাকিতে ভালবাসিত। সে অবলা, কী জানি একত্রে কাহারও সঙ্গে চলিলে পাছে কেহ দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া তাহার ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত যে সকল পথিক অগ্রে অগ্র চলিতেছিল তাহারা সম্মুখস্থ বাজারে প্রবেশপূর্বক রাত্রে বিশ্রাম করিবার আয়োজন করিতেছে। সাবিত্রী এখনও বাজার হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। সে সম্মুখে একটি বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল। বাজার এই বট বৃক্ষ হইতেও প্রায় চারি পাঁচ শত হাত দূরে রহিয়াছে। আর হাঁটিতে পারে না। মনে করিল এই বট বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম করিয়া পরে বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিবে। বৃক্ষতলে পৌঁছিবামাত্র সেখানে তিনি কন্যা দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে একটির বয়স সাত বৎসরের অধিক হইবে না। দ্বিতীয়টির বয়স প্রায় এগার-বার বৎসর হইবে। তৃতীয়টি অত্যন্ত জীর্ণা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন ষোল বৎসর হইবেক। কিন্তু সে ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বোধহয় যেন তাহার আর উত্থান শক্তি নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া সাবিত্রী মনে করিল যে, হয় তো ইহারও পথিক হইবে; অতএব বাজারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এ বৃক্ষতলে ইহাদিগের সঙ্গে একত্রে অনায়াসে রাত্রি যাপন করিতে পারিব। এই

ভাবিয়া সে বৃক্ষতলে ইহাদিগের নিকট বসিল। কিন্তু ইহাদিগের নিকটে আসিবামাত্র দেখিল যে ইহারা তিন জনেই অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। ষোড়শ বৎসর বয়স্কা যুবতী বলিতেছে, 'হা পরমেশ্বর এখন আমার মৃত্যু হইলে ইহাদের কী অবস্থা হইবে?'

সাবিত্রী ইহাদিগের নিকট আসিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক বসিয়া রহিল। ইহাদিগকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। ইহারাও সাবিত্রীর নিকট সহসা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। কিছুকাল পরে সেই ষোড়শ বৎসর বয়স্কা যুবতী অতি ক্ষণস্বরে সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কোথায় যাইবেন—'

সাবিত্রী। আমি কলকাতা যাইব।

যুবতী মনে ভাবিল, হয়তো ইনিও আমার ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিবেন, প্রকাশ্যে বলিল, 'আপনাকে ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া বোধ হয়; একাকিনী কলিকাতা যাইবেন?'

সাবিত্রী। বিপদে পড়িলে মানুষ কি না করিতে পারে?

যুবতী। আমিও ভাবিতেছিলাম যে আপনিও বা আমাদের মত দূরবস্থায় পড়িয়া থাকিবেন। আপনার পিতা কি লম্বণের কারবার করিতেন?

সাবিত্রী। না আমি তাঁতির মেয়ে। কোম্পানির লোকেরা দাদনের নিমিত্ত আমাদের বাড়ী ঘর লুটিয়া নিয়াছে।

যুবতী। কোম্পানির লোকেরা কি সকলের বাড়ীই লুটিতেছে! আমি ভাবিয়াছিলাম, যাহারা কেবল লবণের কারবার করিতেছেন, তাহাদেরই সর্বনাশ।

সাবিত্রী। আপনাদের বাড়ীও কি কোম্পানি লোকেরা লুটিয়াছে?

যুবতী। হা পরমেশ্বর! আমাদের কি কেবল বাড়ী লুটিয়াছে? আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে, আমাদের জাতি মান সকলই গিয়াছে। আমাদের বাবাকে নাকি কলিকাতার জেলে কয়েদ রাখিয়াছে।

সাবিত্রী। আপনাদের বাড়ী কোথায়?

যুবতী। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর কথা তো শুনিয়াছেন, সেই রাজবাড়ী হইতে আমাদের বাড়ী একদিনের রাস্তা। কলিকাতার জেলে আপনার কোনো আপন লোক কয়েদ রহিয়াছে নাকি?

সাবিত্রী। আমার বড় ভাই এবং আমার স্বামীকে নাকি কলিকাতার জেলে রাখিয়াছে।

যুবতী। হা ঈশ্বর তুমি কি এ সংসারে নাই! কোম্পানির লোকের এ অবিচার কি তুমি দেখ না?

সাবিত্রী। আপনার পিতাকে কী জন্য কোম্পানির লোক কয়েদ রাখিয়াছে?

যুবতী। সে সকল কথা আর কী বলিব? আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। আমাদের জাতি মান টাকা কড়ি সব গিয়াছে—ঘর বাড়ী সব গিয়াছে।

এই বলিয়া যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে সবিস্তারে আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে লাগিল।

সময় সময় তাহার কণ্ঠাবরোধ হইতে লাগিল। আত্মবিবরণ বলিবার সময় এ যুবতী যাহা কিছু বলিয়াছিল তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গীয় পাঠিকাগণের হৃদয় স্বভাবতঃই দয়াপ্রবণ। যুবতী যেরূপ কাতরকণ্ঠে এবং করুণস্বরে আত্মবিবরণ বর্ণনা করিল, তাহা তাহার নিজের ভাষায় লিখিলে পাঠিকাগণ কখনো ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না।

এই যুবতীর নাম অন্নপূর্ণা। ইহার সঙ্গিনী অপর দুইটি বালিকা ইহার কনিষ্ঠা সহোদরা। তাহাদের মধ্যের বড়টির নাম জগদম্বা, ছোটটির নাম অহল্যা। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কোনো একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে মদন দত্ত নামে একজন লবণ ব্যবসায়ী ছিল। ইহারা তিন জনই সেই মদন দত্তের কন্যা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর* লবণের কারখানা ছিল। মদন দত্ত এবং অন্যান্য অনেক জিলার লবণ ব্যবসায়িগণ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরির কারখানা হইতে লবণ ক্রয় করিয়া বাণিজ্য করিতেন মদন একজন সম্ভ্রান্ত বণিক ছিল; তাহার চারি পাঁচ হাজার টাকার কারবার ছিল।

লর্ড ক্লাইব লবণের একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিলে পর কলিকাতায় যে ইংরাজ বণিকসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই বণিকসভার অধ্যক্ষগণ যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার ও অবৈধ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে। সেই বণিকসভার দৌরাত্ম্য নিবন্ধন লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী তাঁহার লবণের কারখানা উঠাইয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন যেবার আনা মূল্যে ইংরাজ বণিক সভার নিকট একমণ লবণ বিক্রয় করিতে হইলে কিছুই লাভ থাকে না। সুতরাং লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ইংরাজগণ চিরকালই বাঙ্গালীর কথা অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা মনে করলেন যে লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী গোপনে গোপনে লবণ প্রস্তুত করিয়া দেশীয় বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। ইংরাজ বণিকসভার কর্মচারিগণ এইরূপ সন্দেহ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর প্রধান গোমস্তা সাগর পোদ্দারকে ধৃত করিলেন। বেরেলষ্ট এবং সাইক সাহেবের গোমস্তাগণ সাগর পোদ্দারকে ধৃত করিবার সময় তাহার বাড়ী পর্যন্ত লুঠ করিল; এবং বারম্বার তাহাকে প্রহার পূর্বক ধমকাইতে লাগিল যে, এ বৎসর লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কারখানা হইতে যে সকল লোক লবণ ক্রয় করিয়া নিয়াছে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে হইবে। সাগর বারম্বার বলিল যে ‘চৌধুরী মহাশয় লবণের কারবার একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন।’

বণিকসভার গোমস্তাগণ যখন দেখিল সাগর কাহারও নাম প্রকাশ করিল না, তখন তাহাকে কলিকাতা জেলে প্রেরণ করিলেন। বণিকসভার কলিকাতাস্থ কর্মচারিগণ বেরেলষ্ট সাহেবের আদেশানুসারে সাগরের নিকট হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কারখানা হইতে

---

* Vide note (15) in the appendix.

পূর্ব পূর্ব বৎসর যাহারা লবণ ক্রয় করিয়াছিল তাহাদের নামের এক ফর্দ চাহিয়া লইলেন। সেই ফর্দের মধ্যে বর্দ্ধমান জিলার মদন দত্ত এবং অন্যান্য অনেক লোকের নাম ছিল। বণিক সভার অধ্যক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন জিলাস্থ লবণের গোলার এজেণ্ট সাহেবদিগের নিকট প্রাগুক্ত ফর্দে লিখিত লবণ ব্যবসায়িদিগের খানা তল্লাস করিতে আদেশ করিলেন। তখন বর্দ্ধমানের লবণের গোলার এজেণ্ট জনষ্টোন সাহেব। তিনি মদন দত্তের খানা তল্লাস কবিরার হুকুম প্রাপ্ত মাত্র দেওয়ান ভবতোষ বাঁড়ুয্যা এবং অন্যান্য প্যাদা বরকন্দাজ ও সিপাহিদিগকে মদনের খানা তল্লাসি করিতে প্রেরণ করিলেন। ইহারা মদনের খানা তল্লাস করিয়া তাহার গৃহ তিন সের মাত্র লবণ প্রাপ্ত হইলেন। গৃহস্থের গৃহে চারি পাঁচ সের লবণ দৈনিক খরচের নিমিত্ত সর্বদাই মজুত থাকে। কিন্তু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনষ্টোন সাহেব তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিলেন যে মদন নিশ্চয়ই গোপনে লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর গোমস্তার নিকট হইতে এখনও লবণ ক্রয় করিতেছেন, নহিলে এত লবণ কি কখনো গৃহস্থের ঘরে ব্যবহারের নিমিত্ত মজুত থাকে? তাঁহারা আরও বলিলেন যে, ব্যবহারার্থ লোকের যে লবণের প্রয়োজন হয় তাহা তাহারা প্রতিদিন বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে। সুতরাং অবস্থা ঘটিত প্রমাণের দ্বারা মদনের দোষ নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণিত হইল। কিন্তু ইংরাজী বিচার প্রণালী মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হইলেই তাহারা অপরাধীকে সন্দেহের ফল প্রদান করেন। মদনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা তাহার তদন্ত আরম্ভ হইল।

জনষ্টোন সাহেব আহার করিতেছেন। আজিমালি খানসামা একটা মুরগীর রোষ্ট বাসনে করিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহেব বিশেষ কার্যদক্ষ। তখনই মদনের অপরাধ তদন্ত করিতে লাগিলেন। তিনি আজিমালির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর ঘরে খাওয়ার নিমিট্ট রোজ রোজ কট লবণ কেনে?' আজিমালি বলিল, 'হুজুর! এক এক হাটবারে আমার কবীলা এক এক পোওয়া লবণ আনাইয়া রাখে। তাতেই সাত-আট দিন খুব চলে, সাত দিনের পূর্বে আর লবণ আনাইতে হয় না।' সাহেব বলিলেন, 'ঠিক কটা টো বল্‌ছিস্?'

আজিমালি বলিল 'হুজুর! জান গেলেও মিথ্যা কতা বলব না। আজ্ঞ আমার বাপ দাদা সাতপুরুষের মধ্যেও কেহ কখনো মিথ্যা কথা বলে নাই।'

মদন দত্তের গোপনে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের অপরাধ আজিমালির জবানবন্দি দ্বারা একেবারে সপ্রমাণিত হইল। আজিমালির কবীলা যখন সপ্তাহে সপ্তাহে হাটের দিন এক পোয়া লবণ ক্রয় করিয়া গৃহ যাত্রা নির্বাহ করিতেছে, তখন যে বঙ্গদেশের সমুদয় লোক সপ্তাহে সপ্তাহে হাটবারে এক পোয়া লবণ ক্রয় করিয়া গৃহ কন্না চালাইয়া থাকে এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা মদন দত্তের গোপনে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের অপরাধ সাব্যস্ত

হইল। জনষ্টোন সাহেব বণিকসভার অধ্যক্ষের নিকট রিপোর্ট করিলেন যে, নিয়মিত ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালিদিগের গৃহে যে পরিমাণ লবণ থাকে, তদপেক্ষা বারগুণ অধিক পরিমাণ লবণ মদনের গৃহে খানাতল্লাসে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মদন দত্ত গোপনে লবণ ক্রয় বিক্রয় করিতে ছিল; নহিলে এত লবণ কখনো তাহার গৃহে পাওয়া যাইত না। বিশেষতঃ তাহার দেষ সাক্ষ্য বাক্য দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

এ দিকে মদন দত্তের খানাতল্লাসের সময় তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণ পলায়ন পূর্বক এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। খানাতালাসের সময় কুঠির গোমস্তা এবং প্যাদা বরকন্দাজ ও সিপাহিগণ ঘরের মধ্যে মূল্যবান যাহা কিছু পাইত তৎসমুদয়ই আত্মসাৎ করিত। ঘরের বাক্স সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া টাকাপয়সা সমুদয় অপহরণ করিত। এখন যদ্রূপ পুলিশ অফিসারদিগের মধ্যে যে সকল লোক উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাহারা একটা খুনি মোকদ্দমার তদারকের ভার প্রাপ্ত হইলে, মন মনে বড়ই আনন্দিত হয়েন, তাহাদের দশ টকা রোজগারের সুযোগ হয়, সেইরূপ এই সময় খানাতালাসি পরওয়ানা পাইলে লবণের অফিসের গোমস্তা ও প্যাদাগণের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

মদন দত্তের খানাতালাসের সময় তাহার ঘরে যে কিছু মূল্যায়ন জিনিসপত্র ছিল, তৎসমুদয়ই গোমস্তা প্যাদা ও সিপাহিগণ আত্মসাৎ করিল।

খানাতালাসের পর দিন মদন দত্তের স্ত্রী স্বীয় কন্যাত্রয়কে সঙ্গে করিয়া সেই শূন্য বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলিতে লাগিল—'ইদের ঘরে যখন কোম্পানির সিপাহি ও প্যাদা প্রবেশ করিয়াছে তখন অবশ্যই ইহাদের জাতি গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল যে, মদন দত্তের স্ত্রীকে এবং বড় কন্যাকে কোম্পানির সিপাহিগণ বেইজ্জত করিয়াছে।'

মদন দত্তের স্ত্রী ও কন্যাত্রয় জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

হা পরমেশ্বর এই নরক তুল্য বঙ্গদেশে—এই জঘন্য সমাজেও—মনুষ্যকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়! অত্যাচার নিপীড়িত মদন দত্তের পরিবারের প্রতি গ্রামস্থ লোকে কোনো সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; কিন্তু তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিল।

মদন দত্তের স্ত্রী ও কন্যাগণ জাতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় গৃহে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি কোম্পানির গোমস্তা ও প্যাদাগণ লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে। কিরূপে যে তাহারা দিনাতিপাত করিবে তাহার কোনো সংস্থান নাই। মদন দত্তের স্ত্রীর এবং কন্যাগণের অঙ্গে যে দুই একখানা সোনা রূপার অলঙ্কার ছিল, তাহা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া আহারের সংস্থান করিতে হইল। কিন্তু সেই সকল অলঙ্কারের মূল্য দ্বারা দুই তিন মাসের আহারের সংস্থানও হইল না। মদন দত্তের স্ত্রী দুঃখ এবং অন্ন চিন্তায় দিন দিন অত্যন্ত দুর্বল হইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী জেলে রহিয়াছেন, নিজে কন্যাগণ সহ জাতিভ্রষ্ট হইয়া

পড়িয়াছেন, তাহাতে আবার আহারের সংস্থান নাই। মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা আর অধিক কী দুরবস্থা হইতে পারে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মদনের স্ত্রী হঠাৎ একদিন অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন এবং কিছুকাল পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। দুঃখিনী রমণী সংসারের সমুদয় যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিল।

মদন দত্তের স্ত্রীর মৃত্যুর পর গ্রামের লোক তাহাকে দাহ করিতে আসিল না। অনেকেই বলিতে লাগিল যে, জাতিভ্রষ্টাকে দাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মদন দত্তের দ্বারা সময়ে সময়ে গ্রামের যে দুই-একটি লোক বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল, তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে মদনের স্ত্রীকে দাহ করে এবং মদনের নিরাশ্রয়া কন্যাত্রয়কে আশ্রয় প্রদান করে; কিন্তু গ্রামের অন্যান্য লোক পাছে তাহাদিগকে একঘরে করে—সমাজচ্যুত করে, এই অশঙ্কায় তাহারাও মদনের স্ত্রীকে সৎকার করিতে আসিল না। মদনের কন্যা তিনটি বিড়াল কুকুরের শাবকের ন্যায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া গ্রাম্য ভদ্রলোক দিগের মধ্যে কাহারও মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল না। মদনের বড় কন্যা অন্নপূর্ণার বাল্যাবস্থায় বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসিতেন না। সেই জন্য সে বরাবরই পিত্রালয়ে অবস্থান করিতে ছিল। মদনের গৃহ লুঠ হইলে পর অন্নপূর্ণা তাহার শ্বশুরের নিকট গিয়াছিল। কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাকে গৃহে স্থান প্রদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'মা! আমি এ দেশের মধ্যে সহায় সম্পত্তি হীন লোক, আমার দশঘর জ্ঞাতি কুটুম্ব নাই, লোক শত্রুতা করিয়া অনায়াসে আমাকে একঘরে করিতে পারে, আমি তোমাকে এখন গৃহে স্থান দিতে পারিব না। সম্প্রতি তুমি তোমার মাতার সঙ্গে থাক; তোমার বাপ দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক, তিনি খালাস হইয়া আসিলেই, তোমরা সমাজে উঠিতে পারিবে, তখন আমার ঘরে আসিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে থাকিবে।'

মদনের স্ত্রীর যে দিন মৃত্যু হইল, সে দিন অপরাহ্নেও স্বীয় ভগ্নী দুটিকে সঙ্গে করিয়া অন্নপূর্ণা আবার তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট গেল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার মাকে চিৎকার করিবার একটু উপায় করুন।' কিন্তু তাহার শ্বশুর এবারেও সেই পূর্বের কথাই বলিলেন, 'মা আমি গ্রামের মধ্যে দুর্বল লোক। আমি এই সকল বিষয়ে সাহস করিতে পারি না। তোমার বাপের অনেক জ্ঞাতিকুটুম্ব আছে তাহাদিগের নিকট যাও।'

অন্নপূর্ণা নিরাশ হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিল। প্রাতে আট ঘটিকার সময় তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দিবা অবসান প্রায়, এখনও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কোন আয়োজন হইল না। তাহার মাতার মৃত শব ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের পূর্বের চাকর পেলারাম চাঁড়ালের মাতা এই কন্য তিনটির দুরবস্তা দেখিয়া বেলা দুই প্রহরের পর হইতে ইহাদের বাড়ী আসিয়া বসিয়া রহিল।

পেলারাম চণ্ডালের বাড়ী মদন দত্তের বাড়ীর বাহির খণ্ডের পুষ্করিণীর পাড়ে ছিল। সে

একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। পূর্বে মদন দত্তের বাড়ি সময়ে সময়ে মজুরি করিত এবং কাষ্ঠ কাটিত। মদনের স্ত্রীকে সে মা ঠাকুররানী বলিয়া ডাকিত। মদনের কন্যা তিনটির দুরবস্থা দেখিয়া তাহার মনের দয়ার সঞ্চার হইল। এই অশিক্ষিত চাঁড়ালের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে। এ ব্যক্তি অতি হীনজাতি। ইহার মধ্যে কোনো জাত্যাভিমান ছিল না। বিশেষতঃ পেলারাম টোলে কখনো সংস্কৃত অধ্যয়ন করে নাই। সুতরাং শুষ্ক জ্ঞানলাভ নিবন্ধন ইহার মন অভিমান ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ ছিল না। পেলারাম যখন দেকিল কেহই মদন দত্তের স্ত্রীকে দাহ করিতে আসিল না, তখন সে বলিয়া উঠিল, 'গ্রামের শালারা কেহ আসে আর না আসে, আমি মাঠাকরুণের কত চাল ডাল খাইয়াছি, যা হয় আমিই করিব; আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব শালারা আমাকে একঘরে করে করুক, আমি কোনো শালাকে ভয় করি না।'

এই বলিয়া পেলারাম অন্নপূর্ণাকে বলিল 'দিদি ঠাকরুণ, কোনো শালাই তো মাঠাক্‌রুণকে পোড়াইতে আসিল না। তবে আপনি বলিলেই আমি পোড়াইয়া দি।' অন্নপূর্ণার বয়স এখন প্রায় ষোল বৎসর হইয়াছে। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সে বিলক্ষণ জানে। তাহার পিতা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সুবর্ণ বণিক। চণ্ডালে তাহার মাতার মৃতশব স্পর্শ করিলে যে তাহার অধোগতি হইবে এইরূপ বদ্ধমূল সংস্কার তাহার মনে রহিয়াছে। সুতরাং পেলারামের কথা শুনিয়া সে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে জন্য অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া উঠিল, তাহা পেলারাম সহজেই বুঝিতে পারিল। সে তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েক জন বৈরাগী সংগ্রহ করিতে চলিল। বঙ্গ দেশের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এক এক দল বৈরাগী আছে, তাহারা কিছু টাকা পাইলেই মৃত শব দাহ করে। এই বর্তমান সময়েও মেদিনীপুর প্রভৃতি অনেকানেক প্রদেশে এইরূপ বৈরাগীর দল দেখিতে পাওয়া যায়। মদন দত্ত যে গ্রামে বাস করিত, তাহার পার্শ্ববর্তী অন্য এক গ্রামে এইরূপ এক দল বৈরাগী ছিল। পেলারাম তাহাদিগের আখড়ার নিকট যাইয়া কিছু দূর হইতে তাহাদিগকে উচ্চঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—'ও বাবাজী ঠাকুরেরা—ও—ও বাবাজী ঠাকুররা—তোমরা চারি পাঁচ জন তাড়াতাড়ি আইস! তোমাদের একটা দৈ চিড়ার মহোৎসবের জোগাড় হইয়াছে। তোমাদের দৈ চিড়া খাইতে পাঁচ সিকা দিব; আমাদের মা ঠাকুরানীকে পোড়াইয়া দিয়া যাও।'

বৈরাগিগণ মনে করিল যে মদন দত্তের কন্যা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে। তাহার মাতাকে দাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, কিছু অধিক টাকা চাহিলে সে বাধ্য হইয়া অবশ্যই পাঁচ-সাত টাকা দিতে সম্মত হইবে। এই ভাবিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, 'ভাই আমরা মানুষ পোড়াইতে পারিব না।' কেহ বলল, 'ভাই পাঁচ টাকার কমে আমরা যাইব না।'

কিন্তু পেলারাম তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল— 'শালা বৈরাগি! তোদের বৈরাগী জাতের তো স্বভাব এই। মনে করিয়াছিস পেলারাম বড় দায়ে ঠেকিয়াছে।

একলা পেলারাম অমন তিন জন পোড়াইতে পারে। অন্য বাড়ি পাঁচ সিকি পাইয়া নিজেদের কাট পর্যন্ত ফাড়িয়া লইতে হয়—এখানে আমি কাট ফাড়িয়া দিব। —না যাও তোমরা থাক—আমার মাঠাকরুণ ছোট খাট লক্ষ্মীর মতন—দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি একাই শেষ করিয়া দিব।'

বৈরাগিগণ দেখিল যে পেলারাম তেমন পাত্র নহে যে, পাঁচ সিকার অধিক কবুল করিবে। সুতরাং সাত-পাঁচ কথা বলিয়া বাবাজী পেলারামের সঙ্গে মদন দত্তের বাড়ি আসিল। তাহারা তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই মদন দত্তের স্ত্রীকে তাহাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর পাড়ে সৎকার করিল।

মদন দত্তের স্ত্রীকে দাহ করিবার সময় তাহার কন্যা তিনটি সেই শ্মাশানের নিকটই বসিয়াছিল। রাত্র দশ কি এগার ঘটিকার সময় অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল। কিন্তু অল্প বয়স্কা কন্যা তিনটির এখন আর থাকিবার কোথাও স্থান রহিল না। তাহাদের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। নিজের বাড়িতে অন্য কোনো বৃদ্ধ লোক না থাকিলে তাহারা থাকিতে পারে না। তখন পেলারাম অন্নপূর্ণাকে বলিল 'দিদিঠাককরণ আপনারা সম্প্রতি এই বাবাজীদের আখড়ায় যাইয়া থাকুন, সেখানে আমি দুই চারিটি স্ত্রীলোক দেখিয়া আসিয়াছি। পরে কর্তা খালাস হইয়া আসিলে বাড়ি আসিবেন।'

অন্নপূর্ণা দেখিল যে বৈরাগীদের আখড়া ভিন্ন আর কোথাও যাওয়া থাকিবার স্থান নাই। গ্রামের স্বজাতীয় সুবর্ণবণিকগণ তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিবে না। সুতরাং কনিষ্ঠ ভগ্নীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া অন্নপূর্ণা সেই বৈরাগীদের সঙ্গে তাহাদের আখড়ায় চলিয়া গেল।

কিন্তু যে সকল বৈরাগীর একটু শাস্ত্র জ্ঞান আছে, যাহাদের ভদ্রলোকের মধ্যে একটু মান সম্ভ্রম আছে, যাহারা গুরুগিরি ব্যবসা করে, তাহাদের চরিত্রই যারপর নাই ঘৃণিত। তাহারাই যখন নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া সর্বদা আপন আপন জীবন কলঙ্কিত করিতেছে, তখন এই মৃত-শব-দাহন-ব্যবসায়াবলম্বী বৈরাগিগণ যে নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে একটা বৈরাগী অন্নপূর্ণার ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ধর্ম বিসর্জন করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

এই সময়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পূর্বজন্ম এবং পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একটি বদ্ধমূল সংস্কার ছিল। অন্নপূর্ণা ভাবিতে লাগিল যে পূর্বজন্মে না জানি কতই পাপ করিয়াছিলাম তজ্জন্যই এই জন্মে এখন এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। কিন্তু এই জন্মে আবার পাপ করিলে পুনর্জন্মে ইহাপেক্ষাও অধিক কষ্ট যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইবে।

এইরূপ ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে আপন সতীত্ব ধর্ম বিসর্জন করিতে কোনো ক্রমেই সম্মত হইল না, এবং দুই তিন দিন পরে সে আখড়া পরিত্যাগ পরিত্যাগ পূর্বক পিতার সাক্ষাৎ লাভাশয়ে কলিকাতা যাত্রা করিল। তাহার কলিকাতা যাইবার আরও একটি কারণ ছিল।

মদন দত্ত যে গ্রামে বাস করিত সেই গ্রামের অন্য একজন লবণব্যবসায়ী গোপনে লবণ ক্রয় করিবার অভিযোগে কলিকাতা জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির আড়াই শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে অর্থদণ্ড হইলে যদি কেহ সেই জরিমানার টাকা দিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জেলে থাকিতে হয়, পূর্বে এইরূপ নিয়ম ছিল না। যত দিন জরিমানার টাকা আদায় না হইত তত দিন পর্যন্ত দণ্ডিত ব্যক্তিকে জেলে থাকিতে হইত। এখন কোনো ব্যক্তির পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইলে যদি সে পঞ্চাশ টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারে, তবে হয়তো তাহাকে পনের দিবস কিম্বা এক মাস, না হয় বড় অধিক হইলে দুইমাস জেলে থাকিতে হয়। কিন্তু শত বৎসর পূর্বে যদি কাহারও দশ টাকা জরিমানা হইত, তবে সেই দশ টাকা যতদিনে আদায় না হইত, তত দিন দণ্ডিত ব্যক্তিকে জেলে থাকিতে হইত। হয়তো দশ টাকার নিমিত্ত কাহাকেও পাঁচ বৎসর জেলে থাকিতে হইয়াছে।

প্রাগুক্ত লবণ ব্যবসায়ীর আড়াই শত টাকা জরিমানা হইলে, তাহার আর টাকা দিবার কোনো উপায় ছিল না। বিশেষতঃ তাহারও ঘর বাড়ি কোম্পানির লোকেরা লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা যাইয়া কলিকাতাবাসী মহাত্মা গৌরী সেনকে ধরিয়া পড়িল। গৌরী সেন আড়াই শত টাকা দিয়া তাহাকে কয়েদ হইতে খালাস করিয়া দিলেন।

পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে হয়তো অনেকেই গৌরী সেনের নাম শুনিয়া থাকিবেন। শত বৎসর পূর্বে গৌরী সেন নামে এক জন পরম ধার্মিক লোক বাস করিতেন। ইনি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারের অংশী ছিলেন।

পরম ধার্মিক গৌরী সেন কলিকাতায় অবস্থান কালে পরোপকারার্থ অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি ঋণগ্রস্তকে ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন, যাহাদের অর্থদণ্ড হইত তাহদের জরিমানার টাকা দিয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করিতেন। গোপনে গোপনে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের অভিযোগে ইংরাজ বণিকগণ বহুসংখ্যা লোককে অর্থদণ্ড করিয়া জেলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে সহৃদয় গৌরী সেন হতভাগ্যদিগকে টাকা দিয়া কারামুক্ত করিতে লাগিলেন। গৌরী সেনের বদান্যতার কথা দেশ বিদেশে প্রচার হইত। মদন দত্তের স্ত্রীও গৌরী সেনের নাম শুনিয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও লোকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ‘লাগে লাক (লাখ) টাকা দেবে গৌরী সেন।’

মদন দত্ত জেলে প্রেরিত হইলে পর তাহার স্ত্রী এক দিন স্বীয় কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, তাহারা কলিকাতা যাইয়া গৌরী সেনকে ধরিয়া পড়িবেন। কিন্তু মদনের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। সুতরাং তিনি আর কলিকাতা যাইতে পারিলেন না। এখন অন্নপূর্ণা মনে মনে স্থির করিল যে কলিকাতায় যাইয়া পিতার উদ্ধারার্থ গৌরী সেনকে অনুরোধ করিবে; এই নিমিত্ত ভগ্নীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

কিন্তু কলিকাতা যাত্রা করিবার সময় অন্নপূর্ণার সঙ্গে দুই আনা মাত্র পয়সা এবং পরিধানের দুইখানি বস্ত্র ভিন্ন আর দুইখানি পুরাতন বস্ত্র ছিল। পথে প্রথম দুইদিনের আহারের সংস্থান করিতেই সঙ্গের আটটি পয়সা ব্যয় হইয়া গেল। তৃতীয় দিবস অতিরিক্ত বস্ত্র দুই খানির বিনিময়ে চাউলের সংস্থান হইল। চতুর্থ দিবসের মধ্যাহ্নে পূর্ব দিবসের সঞ্চিত চাউল দ্বারা তিন জনে অল্প অল্প আহার করিল। কিন্তু আজ পঞ্চম দিবস। গত কাল্য অপরাহ্নেও আহার সংস্থান নাই। আজ দিবাবসান প্রায়। কোনো প্রকারেই আহার করিবার সুবিধা করিতে পারে নাই।

মদন দত্ত এক জন সাধারণ রকমের ধনী লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং তাহার কন্যাগণ লোকের নিকট কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয় তাহা জানে না। এক একবার মনে করে যে পথিকদের নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে, কিন্তু পথিকগণ যখন তাহাদের নিকট দিয়া হাঁটিয়া যায়, তখন লজ্জায় মুখ খুলিয়া আর কিছু বলিতে পারে না। এই বৃক্ষতলে ইহারা তিন জন বসিয়া আছে, অনেক পথিক ইহাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সাহস করিয়া এখন পর্যন্তও কাহারো নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে পারে নাই।

মদন দত্তের ছোট কন্যা অহল্যার বয়স সাত বৎসর মাত্র হইয়াছে। সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। জগদম্বা কয়েকটি কচি কচি বটের পাতা আনিয়া তাহাকে দিয়াছে, সে সেই কচি বট পাতা কয়েকটি খাইয়াছে।

অন্নপূর্ণার তিন দিন পর্যন্ত জ্বর হইয়াছে। অন্নপূর্ণা ইতিপূর্বে কখনো কখনো অহল্যাকে ক্রোড়ে করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আজ সে আর চলিয়া যাইতে পারে না, বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

সাবিত্রী এই অনাথ কন্যাত্রয়ের দুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পর দুঃখে আত্মদুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইল। ইহারা অদ্য সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া রহিয়াছে, এই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গে যে চারিটি টাকা ছিল, তাহা হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া জগদম্বার হাতে দিল। জগদম্বা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সাবিত্রী তাহাকে বলিল, 'চল সম্মুখস্থ বাজার হইতে আমরা এই টাকা ভাঙ্গাইয়া চাউল ক্রয় করিয়া আনি। পরে আমরা চারি জনেই এখানে একত্রে আহারের আয়োজন করিব।' অহল্যা এই কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল।

অন্নপূর্ণা সাবিত্রীকে বলিল, 'আপনি অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন; আপনি আর কষ্ট করিয়া কেন বাজারে যাইবেন; ইহারা দুই জনেই সম্মুখস্থ বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিয়া আনিতে পারিবে।'

তখন জগদম্বা এবং অহল্যা সাবিত্রীর প্রদত্ত টাকা লইয়া বাজারে চাউল ক্রয় করিতে চালিয়া গেল।

তাহারা দুই ভগ্নী চলিয়া গেল পর সাবিত্রী আবার অন্নপূর্ণাকে বলিল 'আমি বুঝিতে

পারি না, আপনার স্বামী আপনাকে এইরূপ দুরবস্থায় কেন পরিত্যাগ করিলেন?' অন্নপূর্ণা বলিল, 'আমার সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসর। সে সময় তিনিও আমাকে বিশেষ যন্ত্রণার কারণ বলিয়া মনে করিতেন, আমিও তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতাম না। তখন আমাদের পরস্পরের মধ্য ভালবাসার ভাব একেবারেই ছিল না। কিন্তু আমি বড় হইবার পর তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসার সঞ্চার হইল। আমি তাঁহাকে বড়স ভালবাসিতাম। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার সঞ্চার হইল না। পূর্বের ন্যায় আমার প্রতি তাঁহার সেই বিদ্বেষের ভাবই রহিয়া গেল। আমার বোধ হয় অতি বাল্যকালে বিবাহ হইলে সময় সময় এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে।'

ইহাদের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে জগদম্বা এবং অহল্যা বাজার হইতে চাউল ডাইল এবং কাষ্ঠ লইয়া আসিল। ইহারা চারি জনে একত্র হইয়া সেই বৃক্ষতলে আহারের আয়োজন করিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা কিছুই আহার করিতে পারিল না। তাহার জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আহারের পর ইহারা চারি জনেই বৃক্ষতলে শুইয়া রহিল। যে ছিন্ন বস্ত্রখানি পরিধান করিয়া দিবসে লজ্জা নিবারণ করিত; রাত্রে তাহাই ইহাদিগের একমাত্র শয্যা ছিল। অঞ্চল পাতিয়া চারিজন শয়ন করিল। কিন্তু রাত্রে অন্নপূর্ণার শরীর একেবারে অবশ হইয়া পড়িল। সে তখন নিজের আসন্ন মৃত্যু বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল। রাত্র প্রভাতের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বে সে স্বীয় কনিষ্ঠা ভগ্নীদ্বয় এবং সাবিত্রীকে জাগ্রত করিল। পরে সাবিত্রীকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিল—

—'আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে, আমার মা আমার শিয়রে বসিয়া আপনার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ পূর্বক বলিতেছেন—'ইনি স্বর্গীয় দেবতা—ইঁহার হাতে তোমার ভগ্নীদ্বয়কে সমর্পণ করিয়া আমার সঙ্গে আইস। তোমার সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণা দূর হইবে।' আমার মা নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। বোধ হয় আমার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। আমার সর্বশরীর অবশ হইয়াছে। বুকে কিছু চাপা পড়িলে যেরূপ কষ্ট হয় সেইরূপ কষ্ট হইতেছে। কথা বলিতেও কষ্ট হয়। আমার মৃত্যু হইলে আমার এই অনাথা ভগ্নী দুইটিকে আপনার সঙ্গে করিয়া কলিকাতা লইয়া যাইবেন। আমি ইহাদিগকে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। আপনি কলিকাতা যাইতেছেন, ইহাদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সেখানে যদি আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে ত ইহারা পিতার নিকট যাইবে। কিন্তু যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে কিম্বা তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ না হয়, তবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে আপনি উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমি আর একটি কথা বলিতেছি; কলিকাতা পৌঁছিয়া আপনি গৌরী সেনের নিকট যাইবেন, শুনিয়াছি তিনি বড় দয়ালু লোক। কত শত অনাথ কাঙ্গালকে তিনি অন্ন দিতেছেন। তাঁহার নাম স্মরণ রাখিবেন, ভুলিবেন না।'

এই সকল কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই অন্নপূর্ণা ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল। কনিষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে আবার ভগ্নীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলি 'আমি তোমদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম—ইনিই তোমাদের দিদি। সর্বদা ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।'

তাহার ভগ্নী দুইটি কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এই সময় রাত্র প্রভাত হইল। কত শত শত পথিক ইহাদিগের পার্শ্বস্থিত রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কেহ ইহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসাও করিল না যে, তোমাদের কী দুরবস্থা হইয়াছে? বাঙ্গালির ন্যায় সহানুভূতি শূন্য হৃদয় বোধ হয় সংসারে আর কোনো জাতীয় লোকের নাই। বেলা দেড় প্রহরের সময় অন্নপূর্ণার মৃত্যু হইল। ইহারা তিন জনই ঘোর বিপদে পড়িল। সাবিত্রী দুই-একজন পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইহাকে পোড়াইবার কোন উপায় আছে কি না। সকলেই বলিল যে তীর্থে গমনকালে এই প্রকার মৃত্যু হইলে তাহাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন করিলেও দোষ নাই। অগত্যা ইহারা গঙ্গাজলে অন্নপূর্ণার দেহ বিসর্জন করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিল। কিন্তু তাহার মৃত শব ইহারা তিন জনে ধরিয়া উঠাইতে সমর্থ হইল না। তখন দেখিল যে এই মৃত শব অপরের সাহায্য ভিন্ন গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবারও সুবিধা হইবে না। সাবিত্রী জগদম্বা ও অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া সম্মুখস্থ বাজারে গেল। সেখানে দুইজন মেথরকে একটি টাকা দিল। তাহারা ইহাদের সঙ্গে বৃক্ষতলে আসিয়া অন্নপূর্ণার শব স্কন্ধে করিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল। ইহারা বাজারে আসিয়া একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিল। আহারাদি করিতে আর বড় ইচ্ছা হইল না। অল্প বেলা থাকিতে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া অন্যান্য পথিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই ঘটনার তিন চারিদিন পরে ইহারা তিন জনই কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল।

সতের

শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা

কী অপূর্ব পরিবর্তন! শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা কী ছিল! এখনই বা কী দেখিতে পাই। আবার শতবর্ষ পরে যে কী হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে।

এই যে সুরম্য বিহার ক্ষেত্র গড়ের মাঠ! শতবর্ষ পূর্বে এই স্থান হিংস্র জন্তু সঙ্কুল নিবিড় বন সমাবৃত ছিল। সহস্র সহস্র সুরম্য হর্ম্য এবং সৌধ অট্টালিকা পরিপূর্ণ চৌরঙ্গীতে শতবর্ষ পূর্বে পাঁচ খানি ইষ্টক নির্মিত গৃহও ছিল না! কিন্তু আজ এখানে শত শত সুসজ্জিত রাজ প্রসাদতুল্য সৌধরাজি পরিলক্ষিত হইতেছে। চৌরঙ্গীর সুরম্যা অট্টালিকা সমূহ, সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী, তৎ সম্মুখস্থিত উদ্যান, সুপরিষ্কৃত রাজপথ এই স্থানটিকে কী অপূর্ব শোভায় সুশোভিত করিয়াছে! চৌরঙ্গীর বর্তমান শোভাসমৃদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রস্তরময় হর্ম্যাবলী সুশোভিত আকবরের দিল্লীকে,—শিল্পের কীর্তিনিকেতন জাহাঙ্গীরের প্রমোদকানন আগ্রাকে—এবং রণজিতের রমণীয় বিহারক্ষেত্র লাহোরকে, সৌন্দর্য ও গৌরবে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছে।

শতবৎসব পূর্বে চৌরঙ্গীতে কাহারও আসিতে হইলে পাল্কী বেহারাগণকে দ্বিগুণ ভাড়া প্রদান করিতে হইত। তখন হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলাবৃত গড়ের মাঠ পার হইয়া কেহই এখানে আসিতে সম্মত হই না। দস্যুদিগের ভয়ে সন্ধ্যার পর নিশীথে কেহই গড়ের মাঠের নিকটবর্তী স্থানে বিচরণ করিত না। কিন্তু এখন সেই সকল হিংস্র জন্তুর অত্যাচার এবং পূর্বের সেই অরাজকতা নিবন্ধন দস্যুতার পরিবর্তে কী দেখিতে পাই?—ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে সুসজ্জিত অসংখ্য কামান, বারুদ ও গোলা এবং পূর্বের বহুসংখ্য রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত এবং আইনজ্ঞ বিচারকদিগের সুরম্য রাজপ্রাসাদ সদৃশ বাসস্থান! সেই হিংস্র জন্তুর রাজত্ব নিঃশেষিত হইয়াছে, সে অরাজকতা সম্ভূত দস্যুতা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্বাবস্থার চিহ্নমাত্রও নাই। সমুদয় কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া নূতনাকারে বিকশিত হইতেছে।

আজ কলিকাতায় যেসকল বিচারাদালত দেখিতেছি; শতবর্ষ পূর্বে এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় এইরূপ প্রণালীতে কোনো বিচারাদালত কিম্বা ব্যবস্থাপন সমাজ সংস্থাপিত ছিল না। তখন কলিকাতা হাইকোর্টের পরিবর্তে মেয়র কোর্ট নামে একটি বিচারালয় ছিল। লালদীঘির পূর্ব উত্তর কোণে—(যে স্থানে এখন স্কট গির্জা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে, ঠিক এই স্থানে)—মেয়র কোর্টের গৃহ ছিল। ইংরাজদিগের পরস্পরের মধ্যে কোনো দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে কিম্বা ইংরাজ ও দেশীয় লোকের মধ্যে কোনো বিবাদ উপস্থিত হইলে মেয়র কোর্টের বিচারপতি তাহার বিচার করিতেন। মেয়র কোর্টের প্রধান বিচারপতি মেয়র (Mayor) নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহার সহকারি অপর নয়জন বিচারককে আলডারম্যান (Alderman) বলা যাইত। কলিকাতাবাসী বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কোন দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কাছারি আদালতে বিচার হইত। কিন্তু উভয় পক্ষ সম্মত হইলে মেয়র কোর্টেও বিচার হইতে কোনো বাধা ছিল না।

মেয়র কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে গবর্ণর এবং কৌন্সিলের সমীপে আপীল হইত। গবর্ণর এবং কৌন্সিলই তখন কলিকাতাস্থ সর্ব উচ্চ বিচার আদালত ছিল। তাঁহারাই মেয়র কোর্টের এবং অন্যান্য কোর্টের আপীল শ্রবণ করিতেন। মেয়র কোর্টের এবং অন্যান্য কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করিতেন; পক্ষান্তরে আবার সেই গবর্ণর এবং কৌন্সিলের বিরুদ্ধে কেহ মোকদ্দমা করিলে তাহার বিচারও মেয়র কোর্টের জজেরাই করিতেন। বিচার আদালত সমূহ এবং গবর্ণর ও কৌন্সিলের মধ্যে অতি সুকৌশল পরিপূর্ণ একটি চক্রাকার সম্বন্ধ ছিল।

এতদ্ভিন্ন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারার্থও দুইটি বিচারালয় ছিল। কোয়ার্টার সেসন বিচারালয়ের বিচারক গবর্ণর এবং কৌন্সিলের মেম্বারগণ; এবং জমিদারী বিচারালয়ের বিচারকের পদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। জমিদারকে বর্তমান সময়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত।

কিন্তু এই সমুদয় বিচার আদালতই গবর্ণর এবং কৌন্সিলের আংশিক অবতার স্বরূপ। সকলেরই সেই এক সদুদ্দেশ্য ছিল—সকলেই সেই এক মহদুদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইতেন—যেরূপেই হউক সত্বর সত্বর বিপুল অর্থ সঞ্চয় পূর্বক স্বদেশ প্রত্যাগমন।

শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতার জন সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বর্তমান জন সংখ্যার শতাংশের একাংশ ছিল না। বিচারকদিগের উপরি পাওনা বড় অধিক ছিল না। সুতরাং বিচার কার্যে যাহারা নিযুক্ত হইতেন তাহাদিগকেও বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে হইত। এদিকে যে সকল লোকে এই সকল বিচারালয়ে মোকদ্দমায় উপস্থিত করিতে হইত, কিম্বা যাহারা প্রতিবাদী হইয়া কোনো মোকদ্দমায় আত্ম সমর্থন করিত, তাহাদিগের বিশেষ অসুবিধা ছিল না। বর্তমান সময়ে শত শত টাকার ষ্টাম্প ব্যয় করিয়া, শত শত টাকা উকীলকে প্রদান করিয়াও লোকে স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে দশ টাকা অধিক ব্যয় করিলে তাহা একেবারে বৃথা যাইত না। ন্যায় বিচার তখন প্রায়ই অর্থের অনুগামী হইত।

এই সময়ে কলিকাতার মধ্যে খিদিরপুর এবং কালীঘাটের মন্দির হইতে অর্ধক্রোশ উত্তর পশ্চিমে কাটা গঙ্গার পূর্ব পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ বিশেষ জনাকীর্ণ ছিল। এই শেষোক্ত

স্তানেই শেঠবংশীয় বণিকগণ এবং অনেকানেক বসাকের বাসস্থান ছিল। কর্ণেল কিড্ সাহেবের নামানুসারে বর্তমান খিদিরপুর কিডারপুর, নামে অভিহিত হইয়াছিল। খিদিরপুর হইতে কিছুদূর উত্তর পশ্চিমে একটি ইষ্টক নির্মিত পুল ছিল। এই পুলটিকে লোকে সারম্যান সাহেবের পুল (Surman's Bridge) বলিত। এই পুলের দক্ষিণে সারম্যান সাহেবের উদ্যান ও একখানি গৃহ ছিল। কিন্তু এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার অনেক বৎসর পূর্বে সারম্যান সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল। সারম্যান উদ্যানের দক্ষিণে ইংরাজদিগের গোবিন্দপুরের উত্তর সীমানা ছিল। খিদিরপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে মাণিকচাঁদের উদ্যান। সিরাজের কলিকাতা আগমন কালে মাণিকচাঁদ এই স্থানে অবস্থান করিতেন। সহরের দক্ষিণ সীমানা গার্ডেনরিচছিল। এখানেও অনেকানেক লোকের বাসস্থান ছিল।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই আলিপুরে বেলবিডিয়ার গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময়ে কলিকাতার গবর্ণর বেরেলষ্ট সাহেব প্রায়ই লালদিঘীর পার্শ্বস্থিত কৌন্সিল গৃহের নিকটবর্তী অন্য একটি গৃহে বাস করিতেন; কখনো কখনো উদ্যান গৃহ স্বরূপ বেলবিডিয়ার গৃহে আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থান করিতেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেবের আগমনের পর পূর্ব নির্মিত বেলবিডিয়ারের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বর্তমান বেলবিডিয়ার গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর বিভাগে লালবাজার একটি পুরাতন স্থান। লালবাজারের নাম ১৭৩৮ সালে হলওয়েল সাহেবের কোনো কোনো পত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় লালবাজারে অনেকানেক বাঙ্গালিদিগের দোকান ছিল।

ফৌজদারি বালাখানায় মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হুগলীর ফৌজদার (মাজিষ্ট্রেট) কখনো কখনো আসিয়া কাচারি করিতেন। আরমানিয়ান, পর্তুগিজ, এবং গ্রীক বণিকগণ ইহার পশ্চিম দিকে বাস করিতেন।

লালবাজারের পশ্চিমে লালদিঘী। ইংরাজিতে এই স্থানটিকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বলা যায়। এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের মধ্যস্থিত এক খানি সুপরিষ্কৃত গৃহে খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারক মহাত্মা কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব (John Zacharia Kiernander) বাস করিতেন। ইঁহার জন্মস্থান ইউরোপের অন্তর্গত সুইডেন প্রদেশে ছিল। ইংলণ্ডের খৃষ্ট্রীয় ধর্ম প্রচার সমাজ (Christian Knowledge Society) কর্তৃক ইনি প্রচারকের পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথামতঃ মাদ্রাজে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। পরে ১৭৫৮ সালে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আসিয়া তদবধি এইখানেই অবস্থান করিতেছিলেন; ইঁহার বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি ছিল। সুবিখ্যাত জর্মাণ অধ্যাপক ফ্রাঙ্কের (Francke) নিকট ইনি বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ গবর্ণরদিগের মধ্যে কি লর্ড ক্লাইব, কি বেরেলষ্ট সাহেব সকলেই ইঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ইঁহার সদাশয়তা ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে অনেকানেক আরমানিয়ান এবং পর্তুগিজ অধিকন্তু দুই চারি জন বাঙ্গালি পর্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বন করিতে

লাগিলেন। ইনি অনেকানেক রোমান ক্যাথলিকদিগকে এবং ফাদার বেণ্টো নামক বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীকে, প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

১৭৬১ সালে ইঁহার সহধর্মিণীর মৃত্যু হইল। এই সময় কলিকাতাবাসী ইংরাজ মহিলাগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সহৃদয়া স্ত্রীলোক অতি অল্পই ছিল। তৎকালে কলিকাতাবাসী ইংরাজদিগের কার্যকলাপ মধ্যে একদিকে যদ্রূপ ঘোর অর্থগৃধ্নুতা নীচাশয়তা এবং সততার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইত; পক্ষান্তরে আবার ব্যভিচার ও পরদার গমন ইত্যাদি কুকার্য দ্বারা ইংরাজদিগের জীবন বিশেষরূপে কলঙ্কিত ছিল। ভদ্র ইংরাজ মহিলাগণ ভারতবর্ষে আসিতে কখনো সম্মত হইতেন না। সুতরাং ভদ্রবংশজাতা মহিলাদিগের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কলিকাতায় তৎকালে কোন একটি ইংরাজ মহিলা বিধবা হইলে পাঁচ-সাত জন ইংরাজ যুবক তাহার পাণিগ্রহণ প্রার্থী হইতেন।

পাদ্রী কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের সহধর্মিণীর মৃত্যু হইলে পর তিনি মিসেস্ উলী নাম্নী একজন ইংরাজ বণিকের বিধবাকে বিবাহ করিলেন। মিসেস উলীর বয়ঃক্রম তখন বড় অধিক ছিল না; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। মহিলাদিগের মধ্যে তিনি রূপবতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মস্তকটির একটু টাকপড়া ছিল। তাঁহার পূর্ব স্বামী উলী সাহেব বঙ্গদেশের বাণিজ্য দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মিসেস উলী নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। মিসেস উলীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাদ্রী কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের প্রস্তাবেই তিনি সম্মতা হইলেন। পাদ্রী কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের তখন ধর্ম প্রচারার্থ অনেক টাকা প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রচার সভার প্রদত্ত টাকা দ্বারা সকল ব্যয় নির্বাহ হইত না। সুতরাং এই বিবাহ দ্বারা তাঁহার ধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইল। কলিকাতাস্থ আরমানিয়ান এবং বাঙ্গালিদিগের শিক্ষার্থ ট্যাঙ্ক্ স্কোয়ারের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালি ছাত্র দুই একটি ভিন্ন অধিক জুটিল না। বাঙ্গালিগণ চিরকালই চাকরি করিবার অভিপ্রায় লেখা পড়া শিক্ষা করে। এই সময়ে একটু পার্সি ভাষা শিক্ষা করিলেই চাকরির অধিক সুবিধা হইত। সুতরাং বাঙ্গালিদিগকে এই বিদ্যালয়ে বড় দেখা যাইত না। কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের স্কুলে পর্তুগিজ গ্রীক এবং আরমানিয়ান ছাত্রের সংখ্যাই অধিক হইল। এইরূপে বিদ্যালয় ইত্যাদি সংস্থাপন পূর্বক খৃষ্ট্রীয় ধর্ম প্রচারের বিলক্ষণ সুবিধা করিলেন। ১৭৬৩ সালের পূর্বে তিনি আরমানিয়ান এবং পর্তুগিজ ভিন্ন অন্যূন পনের জন্য বাঙ্গালিকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ, এবং অর্থ গৃধ্নুতা সর্বদাই খৃষ্ট ধর্মপ্রচারের বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ১৭৬৩ সালে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের প্রচার কার্যে বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল।*

* Vide note (16) in the appendix.

ইতিপূর্বে যে পনের জন বাঙ্গালি খৃষ্টান হইয়াছিল তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ইংরাজগণ নিশ্চয়ই যিশুখৃষ্টের ন্যায় নির্মল চরিত্র এবং সদাশয়। কিন্তু ১৭৬২ সালে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বরগণ পণ্য দ্রব্যের মাশুল আদায় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লইয়া যেরূপ আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন, মীর কাসিমকে যেরূপ অন্যায় ও অবৈধ পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন, তদ্দর্শনে নবীন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিগণ অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। যে পনের জন বাঙ্গালিকে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এগার জন মীর কাসিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইবামাত্র ইংরাজদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ফ্রান্সিস রামচরণ, জনসন রামকৃষ্ণ, জনাথন গঙ্গাগোবিন্দ, হুইলার জনার্দন এবং অপর সাত জন কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, 'পাদ্রী সাহেব আমাদের নামের অগ্রভাগ বাদ দিতে হইবে। আমরা আর আপনাদের এ গির্জায় ধর্মশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা স্বতন্ত্র গির্জা নির্মাণ পূর্বক উপাসনা করিব।'

কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কিজন্য এইরূপ বলিতেছ?'

ফ্রান্সিস রামচরণ সকলের অগ্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, 'পাদ্রী সাহেব কেবল আমাদিগকেই বলিতেছেন যে কল্য কী খাইবে, কী পরিবে তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিও না (Think not for tomorrow)। কিন্তু খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইংরাজগণ পঁচিশ বৎসর পরে কী খাইবেন কী পরিবেন, আজই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেছেন। আপনাদের এইরূপ খৃষ্টধর্ম আমরা চাই না। বাইবেলে যেরূপ লিখিত আছে তদনুরূপ আচরণ করিব।'

কিয়ারন্যাণ্ডার। তুমি কি বল আমি টাহা বোঝে না।

ফ্রান্সিস রামচরণ। আজ্ঞে বুঝাইয়াই বলিতেছি।

কিয়ারন্যাণ্ডার। সকল কটা বুঝাইয়া বলিটে হয়।

ফ্রান্সিস রামচরণ তখন বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়! আপনি কেবল আমাদিগকেই বলিতেছেন কল্য কী আহার করিবে, কী পান করিবে, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কিন্তু আপনার স্বদেশীয় খৃষ্টানগণ ত দেখি সে-বিষয় বিলক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকেন। এই দেখুন বাঙ্গালিদিগকে মাশুলের দাবী হইতে নবাব অব্যাহতি দিয়াছেন বলিয়া, আপনার স্বজাতীয় খৃষ্টানগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যে-সকল বাণিজ্য দ্রব্যের উপর মাশুল এখন আদায় হয় সে-সকল দ্রব্য বাঙ্গালিগণ কখনো ক্রয়-বিক্রয় করেন না। পঁচিশ বৎসর পরে যদি বাঙ্গালিরা এইরূপ পণ্য দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন, তবে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ লোকসান হইতে পারে, সেই আশঙ্কা করিয়া আজই যুদ্ধারম্ভ করিলেন; আপনারা পঁচিশ বৎসর পরে কী খাইবেন, কী পরিবেন তাহার সংস্থান এখনই করিতেছেন। আবার আপনারা বলিতেছেন যে অনেক কষ্ট করিয়া কেবল আমাদের উপকার করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরেও আমাদের দেশীয় লোক বাণিজ্যে প্রবেশ

করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত আজই করিতেছেন। ধন্য আপনাদের ত্যাগ-স্বীকার! আর অধিক কী বলিব, আমাদিগের আশা পরিত্যাগ করুন। আমরা আপনাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিব। আমরা স্বতন্ত্র গির্জা নির্মাণপূর্বক খৃষ্ট দেবের অর্চনা করিব, আপনাদিগের সহিত কোনো সংশ্রব রাখিব না। আপনারা বড় স্বার্থপরায়ণ জাতি।'

এই বলিয়া ফ্রান্সিস রামচরণ অপর দশজনকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল। কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব দেখিলেন যে মহা বিপদ উপস্থিত। পনের জনের মধ্যে কেবল মেথিউ মূল্লক চাঁদ, টমকিন কাশীনাথ, ফিলিপ গঙ্গারাম এবং টমাস ঘনশ্যাম, এই চারিজন ইংরাজদিগের ঢাকার কুঠিতে মুহুরির কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে। সুতরাং তাহারা তৎকাল প্রচলিত ইংরাজদিগের নূতন খৃষ্টধর্মাবলম্বনপূর্বক লোকের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিল। শেযোক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে ফিলিপ গঙ্গারাম কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের ঘরের সরকার পদে নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং টমাস ঘনশ্যাম সাহেবের উদ্যানের কার্য করিতে লাগিল। ফিলিপ গঙ্গারাম এবং টমাস ঘনশ্যাম ইহাদের দুইজনের মধ্যে কেহই লেখাপড়া জানিত না। ইহারা নিতান্ত গরীব ছিল। অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করিবার কোনো সুবিধা ছিল না। বাঙ্গালিদিগকে বিবাহ করিতে হইলে কন্যার পণ দিতে হয়। খৃষ্টান হইবার পূর্বে ইহারা মনে-মনে আশা করিয়াছিল যে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই একটা বিলাতি মেম বিবাহ করিতে পারিবে। কিন্তু আশা বৈতরণী নদী! এক-একজনের মনে কত প্রকার অসম্ভব আশার উদয় হইতেছে। এই সময়ে সুশিক্ষিত ইংরাজযুবকদিগের অদৃষ্টে বিলাতি মেম জুটিয়া উঠিত না বলিয়া, অগত্যা তাহাদিগকে মুসলমান মহিলাদিগের পাণিগ্রহণ করিতে হইত। সেই সকল শঙ্কর-বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শত-শত ইদ্রু-পেদ্রু প্রভৃতি ইউরেশিয়ানগণ এখন ভারতে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু টমাস ঘনশ্যাম যে কী ভাবিয়া এইরূপ উচ্চ আশা করয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে এইরূপ অসম্ভব আশা সময়ে-সময়ে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের মনেই উদয় হয়। সুতরাং ফিলিপ গঙ্গারাম এবং টমাস ঘনশ্যামকে আমরা বড় অপরাধী বলিয়া মনে করি না।

ফিলিপ গঙ্গারাম বড় চালাক ছিল। কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের মেম (পূর্বোল্লিখিত মিসেস উলী) তাহাকে গৃহকার্য সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার জিনিস পত্র ক্রয় করিবার কার্যে নিয়োগ করিতেন এবং দৈনিক বাজারের কার্যও তাহাকে করিতে হইত। টমাস ঘনশ্যাম হিন্দুস্থানি লোক, নিতান্ত আহম্মক ছিল। সুতরাং সে উদ্যানের কার্যে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু ইহাদের খৃষ্টান হইবার পর প্রায় পাঁচ-সাত বৎসর গত হইল; আজ পর্যন্তও ইহাদের বিবাহ হয় নাই। এখন ইহারা মনে-মনে স্থির করিয়াছে যে বিলাতি মেম না পাইলে দেশীয় স্ত্রীলোক জুটিলেই বিবাহ করিবে; বিলাতি মেমের আশায় আর অধিককাল বিলম্ব করিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশীয় স্ত্রীলোকও আজ পর্যন্ত জুটিতেছে না। ১৭৬৩ সালে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের প্রচার কার্যে বাধা পড়িল; সেই সময় হইতে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত আর একজন লোককেও তিনি খৃষ্টান করিতে পারিলেন না।

আঠার
বিলাতী বৈষ্ণব

১৭৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সাবিত্রী মদন দত্তের কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা পৌঁছিল। শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার যাহার সঙ্গে ইহাদের সাক্ষাৎ হইল তাহার নিকটই 'গৌরী সেনের বাড়ি কোথায়' এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরী সেন সর্বদা কলিকাতা থাকিতেন না। একজন লোক ইহাদিগকে বলিল গৌরী সেন এখন কলিকাতায় নাই।

এই কথা শুনিয়া ইহারা নিরাশ হইয়া পড়িল। ইহাদের সঙ্গে এখন আর একটি পয়সাও নাই। কিছুকাল চিন্তা করিয়া সাবিত্রী বলিল, 'জগদম্বা আমরা ক্যারাপিট সাহেবের বাড়ি যাইতে পারিলে, তিনি আমাদিগের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমার সঙ্গে তাঁহার মেমের পত্র আছে।'

এই ভাবিয়া ক্যারাপিট সাহেবের বাড়ি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যাহার সঙ্গে দেখা হইত, তাহাকেই 'ক্যারাপিট সাহেবের বাড়ি কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ ক্যারাপিট সাহেবকে চিনিত না। সুতরাং ক্রমে দুই ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও ক্যারাপিট সাহেবের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে একজন বাঙ্গালির নিকট ক্যারাপিট সাহেবের বাড়ি কোনো স্থানে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল, 'ক্যারাপিট নহে, কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব।'

এই ব্যক্তি মনে করিয়াছিল যে ইহারা স্ত্রীলোক, বোধহয় ইহাদের বাপ কি ভাই খৃষ্টান হইয়া থাকিবে, তাহাদের অনুসন্ধানার্থই পাদ্রী সাহেবের কুঠির তল্লাস করিতেছে। এই ভাবিয়া সে ইহাদিগকে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের কুঠি দেখাইয়া দিল। এই ব্যক্তির কথা অনুসারে ইহারা আসিয়া লালদীঘির পারে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবর কুঠিতে পৌঁছিল। সাহেব তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি প্রত্যহই স্বয়ং তাঁহর পিতার স্থাপিত স্কুলে পড়াইতে যাইতেন। ইহারা কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল একটি বৃদ্ধা ইংরাজ রমণী কুঠির বারাণ্ডায় একটি কৌচের উপর বসিয়া আছেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন আধবুড়া লোক তালবৃন্তদ্বারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে।

তিনটি কন্যাকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেমসাহেব, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'টমাস ঘনশ্যাম! জিজ্ঞাসা কর ইহারা কী জন্য আসিয়াছে।'

মেমসাহেব বাঙ্গালা জানিতেন না। এই সময় ইয়ুরোপীয় লোকদিগকে বাঙ্গালিদিগের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে পর্তুগিজ, ফরাসি এবং হিন্দি এই তিন ভাষার শব্দ মিশ্রিত এক অপূর্ব ভাষায় কথা বলিতে হইত। মেমসাহেবের মুখের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সে-ভাষা ফরাসি এবং পর্তুগিজ শব্দে পরিপূর্ণ। পাঠকও পাঠিকাগণ তাহা কিছুই বুঝিবেন না। আবার টমাস ঘনশ্যামও হিন্দুস্থানি লোক। অর্দ্ধ-হিন্দি অর্দ্ধ-বাঙ্গালায় কথা বলিত। সাবিত্রীর কথা তাহার বড় সহজে বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সাবিত্রীও তাহারকথা বুঝিতে পারিল না। টমাস ঘনশ্যাম অর্ধ-হিন্দি অর্ধ-বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা বুঝি খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বন করিতে আসিয়াছ?'

সাবিত্রী বলিল, 'আজ্ঞে আমার স্বামী আর ভাই জেলে পড়িয়াছে সেইজন্যে এখানে আসিয়াছি।'

টমাস ঘনশ্যাম মেমকে বুঝাইয়া বলিল, 'ইহার স্বামী নাই, জলে পড়িয়া মরিয়াছে; তাই এখন খৃষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিতে আসিয়াছে।'

মেম বলিলে, 'আচ্ছা ভাল, ইহাদিগকে বল সাহেব ঘরে আসিলে ইহাদের বিষয় যাহা হয় করিবেন।'

ফিলিপ গঙ্গারাম এই সময়ে গৃহের মধ্যে বসিয়া মেমসাহেবের জুতা ব্রাস করিতেছিল। স্ত্রীলোকের শব্দ শুনিয়াই সে বাহিরে আসিল। টমাস ঘনশ্যাম ফিলিপ গঙ্গারামকে বলিল যে, ইহারা খৃষ্টান হইতে আসিয়াছে। ফিলিপ গঙ্গারাম তখন বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ফিলিপ বাঙ্গালি সে অনায়াসে সাবিত্রীর সমুদয় কথাই বুঝিতে সমর্থ হইল, এবং সাবিত্রীরও তাহার কথা বুঝিতে কোনো কষ্ট হইল না। টমাস ঘনশ্যাম সাবিত্রীকে ফিলিপ গঙ্গারামের সহিত অধিক কথা বলিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিল যে, ফিলিপ হয়ত তাহার সর্বনাশ করিয়া এই বড় মেয়েটিকে নিজেই বিবাহ করিবে।

কিছুকাল পরে মেম সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিবার নিমিত্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফিলিপ গঙ্গারাম বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক ইহাদিগকে এই কুঠির মধ্যে একটা বৃক্ষতলে ভাত রাঁধিয়া খাইতে বলিল। ইহাদিগকে চাউল-ডাইল আনাইয়া দিল।

টমাস ঘনশ্যাম প্রায় তিন-চারি-ঘণ্টা পর্যন্ত মেমকে বাতাস করিতেছিল। মেম চলিয়া গেলে পর, সে তাহার নিজের ঘরে যাইয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল এবং তামাক টানিতে-টানিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—'সাবিত্রীর স্বামী জলে পড়িয়া মরিয়াছে—সাবিত্রী খৃষ্টান হইতে আসিয়াছে—সুতরাং বিবাহের বিলক্ষণ সুযোগ হইয়াছে; —কিন্তু একটি গুরুতর আশঙ্কা রহিয়াছে; —ফিলিপ গঙ্গারাম বড় চালাক,—সাবিত্রী হয়ত ফিলিপের হস্তগত হইয়া পড়িবে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে টমাস ঘনশ্যামের মনে ফিলিপ গঙ্গারামের বিরুদ্ধে

অত্যন্ত বিবেদ্বষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিষয়ের আর কোনো উপায়ান্তর নাই। অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ঠিক করিল যে, বড় মেয়েটা যদি একান্তই ফিলিপের হস্তগত হয়, তবে অগত্যা সে দ্বিতীয়টিকে বিবাহ করিবে। কিন্তু একবার ফিলিপের সঙ্গে এ-বিয়ে নিয়া তর্কবিতর্ক করিবে, এবং সাহেব ও মেম সাহেবকে এই বিষয়ের বিচার করিতে বলিবে।

টমাস ঘনশ্যাম তামাক টানিতে-টানিতে এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সে আবার ভাবিতে লাগিল—সাহেবের কুঠিতে অনেক ঘর নাই। ফিলিপ এবং সে দুইজনেই বারাণ্ডায় এক প্রকোষ্ঠে শুইয়া থাকে সুতরাং বিবাহের পর কোন স্থানে ঘর করিবে তাহাও মেমসাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

ফিলিপ গঙ্গারাম ইহাদিগকে চাউল-ডাইল আনাইয়া দিল। ইহারা ভাত রাঁধিতে কুঠি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃক্ষতলে চলিয়া গেলে পর, সে ঘনশ্যামের নিকটে আসিয়া সহস্য মুখে একত্রে বসিয়া তামাক খাইতে-খাইতে বলিতে লাগিল,—'ভাই টমাস! এতদিনের পর ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের দুই জনেরই একপ্রকার সঙ্গস্থা হইল। ইহাদের আত্মীয়-স্বজন যাহারা জেলে আছে তাহারা হয়ত মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিলেই পরে খৃষ্টধর্মাবলম্বন করিবে; খৃষ্টধর্ম অবলম্বন ভিন্ন ইহাদের আর কোনো উপায়ই নাই। কে ইহাদিগকে খাইতে দিবে?'

'ঘনশ্যাম বলিল, 'তুমি কী বলিতেছ। এই বড় মেয়েটার স্বামী জলে পড়িয়া মরিয়াছে। ছোট দুইটির ত বিবাহই হয় নাই।'

গঙ্গারাম। আরে, জলে পড়িয়া মরে নাই। বড় মেয়েটির স্বামী জেলে কয়েদ আছে।

ঘনশ্যাম। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। আমার নিকট বড় মেয়েটি নিজে বলিয়াছে যে তাহার স্বামী জলে পড়িয়া মরিয়াছে। আমাকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে বুঝি তুমি বলিতেছ যে বড় মেয়েটির স্বামী আছে।

গঙ্গারাম। বাপু তুই হিন্দুস্থানি ভূত; বাঙ্গালা কথা বুঝিতে পারিস না; তাই মনে করিতেছিস যে উহার স্বামী জলে পড়িয়া মরিয়াছে।

ঘনশ্যাম। ভাই তুমি বড় চালাক। ও-সকল চালাকি খাটিবে না। সাহেব এবং মেম বিচার করিয়া আমাকে ইহাদের মধ্যে যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন আমি সেইটিকেই বিবাহ করিব। তোমার চেয়ে আমার বয়স অধিক হইয়াছে। সাহেব এবং মেমসাহেব বিচার করিয়া যদি আমাকে সকলের ছোটটিকে বিবাহ করিতে বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ছোট ছয় বৎসরের মেয়েটিকে বিবাহ করিতে কোনো আপত্তি করিব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিচার প্রার্থী হইব। তুমি অন্যায় করিয়া বড় মেয়েটিকে নিতে পারিবে না।

গঙ্গারাম। তোর ত জ্ঞান নাই। ঐ ছোট দুইটির মধ্যের বড়টিকে যদি বিবাহ করিতে রাজি হইস, তবে কালই বিবাহ করিতে পারিস। ঐ ছোট দুইটির একটিরও বিবাহ হয় না।

সকলের বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী জেলে আছে। তাহার স্বামী যদি এখনও জীবিত থাকে, তবে বড়টির আশা তোমারও গেল আমারও গেল।

ঘনশ্যাম। হাঁ আমাকে ঠকাইবার জন্য এইরূপ চালাকি করিতেছ। টমাসের কাছে ও সকল চালাকি খাটিবে না। সাহেব বাড়িতে আসিলেই আমি এই বিষয়ের বিচার করিতে বলিব।

গঙ্গারাম। হাঁ আমাকে ঠকাইবার জন্য এইরূপ চালাকি করিতেছে। টমাসের কাছে ও সকল চালাকি খাটিবে না। সাহেব বাড়িতে আসিলেই আমি এই বিষয়ের বিচার করিতে বলিব।

গঙ্গারাম। আরে আহম্মক! আমার কথা যদি বিশ্বাস না-হয়, এখন আবার যাইয়া ঐ মেয়েটির নিকট জিজ্ঞাসা কর, তবেই সকল জানিতে পারিবি।

ঘনশ্যাম। তোমরা বাঙ্গালি জাত যে বড় দুষ্ট তাহা আমি জানি। ঐ মেয়েটিকে বুঝি এখন শিখাইয়া দিয়াছ যে তাহার স্বামী জেলে আছে বলিয়া আমার নিকট বলিবে। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। আমি কেবল সাহেবের এবং মেমের নিকট ইহার বিচার করিতে বলিব।

গঙ্গারাম। তুই নিতান্ত আহম্মক। তাই আমার কথা বিশ্বাস করিস না।

ঘনশ্যাম। বাপু তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না। তুমি রোজ-রোজ বাজার খরচের টাকা হইতে চারি-আনা ছয়-আনা চুরি কর। আবার যে-জিনিসের দাম দু-আনা, সেই জিনিসের দাম চারি আনা বলিয়া হিসাব বুঝাইয়া দেও।

গঙ্গারাম। ওরে হিন্দুস্থানি ভূত! বাজারের হিসাব দেওয়ার বিষয় কি ধর্ম্মপুস্তকে কিছু লেখা আছে? তুই নিজেও তো সেইদিন ছয়-আনা দিয়া কোদাল আনিয়া আট-আনা তাহার দাম বলেছিলি।

ঘনশ্যাম। আর তুমি নিজে চুরি কর সে কিছু নয়। আমি কোদালিখানার দাম আট আনা বলিয়াছিলাম বলিয়া মেম সাহেবের কাছে তাই বলিয়া দিলে। তুমি ভারি সরফরাজ। বাপু তুমি ও সকল কথা রাখিয়া দেও। সাহেব বিচার করিয়া তোমাকে যাহাকে বিবাহ করিতে বলেন, তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, আমাকে যাহাকে বিবাহ করতে বলেন, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।

অপরাহ্নে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব বাড়ীতে আসিলেন। সাবিত্রী দেখিল যে ইনি সৈদাবাদের ক্যারাপিট সাহেব নহেন। সুতরাং অত্যন্ত, অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কিন্তু কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব বড় দয়ালু ছিলেন। নিরাশ্রয় অনাথদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি ইহাদিগের প্রমুখাৎ ইহাদের সমুদয় দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে বলিলেন, 'আচ্ছা তোমাদের আত্মীয় স্বজন যাহারা কয়েদ রহিয়াছে তাহাদের খারাস হইবার কোনো উপায় আছে কি না, আমি এখনই তত্ত্ব লইব।'

এই বলিয়া তিনি গবর্ণর বেরেলস্ট সাহেবের কুঠিতে চলিলেন। কিন্তু আবার কী ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে করিলেন যে কলিকাতাস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত চ্যাপলেন (Chaplian) রেবারেণ্ড টীট্‌মার্শ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া গবর্ণরের কুঠিতে যাইবেন। সুতরাং তিনি টীট্‌মার্শ সাহেবের কুঠিতে চলিয়া গেলেন।

কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে যখন সাবিত্রীর কথাবার্তা হইল তখন টমাস ঘনশ্যাম বুঝিতে পারিল যে সত্যসত্যই সাবিত্রীর স্বামী জেলে কয়েদ রহিয়াছে। সুতরাং ফিলিপ গঙ্গারামের কথা এখন তাহার বিশ্বাস হইল। সে তখন ফিলিপ্‌কে ডাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা ভাই আমি আর এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহি না; জগদম্বা যে মেয়েটির নাম তাহার সঙ্গেই তুমি আমার বিবাহ জুটাইয়া দেও। কিন্তু কার্য যাহাতে শীঘ্র-শীঘ্র হয় তাহাই করিতে হইবে। অনেক বিলম্ব হইলে আবার কিসে কী হয় কে বলিতে পারে। আমাদের বিবাহ হইলে এই কুঠির পশ্চিমদিকে আমরা দুইখানি ঘর তুলিয়া লইব। তুমি কাল যখন বাজারে যাইবে তখন একটা ঘরামি ডাকিয়া আনিবে।'

এদিকে কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব টীটমার্শ সাহেবের কুঠিতে আসিয়া বলিলেন, 'দুইটি তাঁতি এবং একটি লবণব্যবসায়ী জেলে কয়েদ রহিয়াছে। শুনিলাম যে ইহাদের প্রতি নাকি বড় অত্যাচার হইয়াছে; চলুন আমরা গবর্ণর সাহেবের নিকট তাহাদের সকল অবস্থা বলিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি।'

রেবারেণ্ড টীটমার্শ সাহেব কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মেস্তর কিয়ারন্যাণ্ডার আপনি এই সকল বাঙ্গালিদের কথা শুনিয়া গবর্ণর সাহেবের নিকট কখন কোনো অনুরোধ করিবেন না। বাঙ্গালিজাতি বড় নরাধম, মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ। কেবল ইহাদের উপাকরের নিমিত্ত লর্ড ক্লাইব লবণের বাণিজ্য সম্বন্ধে এই নূতন সুনিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা সর্বদাই কেবল প্রতারণা, প্রবঞ্চনা করিতেছে। এই সকল পাপীদিগকে জেল হইতে ছড়িয়া দেওয়া নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ ইহাদিগের জরিমানার টাকা লবণের বাণিজ্যের তহবিলে জমা হয়। জরিমানা অদায় না হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এবং কোম্পানির সমুদয় কার্যকারকদিগেরই ক্ষতি হইবে। অন্য বিষয় দশটা অনুরোধ করুন। কিন্তু লবণের বাণিজ্যবিভাগ কাহারও জরিমানা হইলে সে-বিষয় মাপ করিতে কখনো গবর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করিবেন না।'

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই বৈধ লবণের বাণিজ্যের মুনফার টাকা হইতে খৃষ্টধর্মযাজক (Chaplian) রেবারেণ্ড টীটমাশ সাহেবও কিঞ্চিৎ অংশ পাইতেন। সুতরাং জরিমানার টাকা আদায় না হইলে তাহার নিজেরও ক্ষতি হয়। কোনো ব্যক্তির একশত টাকা জরিমানা হইলে ভাগের-ভাগ দুই চারি আনা টীটমাশ সাহেবের অংশেও পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় খৃষ্টধর্ম প্রচারক টীটমার্শ সাহেব যে কাহারও জরিমানা মাপ করিতে অনুরোধ করিবেন, তাহা কেহই প্রত্যাশা করিতে পারে না।

কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব আবার সাবিত্রীর স্বামী নবীন পাল এবং তাহার ভ্রাতা কালাচাঁদের বিষয় বলিলেন। রেশমের বাণিজ্যের লাভালাভ সম্বন্ধে টীটমার্শ সাহেবের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। এবার আর প্রবঞ্চক, প্রতারক ইত্যাদি সুললিত শব্দে বাঙ্গালিদিগকে অভিহিত করিলেন না। কেবল সাধুসুলভ ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিলেন, 'ভ্রাতঃ কিয়ারন্যাণ্ডার (brother Kiernandra) এইসকল বিষয়ে আমাদিগের হস্তক্ষেপ করা কোনোক্রমেই উচিত বোধ হইতেছে না। ইহারা আপন আপন জরিমানার টাকা কয়েকটা দিলেই তো মুক্ত হইয়া যাইতে পারে।'

কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব বলিলেন, 'তাঁতিদিগের প্রতি যে ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কি আপনি স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ ইহাদের আত্মীয়-স্বজন আর একটি পয়সাও দিতে পারে না।'

টীটমার্শ। এ-দেশীয় তাঁতীরা বড় অসচ্চরিত্র লোক। ইহারা পরিধেয় বস্ত্রের নিচে টাকা লুকাইয়া রাখে। ইহাদের আত্মীয়-স্বজন যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গে নিশ্চয়ই টাকা আছে।

কিয়ারন্যাণ্ডার। তাহাদিগকে কিরূপ অসচ্চরিত্র বলিতেছেন ? তাহারা দাদনের টাকা গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু আপনাদের লোকেরা বলপূর্বক তাহাদিগকে দাদনের টাকা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছেন।

টীটমার্শ। মূর্খ লোকের উপকার করিতে হইলে, তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে হইলে, বাধ্য করিয়া আনিতে হয়। এ-দেশীয় লোক তো এই পবিত্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনি কলে-কৌশলে তাহাদিগকে খৃষ্টান করিতেছেন। সেইরূপ আপন হিতাহিত না বুঝিয়া যাহারা দাদনের টাকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকশ করে, তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া দাদনের টাকা দিতে হয়।

কিয়ারন্যাণ্ডার। আপনি তো বিলক্ষণ সুযুক্তি অবলম্বন করিয়া রেশমের বাণিজ্যের দৌরাত্ম্য সমর্থন করিতেছেন। খৃষ্টধর্মে শিক্ষাপ্রদান এবং দাদনের টাকা প্রদান, একপ্রকার কার্য মনে করেন নাকি ?

টীটমার্শ। তা বই কী—আপনি তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন। ইহারা ব্যবসার উন্নতির নিমিত্ত, এবং তাঁতিদিগের যাহাতে অর্থসঞ্চয় হইতে পারে তন্নিমিত্তই দাদনের টাকা দিতেছে।

কিয়ারন্যাণ্ডার। কিন্তু দাদনের টাকা গ্রহণ করিয়া যে তাহারা সর্বস্বান্ত হইতেছে।

টীটমার্শ। প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিলে, চুক্তিমত কার্য না করিলে, অবশ্যই সর্বস্বান্ত হইবে।

কিয়ারন্যাণ্ডার। কিন্তু আপনাদের ইংরাজগণ যে তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে সম্মত হয়ে না।

টীটমার্শ। সংসারে সকলেই আপন লাভালাভ দেখি। ইংরাজগণ আপন লাভ ছাড়িয়া দিবে নাকি?

কিয়ারন্যাণ্ডার। কিন্তু লাভের নিমিত্ত কি এইরূপ দৌরাত্ম্য এইরূপ অত্যাচার করা উচিত? তবে দস্যুদিগকে নিন্দা করেন কেন?

টীটমার্শ। কিছু অধিক লাভ না হইলে এই গ্রীষ্মাতিশয়প্রধান দেশে আসিবার প্রয়োজন কি?

কিয়ারন্যাণ্ডার। তবে কি এ-দেশীয় লোকের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহর করিয়া, এইরূপ ঘোর অত্যাচার করিয়া লাভ করিতে ইচ্ছা করেন? এই কি ধর্মসঙ্গত কথা? এই কি বাইবেলের কথা?

টীটমার্শ। বাইবেলে তো লিখিত আছে যে 'তোমার নিজের মঙ্গল যেরূপ কামনা কর, সেই প্রকার তোমার প্রতিবাসীর মঙ্গল কামনা কর।' কিন্তু এইসকল কথা অনুসারে কি কেহ চলিতে পারে। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাইবেলের ও-সকল কথা খাটিতে পারে না।

কিয়ারন্যাণ্ডার। আপনি ধর্মযাজক (Chaplain) হইয়া এইরূপ বলিতেছেন।

টীটমার্শ। অনেকানেক লর্ড বিশপও এইরূপ মত প্রচার করেন।

কিয়ারন্যাণ্ডার। তবে আপনাদের এ-খৃষ্টধর্ম কেবল অর্থসঞ্চয় করিবার উপায়।

টীটমার্শ। ধর্ম অর্থ উভয়ই চাই।

কিয়ারন্যাণ্ডার। কিন্তু ধর্মের তো লেশও নাই। কেবল অর্থচিন্তাই দেখিতেছি। কিরূপে অর্থসঞ্চয় করিবেন তাহাই ইংরাজদিগের একমাত্র চিন্তা।

এই সময় টীটমার্শ সাহেবের ঘরে আহারের ঘণ্টা পড়িল। কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব পাদ্রি টীটমার্শ সাহেবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন যে তোমাদের যে-কসকল আত্মীয় লোক জেলে আছে তাহাদের জরিমানার টাকা আদায় না হইলে তাহাদের কয়েদ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখ টাকা সংগ্রহ করিতে পার কি না।

সাহেবের কথা শুনিয়া সাবিত্রী একবারে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল। কিন্তু তখন রাত্র হইয়াছে। রাত্রে এই সাহেবের কুঠির আয়াদিগের সহিত তাহারা তিনজনে এক প্রকোষ্ঠে শুইয়া রহিল। প্রাতে উঠিয়াই আবার সেই ক্যারাপিট আরাটুন সাহেবের কুঠির অনুসন্ধানে যাইবে বলিয়া স্থির করিল। সমস্ত রাত্রমধ্যে সাবিত্রীর আর নিদ্রা হইল না।

রজনী প্রভাত হইবামাত্র ইহারা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু ফিলিপ গঙ্গারাম এবং টমাস ঘনশ্যাম ইহাদিগকে বলিল, 'কলিকাতা শহর ভাল নহে। কোথায় যাইয়া কোন বিপদে পড়িবে; এখানেই থাক। সাহেবের নিকট ধর্মশিক্ষা করিতে পারিবে।'

সাবিত্রী কিছুতেই তাহাদের কথায় সম্মতা হইল না। তখন অগত্যা ফিলিপ তাহাদিগকে আহার করিয়া যাইতে বলিল। অহল্যা আহার না করিলে হাঁটিতে পারিবে না। সঙ্গে ইহাদের একটি পয়সাও ছিল না। সুতরাং কেবল অহল্যার নিমিত্ত সাবিত্রী আহার করিয়া যাইতে সম্মত হইল। পূর্বদিনের ন্যায় ফিলিপ তাহাদিগকে চাউল-ডাইল আনাইয়া দিল। তাহারা বৃক্ষতলে আহারের আয়োজন করিল। বেলা দশটার পর কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব পড়াইতে চলিয়া গেলেন। তাহার মেম বারাণ্ডায় আসিয়া একটা পৌচের উপর বসিলেন। ফিলিপ্ গঙ্গারাম প্রভৃতির অনুরোধে ইহাদিগকে খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। মেমের কথা সাবিত্রী কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং মেম যাহা-যাহা বলিল ফিলিপ তৎসমুদায় সাবিত্রীকে বুঝাইয়া বলিতে ছিল এবং সাবিত্রীর কথা আবার মেমকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল।

মেম। তুমি আরমানিয়ান সাহেবের কুঠিতে যাইতে চাও, তাহারা ভাল লোক নহে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে তিনি আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। আমি সেখানেই যাইব।

মেম। তুমি খৃষ্টধর্ম অবলম্বন কর, তোমার ভাল হইবে। খৃষ্ট আপন রক্ত দ্বারা জগত উদ্ধার করিয়াছেন।

সাবিত্রী। আজ্ঞে আমি এইসকল কথা কিছু বুঝি না।

মেম। খৃষ্টের বিষয় এখানে শিক্ষা করিলে ক্রমে বুঝিবে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে আমার ভাই এবং স্বামীকে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমার বাঁচিয়া কোনো ফল নাই।

মেম। ভাই এবং স্বামী কি স্বর্গ দিতে পারে? মুক্তি দিতে পারে? কেন তুমি নরকের দিকে চলিয়াছ?

সাবিত্রী। আজ্ঞে আমার ভাই এবং স্বামীই আমার স্বর্গ। তাহারাই আমার মুক্তি। আমি নরকে যাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিলে এখনই নরকে যাইব। আমার এ-প্রাণ দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিলে এ-প্রাণ দিতে এখনই প্রস্তুত আছি।

এই কথা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর চক্ষের জল দুইগণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

মেম আবার বলিলেন, 'এ-সংসারে ভাই অনেক মিলিবে। স্বামী মরিলেও স্বামী মিলিতে পারে। কিন্তু খৃষ্টকে না পাইলে সকলই বৃথা। অনন্ত নরকে জ্বলিয়া মরিতে হইবে।'

মেমের এই শেষের কথা শুনিয়া সাবিত্রী আর কোনো উত্তর প্রদান করিল না। তাহার প্লীহা চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ গুরুগোবিন্দ বাবাজীর কথা তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। গুরুগোবিন্দ বাবাজী তাহাকে প্রথম দিন বলিয়াছিলেন যে 'নবদুর্বাদলন্যাম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে যাহকে পতি বলিয়া পূজা করিবে তিনিই তোমার পতি।' পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে সাবিত্রী প্রথমতঃ গুরুগোবিন্দ বাবাজীর এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল না, পরে আখড়ায় আসিয়া যখন তিনি সাবিত্রীকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন,

তখন তিনি এই কথার অর্থও তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেইদিনই প্রথম গুরুগোবিন্দ বাবাজীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল। এবং তাহার পরদিনই সেই আখড়া পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এখন ভাবিতে লাগিল মেম যে-কথা বলিলেন তাহা ঠিক গুরুগোবিন্দ বাবাজীর কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মেম বলিতেছেন যে 'স্বামী মরিলেও স্বামী অনেক পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু খৃষ্টকে না পাইলে অনন্ত নরকে জ্বলিয়া মরিত হইবে।' গুরুগোবিন্দ বাবাজী বলিয়াছিলেন যে 'শ্রীকৃষ্ণই জগতের সমুদয় নারীর স্বামী, অতএব নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে যাহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিবে সেই তোমার পতি।' এই দুই জনের কথার মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে তাহা সাবিত্রীর বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে। সে জানিত যে স্বামী মরিলে আর স্বামী পাওয়া যায় না। আজীবন বিধবা থাকিতে হয়। মেমের কথার অর্থ এই যে স্বামী মরিলেও বিধবাগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। গুরুগোবিন্দ বাবাজীর মতানুসারে এ-সংসারে স্ত্রীলোকের পতির অভাবই হয় না। নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে একজনকে পতিরূপে গ্রহণ করিলেই হইল। কিন্তু অশিক্ষিতা সাবিত্রী মনে করিল যে, মেম যাহা বলিলেন ঠিক সেই কথাই গুরুগোবিন্দ বাবাজী ভক্তি-রসপূর্ণ ভাষাতে বলিয়াছিলেন। এই ভাবিয়া সে মনে করিল যে সর্বনাশ হইয়াছে আমরা বিলাতী বৈষ্ণবের আখড়ায় আসিয়া পড়িয়াছি।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠক ও পাঠিকাগণ 'বিলাতী বৈষ্ণব' এই শব্দ পাঠ করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু এই অষ্টাদশ শতাব্দীর অশিক্ষিত সরলা রমণীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সে বিলাতী বৈষ্ণবের হাতে পড়িয়াছে। ইহার পর কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবের মেম সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিলেন, সাবিত্রী তাহার একটি কথারও উত্তর প্রদান করিল না। সে মৌনাবলম্বন পূর্বক বসিয়া রহিল এবং সময়ে সময়ে চলিয়া যাইবার নির্মিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিল। এক-একবার উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেই ফিলিপ গঙ্গারাম বলিত, 'এ রৌদ্রে হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না, বেলাবসানে গেলেই চলিবে।' কিন্তু সাবিত্রী বড় ত্রাসিত হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—'দয়াময় পরমেশ্বর—বিপদভঞ্জন হরি তোমার কৃপায়ই এপর্যন্ত আমার ধর্মরক্ষা হইয়াছে। আমার এখন এক ধর্ম ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। পরমেশ্বর বর্তমান বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

মেম অনেক কথার পর বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন?'

অনেকক্ষণ পর সাবিত্রী বলিল, 'আজ্ঞে আমি কী বলিব। আমার ভাই এবং স্বামীকে না পাইলে আমার প্রাণ যায় যাউক, আমার নরকে যাইতে হয় যাইব। আমি তাহাদিগকে একবার চক্ষে দেখিতে চাই।'

মেম। সে ভাই এবং স্বামীর কথা ত বারম্বার বলিয়াছ। তুমি যে ঘোর বিপদে পড়িবে।

সাবিত্রী। আজ্ঞে, বিপদ-সাগরেই ভাসিতেছি, বিপদে পড়িব কী?

এই সময় ফিলিপ গঙ্গারাম মেমকে বলিল, মেম সাহেব ও নিজে কুপথে যাইতে চায় যাউক, ওর স্বামী আছে ও তাহার কাছেই যাউক। কিন্তু এই ছোট মেয়ে দুটিকে আপনি এখানে রাখিয়া ধর্ম শিক্ষা দিলে ইহাদের উদ্ধারের উপায় হইতে পারে।

ফিলিপ মনে করিয়াছিল যে ছোট দুইটিকে রাখিতে পারিলে জগদম্বাকে সে বিবাহ করিবে; অহল্যার প্রতিপালনের ভার ঘনশ্যামের হাতে প্রদান করিবে।

মেম তখন ফিলিপের অনুরোধে সাবিত্রীকে বলিলেন, 'তুমি নিজে কুপথে যাইতে চাও যাও। কিন্তু এই ছোট মেয়ে দুটিকে এখানে রাখিয়া যাও। আমরা ইহাদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিব।'

সাবিত্রী। আজ্ঞে তাহা আমি পারিব না। ইহাদের বড় ভগ্নী মৃত্যুকালে ইহাদিগকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন। আমি ইহাদের পিতার নিকট ইহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিব।

সাবিত্রী যখন মেমকে ত্রস্ততা সহকারে এইরূপে বলিতেছিল, তখন অহল্যা এবং জগদম্বা উভয়ে তাহার অঞ্চল জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের ভয় হইল যে পাছে সাবিত্রীর নিকট হইতে কেহ তাহাদিগকে বলপূর্বক লইয়া যায়।

অবশেষে মেম বলিলেন, 'তোমরা কাল বাঙ্গালি। তোমাদের মন বড় কালো। ধর্মের কথা কিছুতেই তোমাদের মনে প্রবেশ করে না।' এই বলিতে বলিতে তিন বিশ্রামার্থ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। টমাস ঘনশ্যাম তালবৃন্ত হস্তে করিয়া তাঁহার পাছে পাছে চলিয়া গেল। শতবৎসর পূর্বে এই দেশে টানা পাঙ্খা প্রচলিত ছিল না। ঘনশ্যামকে গ্রীষ্মকালে সর্বদাই পাঙ্খা হাতে করিয়া মেমের পাছে পাছে থাকিতে হইত।

ফিলিপ গঙ্গারাম ইহাদিগের নিকট বসিয়া রহিল। সে বারম্বার সাবিত্রীকে বলিতে লাগিল, 'তুমি মেমের কথা মত কার্য কর। ইহাতে তোমার ভাল হইবে। তোমার ভাই এবং স্বামী জীবিত আছে কি মরিয়াছে কে বলিতে পারে?'

এই কথা শুনিয়া সাবিত্রীর দুই চক্ষু হইতে দর-দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। সাবিত্রী আর তাহার কথায় কোনো প্রত্যুত্তর করিল না। কিছুকাল পরে ফিলিপ গঙ্গারামও কার্যান্তরে চলিয়া গেল। তখন ইহারা তিনজনে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল।

সাবিত্রী জগদম্বাকে বলিল, 'জগদম্বা! আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে, আমরা বোধহয় বিলাতী বৈষ্ণবের হাতে পড়িয়াছি। এখন শীঘ্র শীঘ্র এই স্থান হইতে পলাইতে না পারিলে আর উদ্ধার নাই।'

জগদম্বা বলিল, 'দিদি আমিও তাই মনে করিতে ছিলাম। এ বিলাতী বাবাজীদের বাড়িই হইবে। এই স্ত্রীলোকটি বুঝি বিলাতী আখড়ার অধিকারিণী ঠাকুরানী। কাল আমি দেখিয়াছি এনার মাথায় চুল নাই। ইনি বুঝি অল্প দিন বৈষ্ণবী হইয়াছেন।'

সাবিত্রী বলিল, 'কেন ইহার মাথায় যে অনেক লম্বা লম্বা চুল আছে।'

জগদম্বা। না দিদি। রাত্রে সন্ধ্যার পর মাথার ঐ চুলগুলো খুলিয়া আয়ার হাতে দিলেন। সে কাপড়ের সঙ্গে চুলগুলো রাখিয়া দিল।

সাবিত্রী। তবে বুঝি বিলাতী বৈষ্ণবীরা মাথার চুল খুলিয়া আবার একটা নূতন রকমের চুল মাথায় দিয়া থাকে।

জগদম্বা। তাই হইবে।

সাবিত্রী। এই যে দুইটি পুরুষ লোক আমাদের খাবার চাউল-ডাইল আনিয়া দিয়াছিল, ইহারা বুঝি এই আখড়ার চেলা?

জগদম্বা। তাই হইবে। আজ প্রাতে দেখিয়াছি সাহেব কী একটা পুস্তক পাঠ করিল; আর ইহারা দুইজন হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিল।

সাবিত্রী। তবে বিলাতী বৈষ্ণবেরা কি পুঁথি শুনিবার সময় হাঁটু গাড়িয়া বসে?

জগদম্বা। বোধহয় তাই হবে। বিলাতী জিনিস আর আমাদের দেশী জিনিস তো এক রকম নহে।

ইহারা যখন এইরূপ কথা-বার্তা বলিতে ছিল, সেই সময় কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব স্কুল হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার নিকট ইহারা বলিল যে, আমরা ক্যারাপিট সাহেবের কুঠিতে যাইব। কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কেবল একবার বলিলেন যে, তোমরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছ ইচ্ছা করিলে এখানে থাকিয়া ধর্ম শিক্ষা করিতে পার। সাহেবের কথায় ইহারা সম্মত হইল না; ইহারা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সাহেব তখন মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন যে শুনিয়াছি ইহাদের সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই নাই, অতএব ইহাদিগকে দুই-চারিটি টাকা দিলে ইহাদের কষ্ট দূর হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা ইহাদিগকে দিবার নিমিত্ত বাহির করিলেন। কিন্তু মেমসাহেবের টাকা দিতে বড় মত হইল না। আবার চেপলেন টীটমার্শ সাহেবের কথা তাঁহার মনে হইল। টীটমার্শ সাহেব বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালি জাতি বড় দুষ্ট, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে টাকা লুকাইয়া রাখে।' কেবল মেমের কথায় সাহেব টাকা দিতে বিরত হইতেন না। টীটমার্শ সাহেবের কথা স্মরণ হইবা মাত্র টাকা পাঁচটি আবার বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। বারান্দায় আসিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের সঙ্গে টাকা পয়সা কিছু নাই, তোমাদের কিরূপে চলিবে?'

সাবিত্রী বলিল, 'পরমেশ্বর একটা উপায় করিয়া দিবেন।'

কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেব তখন ভাবিতে লাগিলেন যে টীটমার্শ সাহেবের কথা সত্য হইতে পারে; তাহা না হইলে আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিত; উপধর্মাবলম্বী বাঙ্গালি কি পরমেশ্বরের উপর কখনো এরূপ নির্ভর করিতে পারে?

সাবিত্রী জগদম্বা এবং অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের কুঠি হইতে বাহির হইল এবং বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল।

বেলা অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে সাবিত্রী জগদম্বা এবং অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত তাহার নিকটই ‘ক্যারাপিট সাহেবের কুঠি কোথায়’ এই কথা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু ইহাদের কী ঘোর বিপদ! ফৌজদারী বালাখানার পশ্চিমদিকে একখানি ক্ষুদ্র বাড়িতে ক্যারাপিট সাহেব তখন বাস করিতেছিলেন। ইহারা তাহার বাড়ি অনুসন্ধানার্থ লালদীঘির নিকট হইতে গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর দক্ষিণাভিমুখে খিদিরপুরের দিকে চলিল। এই অনাথা কন্যা তিনটির সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। কেবল মাত্র তিনজনের পরিধানে তিনখানি মলিন ছিন্ন বস্ত্র। ইহারা সারম্যান সাহেবের পুল (Surman Bridge) পার হইয়া আরও দক্ষিণে চলিতে লাগিল। পরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আলিপুর আসিয়া পৌঁছিল। তখন মেঘাড়ম্বর হইয়া চতুর্দিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, ঘন ঘন মেঘের গর্জন হইতে লাগিল। প্রব ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। অন্ধকারে চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পায় না। মেঘের গর্জনে কর্ণেও কিছুই শুনিতে পায় না। পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে পাছে অন্ধকারের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় সাবিত্রী দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা অহল্যার এবং বাম-হস্ত দ্বারা জগদম্বার হাত ধরিয়া রাস্তার পার্শ্বে সেই অনাবৃত স্থানে বসিয়া পড়িল।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর ঝড় থামিল। কিন্তু বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন বিদ্যুতালোকে সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া সেই বৃক্ষতলে যাইয়া তিনজন বসিয়া রহিল। এই ঘটনার পাঁচ সাত বৎসর পরে এই বৃক্ষতলে ফিলিপ ফ্রান্সিস হেস্ট্রিংস্ সাহেবের সঙ্গে সম্মান রক্ষার্থ সংগ্রাম (duel) করিয়াছিলেন।

এই অনাথা, আশ্রয়হীনা নিরপরাধিনী কন্যাত্রয়ের দুরবস্থা স্মরণ হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঈদৃশ বিপন্নাবস্থা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। সর্বজন ঘৃণিত ধুন্দপন্থ নানা বিগত সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে নিরপরাধিনী ইংরাজ রমণী এবং অসহায় নির্দোষী বালক-বালিকাদিগের প্রাণবিনাশ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত ভারতের বীরগৌরব মহারাষ্ট্রীয় নাম কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। ইতিহাসে সে নিষ্ঠুর, নরপিশাচ, রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার নাম শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু পাঠক! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি শতবর্ষ পূর্বে যে সকল অর্থগৃধ্নু কঠিন হৃদয় এবং স্বার্থপরায়ণ ইংরাজদিগের অর্থলোভ পরিতৃপ্তার্থ বঙ্গের সহস্র-সহস্র নিরপরাধিনী রমণী সাবিত্রীর ন্যায় দুরবস্থাপন্না হইয়াছিল, যাহাদের অর্থগৃধ্নুতা নিবন্ধন সহস্র সহস্র অসহায় নির্দোষী বালক-বালিকাদিগকে জগদম্বা এবং অহল্যার ন্যায় বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হইয়াছিল, পরম ন্যায়বান মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ন্যায়-বিচারে তাহারা কি ধুন্দপন্থ নানা অপেক্ষা সমধিক অপরাধী বলিয়া সাব্যস্তহয় নাই? কেবল তাহারা কেন? শত বৎসর পূর্বে যে-সকল বঙ্গকুলাঙ্গার ইংরাদিগের এই অত্যাচারে সাহায্য করিয়াছিল—যে সকল বঙ্গ কুলাঙ্গার কাপুরুষতা নিবন্ধন সহানুভূতি পরিশূন্য হইয়া দূরস্থিত দর্শকের ন্যায় এই সকল অত্যাচার অম্লানবদনে দর্শন করিতে লাগিল ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারে তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইয়াছে।

উনিশ
স্বপ্নে ভগবদ্ দর্শন

সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃক্ষতল কর্দমময় হইয়াছিল। ইহারা তিনটি অনাথা স্ত্রীলোক সমস্ত রাত্রি সেই কর্দমময় বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতে লাগিল। অহল্যা সপ্তমবর্ষ বয়স্কা বালিকা, তাহার থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রার আবেশ হইতে লাগিল। পরদুঃখকাতরা সাবিত্রী তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া বসিয়া রহিল। সে নিজে সমস্ত রাত্রি মনে-মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'দয়াময় হরি, এই কষ্ট যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর, প্রণ যায় যাউক কিন্তু মৃত্যুকালে একবার যেন স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখ দেখিতে পাই; এত দূর আসিয়াও যদি তাহাদিগকে না দেখিয়া মরিতে হয়, তবে মনে বড়ই দুঃখ থাকিবে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাবিত্রীর নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইল। সে অল্প রাত্রি থাকিতে অহল্যাকে বুকে করিয়া মৃত্তিকার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িল। রজনী ঘোর অন্ধকার, জগদম্বা তাহার পার্শ্বে নীরব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অচৈতন্যাবস্থায় সাবিত্রী স্বপ্ন দেখিল—যেন স্বয়ং ভগবান তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, 'বাছা তোমার হৃদয়ের পবিত্র ভাব দর্শন করিয়া আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।' তৎক্ষণাৎ সাবিত্রী স্বপ্নাবস্থায় বলিয়া উঠিল, 'প্রভো আমার স্বামীকে এবং ভ্রাতাকে উদ্ধার কর, এই দুঃখিনী বালিকাদ্বয়ের পিতাকে উদ্ধার কর।' সাবিত্রী স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ বলিয়া উঠিবামাত্র অর্ধনিদ্রিতা জগদম্বা এবং অহল্যা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'দিদি, কাহার সহিত কথা বলিলে?'

সাবিত্রীর সংস্কার ছিল যে স্বপ্নের কথা কারও নিকট রাত্রে বলিতে নাই, অতএব সে নিরুত্তর রহিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিষাদময়ী রজনীও অবসিত হইল। গগনে সূর্যোদয় হইবামাত্র সমগ্র ধরণী আলোকিত হইল। বৃক্ষ পার্শ্বস্থ পথ দিয়া শত-শত স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে যাইতে লাগিল।

সাবিত্রী, জগদম্বা এবং অহল্যা তিনজনেই কর্দমময় সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরিহিত বস্ত্র ভিন্ন সঙ্গে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। সাবিত্রী জগদম্বাকে বলিল, 'অহল্যার অল্প বয়স ইহার মত ক্ষুদ্র বালক-বালিকার বিবস্ত্র হইলে কোনো লজ্জা নাই, ইহাকে কিছুকালের জন্য উলঙ্গ করিয়া বৃক্ষের আড়ালে রাখিয়া ইহার কাপড়খানি

পরিয়া আমরা একে একে আপনাপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আনিব। গঙ্গায় গিয়া একবার স্নান করিব। আমাদের পাপের জন্য এত কষ্ট পাইতেছি, গঙ্গাস্নান করিলে যদি পাপ ক্ষয় হয় তাহা হইলে আমাদের কষ্ট দূর হইতে পারে।'

এই বলিয়া তাহারা অহল্যাকে উলঙ্গ করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড় করাইয়া রাখিল। সাবিত্রী তাহার বস্ত্রখানি পরিধান পূর্বক গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিল এবং পরে নিজের বস্ত্র ধৌত করিয়া সেই সিক্ত বস্ত্র পরিধানপূর্বক জগদম্বাকে অহল্যার বস্ত্রখানি আনিয়া পরিতে দিল। জগদম্বাও সেইরূপে অহল্যার বস্ত্রখানি পরিধান করিয়া আপন বস্ত্র ধৌত করিল এবং পরে অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া আনিল। ইহারা তিনজনেই স্নানান্তে ঘাটের লোকারণ্য হইতে কিছু দূরে যাইয়া আপনাপন সিক্ত বসন রৌদ্রতাপে শুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ইহাদিগের উপর নিপতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে দূরস্থিত বৃক্ষতল হইতে ইহারা এক-এক করিয়া আসিয়া স্নান করিতেছে এবং স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিতেছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া ইহারা যে-স্থানে বসিয়াছিল সেই স্থানে আসিলেন এবং বারম্বার সস্নেহ লোচনে ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে করুণাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'বাছা তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? আমার বোধ হয় সম্প্রতি তোমরা কোনো দুরবস্থায় পড়িয়াছ। তোমরা কোথায় যাইবে বল দেখি?'

সাবিত্রী অপরিচিত লোকের সঙ্গে বড় কথা বলিতে না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেই স্নেহপরিপূর্ণ কণ্ঠ এবং তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্তি তাহার হৃদয় হইতে সকল আশঙ্কা অপনোদন করিল।

সাবিত্রী বলিল, 'আমরা সৈদাবাদের ক্যারাপিট আরাটুন সাহেবের কুঠিতে যাইব।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বাছা তোমরা হিন্দুর মেয়ে, আরাটুন সাহেবের কুঠিতে যাইবে কেন?

সাবিত্রী। আজ্ঞে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি।

বৃদ্ধ। তোমাদের কী বিপদ আমার নিকট ভাঙ্গিয়া বল দেখি। তোমাদের ভয় নাই। আমি যদি তোমাদের কোনো উপকার করিতে পারি অবশ্যই করিব।

সাবিত্রী তখন অনুপূর্বক আত্মবিবরণ এবং জগদম্বা অহল্যার সমস্ত বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণের নিকট বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া যখন স্বীয় পিতা সভারামের নাম করিল, তখন বৃদ্ধ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আহা বাছা! তুমি সভারামের কন্যা।' এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি সাবিত্রীর সকল কথা শুনিবার জন্য এতদূর উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথায় বাধা দিলেন না। সাবিত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার সমুদয় কথা শেষ হইলে বৃদ্ধ-স্পন্দহীন পুত্তলীর ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্তে, অনিমিষেনেত্রে এই কন্যাত্রয়ের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। তাহার মুখে আর কথা নাই। সাবিত্রীর তখন পূর্বরাত্রের স্বপ্নের কথা স্মরণ হইল। তাহাদের দুরবস্থা শ্রবণে বৃদ্ধকে এইরূপ শোককুল হইতে দেখিয়া সে মনে ভাবিতে লাগিল যে মনুষ্যের মধ্যে ত এত দয়া দেখি নাই। কত লোকের নিকট দুঃখের কথা বলিয়াছি, কেহই ত আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া এত কাতর হয় নাই। হয়ত ইনি সেই ভগবান হইবেন।

সাবিত্রী পূর্বে অনেক আখ্যায়িকার শুনিয়াছে যে ভগবান শ্রীহরি সময় সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দুঃখী পাপীকে দর্শন দিয়া থকেন। সুতরাং সে একেবারেই অবধারণ করিল যে এ আর কিছুই নহে, গঙ্গা স্নান করিয়া তাহাদের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া স্বয়ং শ্রীহরি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। এই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল গলায় জড়াইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে লুঠাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—

‘কাল স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহাই সত্য হইল। আপনি কি সেই বিপদভঞ্জন হরি! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এই দুঃখিনীদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন? আপনি নিশ্চয়ই সেই বিপদভঞ্জন হরি। আপনার শ্রীচরণ আর ছাড়িব না। আমার ভ্রাতা এবং স্বামীকে উদ্ধার না করিলে এখনই এই শ্রীচরণের নিকট প্রাণ বিসর্জন করিব। ভগবান বিপদভঞ্জন হরি আর আমাকে কত দুঃখ দিবে?’

সাবিত্রীর ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই কন্যাত্রয়ের সঙ্গে তিনিও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সাবিত্রীর বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল যে ইনি নিশ্চয়ই বিপদ ভঞ্জন হরি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। দেবতা না হইলে কি মনুষ্যের অন্তরে এত দয়া থাকে?

বস্তুত এই বৃদ্ধের স্নেহ পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিলে ইহাকে সত্য-সত্যই দেবতা বলিয়া বোধ হইত।

কিছুকাল পরে বৃদ্ধ শোকাবেগ সম্বরণপূর্বক বলিলেন, ‘বাছা তোমরা এখানে আশ্রয়হীনা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ। তোমরা আমার সঙ্গে চল, তোমাদের আত্মীয় স্বজন যাহাতে কারাগার হইতে মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।’

সাবিত্রী এখনও বৃদ্ধের পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ তাহাকে ধীরে ধীরে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। পিতার হস্তস্পর্শে সন্তানের শরীর বিমলানন্দে যদ্রূপ রোমাঞ্চিত হয়, সাবিত্রীর শরীর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তস্পর্শে ঠিক সেইরূপ পুলকিত হইল। হৃদয়স্থিত পবিত্র ভাব মানুষের শরীরকে বোধহয় পবিত্র করে। ধর্ম এবং সাধু চরিত্র নিশ্চয়ই রক্ত-মাংসকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। ইতিপূর্বে যখন একদিন গুরুগোবিন্দ বাবাজী সাবিত্রীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন তখন তাহার অনুভব হইতেছিল যেন তাহার হস্তে তীক্ষ্ণ কণ্টক সকল বিদ্ধ হইয়াছে।

সাবিত্রী হিতাহিত চিন্তা না করিয়া, পিতৃপদানুসারিণী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় নিতান্ত অসদিগ্ধ চিত্তে জগদম্বা এবং অহল্যার সহিত সেই বৃদ্ধের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কি দূর যাইয়া বৃদ্ধ একখানি সুপরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিবামাত্র একটি ছয় বৎসরের বালকের হস্ত ধরিয়া একটি রমণী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে দেখিলে সহসা ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। রমণীর রূপরাশিতে গৃহখানি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু সে রূপ বর্ণনা করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সূর্যমণ্ডল আপনার প্রদীপ্ত রশ্মিজালে বেষ্টিত বলিয়া তাহার আকৃতি কেহ নিরূপণ করিতে পারে না। এই রমণীর আননচ্ছবি ধর্ম, পবিত্রতা, দয়া ও স্নেহের উজ্জ্বল কিরণে সম্যকউদ্ভাসিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহার শারীরিক সৌষ্ঠব দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। ইহার অনিন্দ্য রূপরাশির বর্ণন-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক আমরা স্থানে স্থানে কেবল ইহার সদ্‌গুণ সমূহের উল্লেখ করিব।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহই প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বেলা চারিদণ্ডের সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। কিন্তু আজ স্নানান্তে সাবিত্রীর বিবরণ শ্রবণ করিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। তাঁহার আগমনবিলম্ব দর্শনে রমণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন। রমণী গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াই বিশেষ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন—

'বাবা আজ প্রাতঃস্নান করিয়া আসিতে আপনার এত বিলম্ব হইল কেন ? আমি আপনার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'এই কন্যা তিনটির জন্যই একটু বিলম্ব হইয়াছে। ইহারা বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। শুনিলাম গতকল্য ইহারা কিছু আহার করে নাই। আমাদের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় ইহাদিগকে আহার করিতে দাও। পরে তোমাকে আমাদের জন্য আবার রন্ধন করিতে হইবে।'

সাবিত্রী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'বাবা আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতাস্বরূপ। আপনার জন্য যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমরা প্রাণ গেলেও স্পর্শ করিব না। আপনারা অগ্রে আহার করুন, আমরা আপনাদের পাতের প্রসাদ খাইব।'

সাবিত্রী এবং জগদম্বা কোনোক্রমেই আহার করিতে সম্মত হইল না। অহল্যাকে রমণী অন্নব্যঞ্জন আনিয়া দিলেন। বালিকা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। রমণীর প্রদতত অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া কিছু সুস্থ হইল। রমণী সাবিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার নিকট তাহার আত্মবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাবিত্রী যখন বলিল যে, সে সৈদাবাদের সভারাম বসাকের কন্যা তখন রমণী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে কী! তুমি সভারাম বসাকের কন্যা ? তোমার পিতা পূর্বে আমাদের প্রজা ছিল। পরে নিজে লাখেরাজ জমি পাইয়া সেই জমির মধ্যেই ঘর বাড়ি করে।'

সাবিত্রী বলিল, 'আপনি কি আমাদের দেশের প্রমদা দেবী ? আপনাকে দেখিয়া আজ

আমার চক্ষু সার্থক হইল। দেশশুদ্ধ লোক আপনার সদ্‌গুণের প্রশংসা করে। আপনি বুড়া নবাবের পণ্ডিতের কন্যা।'

প্রমদা বলিলেন, 'হ্যাঁ। যিনি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন তিনিই আমার পিতা—বাপুদের শাস্ত্রী। তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে সকলে বুড়া নবাবের পণ্ডিত বলিয়া থাকে।'

সাবিত্রী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। তাহার মনে মনে আশা হইল যে নিশ্চয়ই বুড়া নবাবের পণ্ডিত তাহার স্বামী ও ভ্রাতাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন। সে শৈশবাবধি শুনিয়াছে যে বুড়া নবাবের পণ্ডিত বড় ধার্মিক, তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন।

প্রমদা দেবীর নিকট সে আনুপূর্বিক আত্মবিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলে বাপুদেব সেখানে আসিয়া বলিলেন—

'মা তোমাকে আমি এখন এ-সকল কথা শুনিতে দিব না। তুমি এই সকল শোচনীয় ঘটনা শুনিলে আবার মুর্ছিত হইয়া পড়িবে। তুমি ইহাদের আহারের আয়োজন কর। পরে ক্রমে-ক্রমে সকল কথা শুনিতে পাইবে। আমি নিজে তোমার নিকট ইহাদের দুঃখের কথা বলিব।'

প্রমদার দয়াপ্রবণ হৃদয়ে পরের দুঃখ সহ্য হইত না। তাঁতিদিগের ভয়ানক দুরবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে, তিনি সময় সময় মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কালীঘাটে আনিয়া রাখিয়াছেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই পরদুঃখকাতরা প্রমদা দেবীর নাম একবার উল্লিখিত হইয়াছে।

কুড়ি
বাপুদের শাস্ত্রী

এই উপন্যাসের প্রারম্ভেই বাপুদের শাস্ত্রীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাপুদের শাস্ত্রী কে, তাহা এখন পর্যন্ত পাঠকগণ জানিতে পারেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে বাপুদেব শাস্ত্রীর পরিচয় প্রদান করিতেছি।

শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে এই বাপুদেব শাস্ত্রীই একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র ত্রিদণ্ডধারী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত নরপিশাচ কুলের মধ্যে ব্রাহ্মণের কোনো সদ্‌গুণই পরিলক্ষিত হইত না।

মহারাজ মানসিংহ যখন প্রথমবার বঙ্গদেশে আগমন করেন তখন তিনি স্বীয় গুরু বাসুদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই বাসুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশানুসারে মহারাজ মানসিংহ আকবরের সহিত স্বীয় ভগ্নীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাসুদেব অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। মানসিংহের এই নিয়ম ছিল যে, তিনি যাত্রাকালে গুরুদেবের চরণ বন্দনা না করিয়া কখন সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন না। কোনো সংগ্রামে যাইতে হইলে গুরুদেবেই তাঁহার যাত্রাকাল নিরুপণ করিয়া দিতেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে, পাণ্ডবকুলতিলক ভারতের বীরগৌরব মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রথমত বাণদ্বারা স্বীয় গুরু দ্রৌণাচার্যের চরণ বন্দনা করিতেন বলিয়াই তিনি বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে গুরুচরণ বন্দনাপূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কেহ কখনো পরাজিত হয় না। এই সংস্কারবশত তিনি গুরুদেবকে সর্বদা অতি সমাদরের সহিত সঙ্গে-সঙ্গে রাখিতেন।

বাসুদেব শাস্ত্রীর জন্মস্থান পাঞ্জাবে ছিল। তাঁহার চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদেব শাস্ত্রী পিতার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। মানসিংহ বঙ্গদেশে কিছুকাল অবস্থানপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতা বাসুদেব শাস্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুপুত্র কৃষ্ণদেব শাস্ত্রী বঙ্গদেশে অবস্থানকালে ঢাকা অঞ্চলের অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই কৃষ্ণদেব শাস্ত্রীর পুত্র রামদেব শাস্ত্রীও বিক্রমপুরেই জীবন অতিবাহিত করেন। রামদেব শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর শাসন সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইল। রামদেব

শাস্ত্রীর পুত্র জয়দেব শাস্ত্রী তখন বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই জয়দেব শাস্ত্রীর অনুরোধেই মহারাজ রাজবল্লভ নবাব সরকারের কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ এই দুই প্রদেশেই জয়দেব শাস্ত্রীর যথেষ্ট নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি ছিল। ইহার বার্ষিক আয় দশ সহস্র মুদ্রার ন্যূন ছিল না।

জয়দেব শাস্ত্রীর ঔরসে গৌরী দেবীর গর্ভে বাপুদেবের জন্ম হয়। গৌরী দেবী অতি সহৃদয়া, ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি পরমাসুন্দরী, কিন্তু অত্যন্ত খর্বাকৃতি ছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তাঁহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় দেখাইত। কিন্তু সাধ্বী সুশীলা গৌরী দেবী সংসারে সুখ-সম্ভোগের অধিকারিণী হইলেন না। সন্তান শোকে তাঁহার মুখকমল নিয়ত বিষণ্ণ ও অশ্রুসিক্ত থাকিত। গৌরী দেবীর ক্রমে-ক্রমে নয়টি সন্তান জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে পাঁচটিরই অতি শৈশবে মৃত্যু হইল। কেবলমাত্র তিনটি কন্যা এবং সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান বাপুদেব জীবিত ছিলেন। বাপুদেবের জন্ম হইবার পূর্বেই গৌরী দেবীর অপর পাঁচটি সন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং বাপুদেব একদিনও তাঁহার জননীর হাস্যমুখ অবলোকন করেন নাই। বাল্যকালে তাঁহার জননী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সন্তানশোকে সর্বদাই বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন, বোধহয় সেইজন্যই বাল্যাবস্থা হইতে বাপুদেবের হৃদয় অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে বিশেষ কাতর হইত। মাতার সদৃষ্টান্তে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রতি বাপুদেবের বিশেষ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। বাপুদেব তাঁহারমাতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং তিনি অতি যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে অতি বাল্যকালে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের কিছুকাল পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হইল।

বাপুদেবের পিতা জয়দেব শাস্ত্রী একজন ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ধর্মভাব বিশেষ প্রবল ছিল। বাপুদেব বাল্যকাল হইতেই পিতার মুখে অনেক ধর্মের কথা শুনিতেন। তাঁহার মাতৃবিয়োগের প্রায় চতুর্দশ বর্ষ পরে তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইল।

ধর্মভীরু পিতার ঔরসে এবং সহৃদয়া জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই ধর্মের প্রতি বাপুদেব বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। প্রবল ধর্মতৃষ্ণা এবং বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার প্রতি কার্যেই পরিলক্ষিত হইত। অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয় দুঃখে কাতর হইয়া পড়িত। তিনি পরোপকারার্থে অনেক অর্থব্যয় করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ঢাকা অঞ্চলের অধিকাংশ পৈতৃক নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিতে হইল। অন্যান্য জমিদার যদ্রূপ প্রজাপীড়নপূর্বক তাহাদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত, বাপুদেব কিন্তু প্রজাগণের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিতেন না। তাঁহার সমুদয় প্রজাই একপ্রকার নিষ্কর জমি ভোগ করিত। তিনি কাহারও নিকট কখনো কর চাহিয়া লইতেন না। কিন্তু

প্রজাগণ তাঁহাকে যারপরনাই শ্রদ্ধা করিত এবং পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা আপনা হইতেই বাপুদেবের আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যাদি প্রদান করিত। প্রজাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক ছিল। তন্তুবায় কোনো উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিলে তাহা বাপুদেব শাস্ত্রীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিত; কৃষকগণ স্বীয়-স্বীয় ক্ষেত্রজাত অত্যুৎকৃষ্ট শস্যের তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত। কাহারও উদ্যানে কোনো ভাল ফল উৎপন্ন হইলে, সে সর্বাগ্রে বৃক্ষের প্রথম ফল ভূম্যধিকারীকে প্রদান করিত; তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ ধার্মিক ভূম্যধিকারীকে বৃক্ষের প্রথম ফল প্রদান করিলে বৃক্ষ অতিশয় ফলবতী হইবে। এইজন্য বাপুদেবের গৃহে কোনো কালে কোনো দ্রব্যের অভাব হইত না। তাঁহার শতাধিক প্রজা ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই দুই-একদিন অন্তর আপনাপন ক্ষেত্রোৎপন্ন বা উদ্যানজাত দ্রব্যাদি শাস্ত্রী মহাশয়কে উপহার প্রদান করিত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সংসারে কোনো ভাবনা ছিল না। তিনি দিবারাত্র শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, অপর সন্তান ছিল না। বাপুদেব বাল্যবিবাহের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে কন্যাটিকে নবম বর্ষে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পুত্র নাই, জামাতাকে গৃহে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কন্যার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে জামাতার মৃত্যু হইল। একমাত্র সন্তানের চির বৈধব্য যন্ত্রণা এই দয়াবতী সাধ্বীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। অনতিবিলম্বে তিনি দুঃখ তাপ পূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় নিজেও জামাতৃ বিয়োগে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি পরম জ্ঞানী, স্বীয় জ্ঞান বলে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণপূর্বক দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পরম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্বদা মনুষ্যের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করেন; কাহাকেও পীড়া দান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; অতএব এই বিপদরাশির মধ্যে অবশ্যই বিধাতার কোনো মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে। চিন্তার সহিত নানা শাস্ত্র পর্যালোচনা করিতে করিতে তিনি নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিলেন যে, এই বিপদরাশির মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত লুক্কায়িতভাবে কার্য করিতেছেন। তিনি কি যুক্তি অবলম্বনপূর্বক এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং এই মর্মপীড়ক বিপদ-জালের মধ্যে বিধাতার কি নিগূঢ় অভিপ্রায় দর্শন করিলেন, তাহা কাহারও নিকট কখনো প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মন যে প্রবোধিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার আচরণ দৃষ্টে স্পষ্টই অনুভূত হইত।

স্ত্রী-বিয়োগের পর শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন না, মাতৃস্থানীয় হইয়া স্বয়ং সস্নেহে কন্যাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং তাহাকে বিবিধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

* * *

একদিন সায়ংকাল বাপুদেব শাস্ত্রী গঙ্গাতীরে বসিয়া সন্ধ্যাক্রিয়া সমাপনান্তে উঠিবামাত্র দেখিলেন, সেই ঘাটের অদূরে সৈনিক পরিচ্ছদধারী জনৈক মুসলমান গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নিকটে যাইয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, 'কী হে মুসলমান কুলতিলক! তুমি কবে বঙ্গের সুবাদার হইবে তাহাই ভাবিতেছ? যদি সিংহাসনে আরোহণ করিতে চাও তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকতার সোপান পরিত্যাগ কর, এ-সোপানে যে পদার্পণ করিবে তাহার পতন নিশ্চিত। সম্মুখ সংগ্রামে সরফরাজকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা কর।'

সৈনিকপুরুষ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সুপ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল এবং হতবুদ্ধির ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শাস্ত্রী পুনরায় বলিলেন, 'তুমি সৎপথ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই দুই বৎসরের মধ্যে সুবাদার হসতে পারিবে; সরফরাজের রাজত্ব শেষ হইয়াছে।'

সৈনিকপুরুষ বড়ই বিস্মিত হইলেন, মনে-মনে ভাবিলেন, 'এ কী ব্যাপার! আমি মনে-মনে যাহা চিন্তা করিতেছি, এ-ব্যক্তি কিরূপে তাহা জানিতে পারিল? এ তো সামান্য লোক নহে!' প্রকাশ্যে বলিলেন, 'মহাশয় আপনি কিছুকালের নিমিত্ত এ স্থানে উপবেশন করুন, আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।'

শাস্ত্রী। বাপু আর কী জিজ্ঞাসা করিবে? কুপথ অবলম্বন না করিলে তুমি দুই বৎসরের মধ্যে সুবাদার হইতে পারিবে। সরফরাজের রাজত্ব আর দুই বৎসরের অধিক থাকিবে না, এখন তুমিই সুবাদার হও, আর অন্য একজনই হউক।'

সৈনিকপুরুষ। মহাশয় আপনি আমাকে চিনেন কি?

শাস্ত্রী। বাপু, তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। তুমি আলিবর্দি খাঁ। তুমি কতদিনে কিরূপে বঙ্গের সুবাদার হইবে এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছিলে।

সৈনিকপুরুষ। মহাশয় কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না। সত্য-সত্যই আমি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন?

শাস্ত্রী। তোমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিয়াছি, তাহা শুনিয়া তুমি কী করিবে? তোমাকে বলিতেছি যে কুপথ অবলম্বন না করিলে নিশ্চয়ই দুই বৎসরের মধ্যে সুবাদার হইতে পারিবে।

সৈনিকপুরুষ। মহাশয় কুপথ কাহাকে বলিতেছেন?

শাস্ত্রী। যে উপায় মনে মনে স্থির করিতেছিলে। বাপু, বিষদান করিয়া সরফরাজের প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিও না। এরূপ আচরণ কাপুরুষের কার্য। সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে পরাস্ত হইতে চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে।

সৈনিকপুরুষ। আপনি কিরূপে বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে?

শাস্ত্রী। সরফরাজের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

সৈনিকপুরুষ। তাহাই বা কিরূপে জানিলেন?

শাস্ত্রী। আমাদের শাস্ত্রের কথা কখনো মিথ্যা হয় না।

সৈনিকপুরুষ। আপনাদের শাস্ত্রে কি লিখিত আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বাপুদেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'ওরে মূর্খ মুসসলমান, তবে আমার কথা শ্রবণ কর। নারীজাতির পবিত্রতা যে কী মহামূল্য পদার্থ, তাহা তোদের মত ম্লেচ্ছে কখনো বুঝিতে পারে না। তোমরা নিতান্ত জঘন্য জাতি। তোদের নিজের বীরত্বে কিম্বা পুণ্যফলে আমাদের দেশ কখনো জয় করিতে পারিতে না। এ দেশীয়েরা আপনাপন পাপাচার ও স্বার্থপরতার ফলে যবন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে। যাহা বলিতেছি মনে রাখিও। সাধ্বী রমণীগণ লক্ষ্মীস্বরূপা, স্বয়ং ভগবতী হৈমবতীর তেজঃ অংশ দ্বারা তাহাদের হৃদয় মন গঠিত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি কোনো নরপিশাচ সেই লক্ষ্মীস্বরূপা সাধ্বী রমণীকে অপমান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পরমায়ু তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের এই মত স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদন করিবার জন্য কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি রামায়ণ নামক মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণের একস্থানে লিখি আছে।

দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিবোন চক্ষুষা।
কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যজহার পিতামহঃ।
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণ্যস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুধ্বা যদৃচ্ছয়া।

সীতাকে রাবণ অপমান করিবামাত্রই তাহার আসন্ন বিনাশ নির্দ্ধারিত হইল। সরফরাজ যখন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে অপমান করিয়াছে তখনই তাহার রাজত্ব ও তাহার পরমায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। সেই পরম সাধ্বী নিরপরাধিনী এখন পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অশ্রুবারি হইতে কালানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সরফরাজকে ভস্মীভূত করিবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিত্যাগপূর্বক সম্মুখ-সংগ্রামে সরফরাজকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে।'

আলিবর্দি খাঁ বলিলেন, 'মহাশয়, যদি দুই বৎসরের মধ্যে আমি সুবাদার হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে সহস্র বিঘা জমি লাখেরাজ করিয়া দিব। আপনার কথা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কিরূপে আমার মনের কথা জানিলেন।'

বাপুদেব বলিলেন, 'তোমার আবশ্যক হইলে সহস্র বিঘা লাখেরাজ আমি তোমাকে অনায়াসে দান করিতে পারি। মানসিংহের প্রদত্ত, ঢাকা অঞ্চলে দশ-বার হাজার বিঘার নিষ্কর ভূমি আমার পতিত রহিয়াছে। আমাকে তুমি অর্থলোভী ব্রাহ্মণ মনে করিও না। আমি তোমার নিকট লাখেরাজ ভূমি চাহি না, আমার পৈতৃক ভূমি অনেক ছিল, এখনও

যথেষ্ট আছে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলিতেছি— তুমি দুই বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই সুবাদার হইতে পারিবে। বঙ্গের সুবাদারি লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে; কিন্তু সুবাদারি রক্ষা করা বড় কঠিন। সুবাদারি প্রাপ্ত হইয়া যদি নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে চাহ, তবে কখনো কোনো সাধ্বীর প্রতি অত্যাচার করিও না; কায়মনোবাক্যে প্রজার হিতসাধনে রত থাকিও। তাহা হইলে তোমার রাজপদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।'

এই বলিয়া বাপুদেব শাস্ত্রী গাত্রোত্থান করিলেন। আলিবর্দি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন, 'মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আর একটু অপেক্ষা করুন, আর দুই একটা কথা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিব।'

বাপুদেব পুনর্বার উপবেশন করিলেন। আলিবর্দি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, আপনি কী মহারাজ মানসিংহের গুরুর বংশোদ্ভব?

বাপুদেব বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ মানসিংহের গুরু বাসুদেব শাস্ত্রী আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন।'

আলিবর্দি বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সুবাদারি পদ লাভ করিতে পারিলে আপনার পরামর্শানুসারে রাজ্য শাসন করিব। আপনার বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রসাদেই মহারাজ মানসিংহ সর্বত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন। আপনারা যে অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। যাহারা অর্থাকাঙ্ক্ষী তাহারা স্বার্থসাধনার্থ নবাবদিগকে কুপরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু আপনার স্বার্থ নাই, আপনি নিশ্চয়ই যাহা ভাল বুঝিবেন সেই বিষয়ে আমাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।'

এইরূপ কথাবার্তার পর বাপুদেব শাস্ত্রী গৃহে চলিয়া গেলেন, আলিবর্দি খাঁও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনার একবৎসর পরে আলিবর্দি সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বঙ্গের সুবাদার হইলেন। তিনি বাপুদের শাস্ত্রীর পরামর্শে নারীজাতির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মুসলমান সুবাদার সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র তাহাদের পূর্ববর্তী সুবাদারের বেগমদিগকে নিজের অন্তঃপুর ভুক্ত করিতেন। কিন্তু আলিবর্দি খাঁ তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন। সরফরাজের মাতা মুরশিদ কুলি খাঁর কন্যাকে* তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সরফরাজের বেগদিগকে তিনি আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রজাদিগের যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

প্রায় প্রত্যেক দিবসই তিনি গুপ্ত মন্ত্রগৃহে বসিয়া বাপুদেব শাস্ত্রীর সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেন এবং বাপুদেব যে উপদেশ প্রদান করিতেন প্রাণপণে তাহা প্রতিপানল

*Vide note (17) in the appendix.

করিতে চেষ্টা করিতেন। বাপুদেব তাঁহার গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি প্রত্যেক দিবসই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহার চরণোপরি স্থাপন করিতেন।

এইরূপে বাপুদেবের পরামর্শানুসারে কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া আলিবর্দি খাঁ নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসনপূর্বক ১৭৫৬ সালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজকে দুইটি উপদেশ প্রদান করিয়াছি লেন। প্রথমত বলিলেন, 'বৎস, ইংরাজদিগকে প্রবল হইতে দিবে না, ইহাদিগকে যাহাতে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে।'

দ্বিতীয়ত বলিলেন, 'আমার পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহারই পরামর্শানুসারে রাজ্য শাসন করিবে। তিনি অর্থাকাঙ্ক্ষী নহেন; কতবার আমি তাঁহকে অর্থ, ভূমি এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তিনি কখনো আমার কোনো দান গ্রহণ করেন নাই।'

দুর্বৃত্ত সিরাজ মাতামহের প্রথম উপদেশ পালন করিতে যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কুসংসর্গে নিপতিত হইয়া দ্বিতীয় উপদেশ একেবারেই বিস্মৃত হইল।

তাহার সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুকাল পরে সমবয়স্ক কয়েকটা নরপিশাচের পরামর্শে সে রাজসাহী প্রদেশের রাজা রামকৃষ্ণের ভগ্নী, রানী ভবানীর কন্যা, তারা ঠাকুরানীর ধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিল। রানী ভবানী এবং রাজা রামকৃষ্ণের প্রতি দেশশুদ্ধ সমুদয় লোকের বিশেষ ভক্তি ছিল। সিরাজ এই নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলে পর, দেশের সমুদয় লোক তাহার শত্রু হইল। জগৎশেঠ রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, খোজা ওয়াজিদ প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান লোক সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত গোপনে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে পর, মহারাজ রাজবল্লভ একদিন বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকট গমন করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে সকল পরামর্শ হইয়াছে তৎসমুদয় বিবৃত করিলেন।

বাপুদেব শাস্ত্রীর পিতার অনুরোধেই বিক্রমপুরের কৃষ্ণজীবন মজুমদারের পুত্র রাজবল্লভ মজুমদার প্রথমত নবাব সরকারের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে স্বীয় বুদ্ধিবলে এখন তিনি একজন প্রধান রাজপুরুষের পদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ রাজবল্লভ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী মহারাজ রাজবল্লভের পরম উপকারী বান্ধব, সুতরাং তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে সমুদয় গুপ্তকথা বাপুদেবের নিকট প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাপুদেব ঘৃণা প্রকাশপূর্বক বলিলেন, 'রাজা রাজবল্লভ! তোমাদের চক্রান্তকারিদিগের মধ্যে একজনেরও মনুষ্যাত্মা নাই। তোমরা সকলেই নিতান্ত নীচাশয় এবং কাপুরুষ। না হইলে এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও কুকার্য দ্বারা জীবন কলঙ্কিত করিতে উদ্যুক্ত হইতে না।'

রাজবল্লভ। মহাশয়, এইরূপ দুর্বৃত্ত, কুক্রিয়াসক্ত নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করা কি কুকার্য?

শাস্ত্রী। সিরাজকে এই মুহূর্তেই সিংহাসনচ্যুত করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা কর। প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য কর, বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা পৃথিবীতে নিকৃষ্টতর কার্য আর কী হইতে পারে?

রাজবল্লব। কৌশল ভিন্ন আর কী উপায় আছে?

শাস্ত্রী। সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাস্ত কর।

রাজবল্লভ। এইরূপ দুষ্কর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে কেহ সাহস করে না।

শাস্ত্রী। তবে তোমরা নিশ্চয়ই কাপুরুষ। তোমাদের এই কার্য দ্বারা দেশের বড় অমঙ্গল হইবে।

রাজবল্লভ। দেশের কী অমঙ্গল হইবে?

শাস্ত্রী। দেশ অধঃপাতে যাইবে। কুকার্য হইতে কখনো সুফল উৎপন্ন হয় না। ইংরাজ বণিকের সহায়তা গ্রহণপূর্বক তোমরা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবে, অতঃপরে জাফর সুবাদারি প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজ বণিকের গোলাম হইয়া পড়িবে। অর্থলোভী ইংরাজ বণিকগণ অর্থলোভে দেশ সর্বস্বান্ত করিবে, চারিদিকে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিবে—সিরাজের অত্যাচার হইতে শতগুণে অধিকতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে।

রাজবল্লভ। কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া পরাজিত হইলে আমাদিগের প্রাণ বিনাশ হইবে, তদ্দ্বারা দেশের কোনো উপকারই সাধিত হইবে না।

শাস্ত্রী। তোমরা সম্মুখ-সংগ্রামে বিনষ্ট হইলেও দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। পরাজিত হইলেও উপকার আছে। স্বাধীনতা রক্ষার্থ সংগ্রামানল একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে, শতবর্ষেও তাহা নির্বাসিত হয় না। যতকাল স্বাধীনতা লাভ না হইবে, ততকাল এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে; পুরুষ পরম্পরায় ক্রমে বর্ধিতভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিবে। সমর-নিহত পিতৃ পিতামহের শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদ তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সগৌরবে পরিধান পূর্বক দ্বিগুণতর উৎসাহে শত্রু সম্মুখীন হইবে।

রাজবল্লভ। তবে আপনি আমাদের এ-পরামর্শ অনুমোদন করেন না?

শাস্ত্রী। আমি এইরূপ কুকার্যের অনুমোদন করি কিনা, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমাদের এই ষড়যন্ত্র আমি সর্বান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করি। তোমরা সকলেই আপনাপন মৃত্যুবাণ নির্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছ। এই দুষ্কর্মের ফল নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

রাজবল্লভ। ইহার অশুভ ফল কী হইবে?

শাস্ত্রী। তোমরা প্রত্যেকেই হয় ইংরাজের হাতে, না হয় মুসলমানদিগের হাতে প্রাণ হারাইবে।

রাজবল্লভ। আপনার এরূপ আশঙ্কা করিবার ত কোনো কারণ দেখিতেছি না।

শাস্ত্রী। তোমার মত অন্ধ ভবিষ্যগর্ভনিহিত সেই সকল কার্যকারণ শৃঙ্খল কিরূপে দেখিবে?

রাজবল্লভ। আপনি গুরু—আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ভাবী অমঙ্গলের কারণ বুঝাইয়া দিলেই ত বুঝিতে পারি।

শাস্ত্রী। বুঝাইয়া বলিলেও তুমি বুঝিবে না। তোমাদের ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে, আর ইংরাজদিগের দৃষ্টি তাহাদের বাণিজ্যের উপর; দেশ কিসে সুশাসিত হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারও দৃষ্টি নাই; সুতরাং পরস্পরের স্বার্থরক্ষার্থ যখন বিবাদ উপস্থিত হইবে, তখন একে অন্যের বিনাশ সাধনে সচেষ্ট হইবে—ঘোর অরাজকতা-নিবন্ধন দেশ উৎসন্ন হইবে।

রাজবল্লভ। মীরজাফর নবাব হইলে আমাদের পরামর্শানুসারে কার্য করিবেন, আমরা দেশের সুশাসনের চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রী। ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠির সাহেবেরা যখন বাণিজ্য উপলক্ষে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদিগেকে কে শাসন করিবে?

রাজবল্লভ। মীরজাফর শাসন করিবেন।

শাস্ত্রী। মীরজাফর যে তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়িবে। মীরজাফর শাসন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের ভয়ে মীরজাফর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবে না।

রাজবল্লভ। তবে আপনি কী করিতে বলেন?

শাস্ত্রী। অন্যের সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া নিজ বাহুবলে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা কর। এখন যাহারই সাহায্যে সিরাজকে পদচ্যুত করিবে, পরিণামে সেই দেশের প্রকৃত অধিপতি হইবে, তাহার অত্যাচারে দেশ ছারখার হইবে।

রাজবল্লভ। আমাদের অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইব—নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইব।

শাস্ত্রী। এইমাত্র বলিয়াছি যে পরাজিত হইলেও মঙ্গল। তোমরা প্রাণ হারাইলেও তাহা হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। এই সংগ্রামানল শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রজ্জ্বলিত রহিবে, তোমাদের আরব্ধ যজ্ঞের ফলে তোমাদের পুত্র পৌত্রাদিগণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। সংসারে জন্মিলেই মৃত্যু আছে। মৃত্যুকে এত ভয় কর কেন? একদিন-না-একদিন নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, তবে না হয় দুই বৎসর পূর্বেই মরিলে।

বাপুদেব শাস্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া রাজবল্লভ নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে বাপুদেব আবার বলিলেন, 'রাজবল্লভ, আমি তোমাকে বারম্বার বলিতেছি এ-কুকার্য দ্বারা স্বীয় নাম কলঙ্কিত করিও না। তোমরা সৈন্য সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ্যে সিরাজের সহিত

সম্মুখ-সংগ্রামে অগ্রসর হও। যে-কুকার্য করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ তজ্জন্য সবংশে তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। দেশ ত অধঃপাতে যাইবেই, তোমার কামনাও সিদ্ধ হইবে না, তোমার ভাবী বংশাবলীর দিনান্তে অন্ন জুটিবে না।'

রাজবল্লভ কোনো প্রত্যুত্তর না করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের চরণে প্রণামপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাজা রাজবল্লভ এবং মীরজাফর প্রভৃতির চক্রান্তে সিরাজের সহিত ইংরাজদিগের পলাশী ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইল। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরমদন এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মোহনলালের বিক্রমে ভারত হইতে ইংরাজ নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন মোহনলালের অক্ষয়কীর্তি দ্বারা বঙ্গের ইতিহাস সমুজ্জ্বলিত হইল না। অনিচ্ছাপূর্বক নবাবসৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা যুদ্ধে বঙ্গে আধিপত্য স্থাপনে সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বঙ্গের সুবাদার হইলেন। ইংরাজ বণিকদিগের নিকট তিন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠির সাহেবগণ কিম্বা দেশীয় গোমস্তাগণ বাণিজ্যোপলক্ষে প্রজাদিগের প্রতি কোনো অত্যাচার করিলেও তিনি সে-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কিন্তু অন্য কেহ ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্য কুঠির লোকদিগের সহিত বিবাদ করিতে আসিলে, তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে হইবে।

মীরজাফর এইরূপে ইংরাজ বণিকদিগের অধীনতা স্বীকার করিলে পর, ইংরাজগণ তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণের প্রতি যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব-পূর্ব অধ্যায়ে সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রজাদিগের মধ্যে অন্যূন ত্রিশ ঘর তন্তুবায় ছিল। তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইবামাত্র, তাহারা অনেকেই দেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল। হলধর তাঁতির স্ত্রী ও কন্যাকে ছিদাম বিশ্বাস অপমান করিয়াছিল বলিয়া সে ছিদামকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিল। তাহার স্ত্রী ও কন্যা তাহার পথানুসরণ করিল। হলধরের পুত্রটিকে বাপুদেব রক্ষা করিলেন। পরে তিনি স্বীয় কন্যা প্রমদা দেবীকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে আসিলেন। তদবধি এই স্থানেই বাস করিতেছেন।

একুশ
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং নন্দকুমার

বাপুদেব শাস্ত্রীর সহিত কিরূপে মহারাজ নন্দকুমারের পরিচয় হইল এবং ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা এ-পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমারের জন্ম হয়। কিন্তু এই গ্রাম এবং ইহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ সম্প্রতি বীরভূম জেলার অন্তর্ভুত হইয়াছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে পদ্মনাভ রায় তিন-চারটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের কার্য করিতেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর অনুরোধেই তিনি নবাব সরকারে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নন্দকুমার স্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বাপুদেব শাস্ত্রীর বাটিতে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার প্রখর বুদ্ধি এবং সহৃদয়তা দর্শনে বাপুদেব ইহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র ছিল না, তাঁহার ব্রাহ্মণী পুত্র নির্বিশেষে ইহাকে যত্ন করিতেন। নন্দকুমার অন্যূন আট বৎসর কাল বাপুদেবের নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ন করিলেন এবং তৎসঙ্গে পারস্য ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন ইহার বয়স প্রায় দ্বাবিংশতি বর্ষ, তখন বাপুদেবের অনুরোধে আলিবর্দি খাঁর সরকারে মহিষাদল পরগণার রাজস্ব আদায়ের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর আলিবর্দির আমলেই নন্দকুমার হুগলির ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংরাজগণ নন্দকুমারের অনুগ্রহ প্রত্যাশী ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠির সাহেব এবং বাঙ্গালী গোমস্তাগণ, তন্তুবায় সুবর্ণবণিক প্রভৃতি দেশীয় বণিকদিগের উপর অত্যাচার পূর্বক দেশীয় বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত প্রদানে উদ্যত হইলে দেশের মধ্যে একমাত্র নন্দকুমারই সেই অত্যাচারের অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেশের অন্যান্য লোক ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠির গেমস্তা পদে নিযুক্ত হইবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিত; এবং যে-সকল বাঙ্গালী ইংরাজ বণিকদিগের গোমস্তার পদে কিম্বা বেনিয়ানের পদে নিযুক্ত হইত, তাহারা সকলেই ছিদাম বিশ্বাস, নবকৃষ্ণ মুন্সী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক দেশীয় লোকের সর্বনাশ করিয়া অবৈধ উপায় অবলম্বনপূর্বক অর্থ সঞ্চয় করিত।

ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবকৃষ্ণ মুন্সী ক্রমে দেশের একজন প্রধান লোক হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত নন্দকুমারের ঘোর শত্রুতা ছিল। নন্দকুমার ইংরাজ বণিকদিগের

অত্যাচারের অবরোধ করিতেন বলিয়া ক্লাইব প্রথমত নন্দকুমারকে হস্তগত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মীরজাফর ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধার্থে বর্ধমান, হুগলি এবং নদিয়া এই তিন জিলার রাজস্ব ইংরাজদিগকে আদায় করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ক্লাইব এই তিন জিলার রাজস্ব আদায়ের ভার হেষ্টিংস সাহেবের হস্ত হইতে উঠাইয়া আনিয়া নন্দকুমারের হাতে সমর্পণ করিলেন। এই সময় হইতেই অর্থাৎ ১৭৫৮ সন হইতে নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের মনোবাদের সূত্রপাত হইল।*

কিন্তু ক্লাইবের আশা নিষ্ফল হইল। নন্দকুমারের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াও তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। সুতরাং ইহার পর হইতে স্বয়ং ক্লাইবও নন্দকুমারের পরম শত্রু হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে নন্দকুমার মুখেই ইংরাজদিগের প্রতি সৌহার্দ প্রকাশ করে, কিন্তু মনে মনে সে সর্বদাই ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় সমুদয় ইংরাজই নন্দকুমারকে হিংসা করিত। নন্দকুমারের অন্তরেও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ক্রমে বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

১৭৫৮ সালে নন্দকুমার স্বীয় গুরু বাপুদেব শাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মুর্শিদাবাদে আসিলেন। ইহার পূর্বে নন্দকুমারের সঙ্গে প্রায় পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে বাপুদেব শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় নাই। নন্দকুমার পাঁচ-সাত বৎসর পর্যন্ত হুগলিতেই অবস্থান করিতেছিলেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর সহধর্মিণী নন্দকুমারকে বাল্যকালে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। নন্দকুমার বাপুদেবের অনুগ্রহেই হুগলির ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর ফৌজদারের কার্য করিয়া প্রায় দুই-তিন লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। হুগলী হইতে আসিবার সময় সোদরাসদৃশী প্রমদা দেবী এবং মাতৃতুল্যা গুরুপত্নীকে উপহার প্রদান করিবেন বলিয়া কয়েকখানি বহুমূল্য অলঙ্কার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই স্নেহময়ী গুরুপত্নীর মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রমদা দেবী বিধবা হইয়াছেন।

এই সংবাদ শ্রবণে নন্দকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে উৎকোচ ইত্যাদি গ্রহণ করিলেও নিতান্ত পাষাণহৃদয় ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় দয়া, মায়া, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল। যাঁহাদিগের নিমিত্ত এত যত্ন করিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে, আর একজনের অলঙ্কার পরিধান করিবার অধিকার লোপ পাইয়াছে। এই সকল বহুমূল্য অলঙ্কার যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা আর গুরুদেবের নিকট প্রকাশও করিলেন না। তিনি বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জননীসদৃশী গুরুপত্নীর হস্তে এই সকল আভরণ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে সে আশা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে

*Vide note (18) in the appendix.

হইল। সহোদরাসদৃশী প্রমদা বিধবা হইয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি একবার মনে করিলেন এই সকল বহুমূল্য আভরণ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবেন। কারণ ইহা দেখিলেই তাঁহার শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আবার ভাবিলেন এই বহুমূল্যের আভরণ পোড়াইয়া ফেলিলে কী হইবে। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন এই সকল অলঙ্কার অন্য কোনো স্থানে রাখিয়া দিবেন। পরে প্রমদা দেবীর কখনো টাকার আবশ্যক হইলে, এই আভরণ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য তাঁহাকেই প্রদান করিবেন।

এই ভাবিয়া তিনি গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই, অপরাহ্নে মুর্শিদাবাদস্থ তাঁহার জনৈক অনুগত লোক বোলাকি দাসের দোকানে চলিয়া গেলেন এবং তাহার দোকানে আভরণ আমানত রাখিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

বোলাকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সকল আভরণ কি এখনই বিক্রয় করিতে হইবে?'

তিনি বলিলেন, 'এখন এই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এখন ইহার মূল্যের টাকা লইয়া গেলে তাহা ব্যয় হইয়া যাইতে পারে। এই সকল আভরণের মূল্যের টাকা প্রমদা দেবীকে দিতে হইবে।'

বোলাকির* সহিত এই সকল কথা বলিয়া রাত্রে আবার গুরুদেবের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে গুরুর সহিত নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

বাপুদেব বলিলেন, 'মনুষ্য সমাজ হইতে দুবলের প্রতি বলবানের অত্যাচার একেবারে নিবারণ করিবার কোনো উপায় নাই। মানবসমাজ একেবারে পাপ ও স্বার্থপরতা শূন্য না হইলে প্রচলিত অত্যাচার বিশ্বসংসার হইতে কখনো অন্তর্হিত হইবে না। সংসারে পাপ এবং স্বার্থপরতা যত বৃদ্ধি হয়, দুর্বলের প্রতি বলবানের সেই পরিমাণে অত্যাচারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু ইংরাজ-বণিকগণের অত্যাচার একপ্রকার ডাকাতি। দুর্বৃত্ত সিরাজের সময়ও এইরূপ অত্যাচার ছিল না।** মীরজাফরের দুর্বলতা নিবন্ধনই এইরূপ হইতেছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে মীরজাফর অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক। রাজকার্য করিবার তাহার কোনো ক্ষমতা নাই। সর্বদা অহিফেন সেবন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় কালযাপন করে। ইহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করা অপেক্ষা একটা পশুর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে ভাল হইত।

নন্দকুমার। রেশমের কুঠির সাহেব ও বাঙ্গালী গোমস্তাগণ তো দেশ উৎপন্ন করিল। তাহারা লোকের বাড়িঘর লুট করিতেছে। তন্তুবায়গণ অন্য স্থানে যে বস্ত্র বিক্রয় করিলে

---

*Vide note (19) in the appendix.

*Vide note (20) in the appendix.

পঞ্চাশ টাকা পাইতে পারে, সেই বস্ত্রের নিমিত্ত দশ টাকার অধিক তাহাদিগকে দিতে সম্মত হয় না। আমি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই এ-অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিব।

শাস্ত্রী। যদি মীরজাফর পদচ্যুত করিয়া বঙ্গের সুবাদারি গ্রহণপূর্বক ইংরাজগণকে শাসনাধীনে আনিতে পার, তবেই কেবল ইংরাজ বণিকদিগের অনুষ্ঠিত এই অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। মীরজাফরের দেওয়ান হইয়া কোনো অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিবে না।

নন্দকুমার। মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা কি সহজ ব্যাপার?

শাস্ত্রী। অহিফেনাসক্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য জাফরকে পদচ্যুত করা অতি সহজ ব্যাপার।

নন্দকুমার। ইংরাজের তাহার সাহায্য করিবে।

শাস্ত্রী। এই দুই চারিটা বিদেশীয় বণিকের সাহায্যে কি হইতে পারে?

নন্দকুমার। আমার বোধ হয় দিল্লীর সম্রাট এবং ফরাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেই এই বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারি।

শাস্ত্রী। অন্যের সাহায্যে মানুষ কখনো দেশাধিকার করিতে পারে না। নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

নন্দকুমার। আমার নিজের কী এমন বল আছে যে দেশের সুবাদারের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব?

শাস্ত্রী। মানসিক বল থাকিলেই চলে। হৃদয়ে বল থাকিলে এখনই কৃতকার্য হইতে পার।

নন্দকুমার। মানসিক বল থাকিলে কি কেহ সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে পারে?

শাস্ত্রী। সৈন্য আপনা হইতেই সংগৃহীত হয়।

নন্দকুমার। আপনা হইতে কিরূপে সংগৃহীত হইবে?

শাস্ত্রী। অত্যাচার নিবারণার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইলে, অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমার নিজের হৃদয়স্থিত নিঃস্বার্থ প্রেম এই মৃতপ্রায় জাতির অন্তরে বল প্রদান করিবে।

নন্দকুমার। একজন বাঙ্গালীও আমার অনুসরণ করিবে না। দেশের লোক কিরূপে ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠিতে গোমস্তার কার্যে নিযুক্ত হইয়া দশ টাকা লাভ করিবে তাহারই কেবল চেষ্টা করে।

শাস্ত্রী। তুমি একবার আমার উপদেশানুসারে কার্য কর, দেখ কৃতকার্য হইতে পার কি না।

নন্দকুমার। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইব।

শাস্ত্রী। জয় পরাজয়ের চিন্তা করিয়া কেহ সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে না। জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাতে। পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজগণ একেবারে পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈবঘটনাপ্রযুক্ত আবার তাহাদেরই জয় হইল। মনে কর যেন নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। তাহাতেই বা ক্ষতি কী?

নন্দকুমার। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলে তাহাতে লাভ কী?

শাস্ত্রী। পরাজিত হইলেই দেশের বিশেষ উপকার হইবে। তুমি নিজে চরম সদগতি লাভ করিবে। বঙ্গ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তোমার নাম মুদ্রিত থাকিবে। সমগ্র বঙ্গবাসীদের মৃত দেহে জীবনের সঞ্চার হইবে। যে সংগ্রামানল একবার প্রতীপ্ত করিবে তাহ কখনো নির্বাপিত হইবে না। তোমার শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদ ভাবী বংশাবলী গৌরবের সহিত পরিধান করিবে।

নন্দকুমার। পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলে আমার নিজের কী উপকার হইল?

শাস্ত্রী। এতক্ষণে আসল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যে ইংরাজদিগের অত্যাচার বলিয়া চিৎকার করিতেছে, তাহারা যেরূপ স্বার্থপর তুমিও তদ্রূপ স্বার্থপর। মীরজাফরের ন্যায় তুমিও একটি নরাধম। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ না করিলে, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন না করিলে কেহ কখনো দেশে প্রচলিত অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি আপনার স্বার্থরক্ষা করিয়া কাজ করিতে চাহ। এইরূপ হাতের পাঁচ রাখিয়া যাহারা সৎকার্য করিতে চাহে, তাহাদিগকে চরমে হাতের পাঁচ সহ হাতের দশ হারাইতে হয়। যদি নিস্বার্থভাবে কার্য করিতে পার তবে এই অত্যাচারের অবরোধ করিতে অগ্রসর হও। নতুবা সেই নিতাই বাগ্দীর পুত্র ছিদামের ন্যায় কার্য করিতে আরম্ভ কর। শুনিতে পাইলাম ছিদাম রেশমের কুঠির ব্যাপার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। সে লোকের উপর বড় অত্যাচার করে।

নন্দকুমার। ছিদাম কে?

শাস্ত্রী। জগাই এবং ছিদাম দুইটি পিতৃমাতৃহীন বাগ্দীর সন্তান। আমার প্রজা কৃপারামের মা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছে। লোকে তাহাদিগকে কৃপারামের মার দৌহিত্র বলিয়া জানে। তাহাতে সকলে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমি জানি তাহাদের বাড়ি ত্রিবেণীতে ছিল। রাসমণি বাগ্দিনীর গর্ভে তাহাদের জন্ম হইয়াছে। রাইমণির মৃত্যুর পর শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহাদিগকে এখানে আনিয়াছে।

নন্দকুমার। সেই ছিদাম রেশমের কুঠির প্যাদা হইয়াছে?

শাস্ত্রী। হাঁ, তাই তো শুনতে পাই। সে তাঁতিদিগের উপর নাকি বড় অত্যাচার করে।

নন্দকুমার। রেশমের কুঠিতে যত বাঙ্গালী আছে সকলেই অত্যাচার করে, কেবল তাহাকে দোষ দিলে কী হইবে?

শাস্ত্রী। তুমিও ইংরাজদিগের সঙ্গে মিলে অত্যাচার করিতে আরম্ভ কর। অনায়াসে

ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে। অত্যাচার অত্যাচার বলিয়া কেবল চিৎকার করিলে কর হইবে?

নন্দকুমার। আপনি আমাকে এতদূর নীচাশয় বলিয়া মনে করেন।

শাস্ত্রী। ষোল আনা নীচাশয় না হইয়াই তো গোলে পড়িয়াছ। দুই টানের মধ্যে পড়িয়াছ। লোকের একপথ অবলম্বন করা ভাল। তোমার ন্যায় যাহারা দুই পথ অবলম্বন করে, তাহাদিগকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়।

নন্দকুমার। আমি কি দুই পথ অবলম্বন করিয়াছি?

শাস্ত্রী। দুই পথই তো অবলম্বন করিয়াছ। নিজের স্বার্থও রাখিবে এবং দেশের অত্যচারও নিবারণ করিবে। এই দুই কার্য কেহ সাধন করিতে পারে না। যদি দেশের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাও আপনাকে বিস্মৃত হইয়া আত্ম বিসর্জনের পথ অবলম্বন কর।

গুরুদেব কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ফৌজদার নন্দকুমার অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে আবার বলিলেন, 'মহাশয় সুবাদারের অধীনে দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে আমি নিশ্চয়ই ইংরাজ বণিকদিগের এই অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ হইব।'

শাস্ত্রী। বাছা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অমাকে এই সকল কথা বলিয়া ভুলাইতে পারিবে না। অত্যাচারী রাজার দাসকেও অত্যাচারী হইতে হয়। দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলে তুমিও শত শত লোকের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। এখনই তো কত লোকের উপর অত্যাচার করিতেছ।

এইরূপ কথাবার্তায় রাত্র অধিক হইল। আহারান্তে নন্দকুমার গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং কয়েক দিবস মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া পুনর্বার হুগলিতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দুই-তিন বৎসর পরে মীরকাশিমের নিকট হইতে কলিকাতা কৌন্সিলের ইংরাজগণ অনেক উৎকোচ গ্রহণপূর্বক তাহাকে সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বৃদ্ধ মীরজাফর পদচ্যুত হইয়া মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতা যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাইশ
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং নবাব কাশিমালি

১৭৬২ সনের প্রারম্ভে জানুয়ারি মাসে একদিন সন্ধ্যার পর বাপুদেব শাস্ত্রী স্বীয় গৃহে বসিয়া প্রমদা দেবীর নিকট ভগবদগীতা হইতে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় প্রত্যহই কন্যার নিকট অনেক ধর্মের কথা বলিতেন। এই সময় তাঁহার একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'প্রভো! বাহির বাড়ি একজন মুসলমান আসিয়া বসিয়া আছেন; তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বহির্বাটিতে আসিয়া দেখিলেন বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিয়া একজন মুসলমান তাঁহার বাহির বাড়ি বসিয়া আছেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিবামাত্র মুসলমান সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল।

শাস্ত্রী মহাশয় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি গৃহ হইতে ভৃত্যদিগকে বিদায় দিয়া গৃহের কপাট রুদ্ধ করিতে বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় গৃহের কপাট রুদ্ধ করিবামাত্র অভ্যাগত ব্যক্তি মুখের বস্ত্রাবরণ উত্তোলন করিলেন। শাস্ত্রী দেখেন যে স্বয়ং নবাব মীরকাশিম তাঁহার ভবনে উপস্থিত।

তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আপনি তো মুঙ্গেরে ছিলেন বলিয়াই জানি। মুর্শিদাবাদে কবে আসিলেন?'

মীরকাশিম বলিলেন, 'অল্প কয়েকদিন মুর্শিদাবাদে আসিয়াছি। আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।'

শাস্ত্রী বলিলেন, 'যাহা বক্তব্য থাকে বলুন।'

তখন মীরকাশিম বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয় বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁ আপনার পরামর্শানুসারে সমুদয় রাজকার্য নির্বাহ করিতেন; আপনার উপদেশানুসারে চলিতেন বলিয়া তিনি নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল; তিনি পরম সুখে কালযাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি বঙ্গের সুবাদারি গ্রহণ করিবার পর একদিনও সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইলাম না। এ-সুবাদারি পদ লাভ করা অপেক্ষা সংরক্ষণকরাই বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। একদিকে ইংরেজদিগের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; পক্ষান্তরে আবার প্রজার সর্বনাশ না হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান না করিলে দেশের রাজস্ব কখন আদায় হইবে না; বিশেষত ইংরাজদিগকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা পরিশোধ

করিতেই রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তজ্জন্যই আপনার সহিত এই বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি। বিগত তিন রাত্রের মধ্যে আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। সর্বদাই কেবল চিন্তা করিতেছি যে কী উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। গত রাত্রে চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল যে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁ সর্বদাই আপনার পরামর্শানুসারে কার্য করিতেন; অতএব আমিও আপনার সহিত একবার পরামর্শ করিব। সেইজন্যই আজ সন্ধ্যার পর গোপনে আপনার বাড়িতে আসিয়াছি।'

শাস্ত্রী। ইংরাজদিগের সহিত আপনার কী বিষয় লইয়া বিবাদ হইবার উপক্রম হইয়াছে?

মীরকাশিম। মহাশয় বলিব কী, এইরূপ স্বার্থপর নীচাশয়, অর্থগৃধ্নু জাতি বিশ্বসংসারে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ নিজ-নিজ বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের উপর মাশুল দিতে চায় না। পরে কলিকাতার গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেবের সহিত একপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বর সে বন্দোবস্ত নামাঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট হইতে কোনোক্রমেই মাশুল আদায় করিতে পারিব না। মাশুল আদায়ের নিয়মে ইহারা এখন অগত্যা সম্মত হইলেও মাশুল আদায়ের সময়ে নিশ্চয়ই গোলযোগ করিবে। এখন এই বিষয় কী করিব তাহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয় অনেক চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ বাছা, তুমি এখন দেশের রাজা। তুমি যাহা বলিলে তাহা কিছুই মিথ্যা নহে। ইংরাজেরা বড় স্বার্থপরায়ণ। মাশুল আদায়ের নিয়মে এখন সম্মত হইলেও ভবিষ্যতে তাহারা সে-নিয়ম মান্য করিবে না। দিনদিন তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। কিন্তু তুমি রাজধর্ম প্রতিপালন কর। মাশুল আদায়ের প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেও। সকল শ্রেণীর প্রজাকে সমভাবে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা কর।

মীরকাশিম। তাহা করিলেও ইংরেজরা আপত্তি করিবে। তাহাদের ইচ্ছা যে তাহাদিগকে মাশুলের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া অন্যান্য প্রজাদিগের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা যাউক।

শাস্ত্রী। তাহাদের এইরূপ প্রস্তাবে যদি তুমি সম্মত হও, তবে তোমাকে নিশ্চয়ই রাজধর্ম ভ্রষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই কাপুরুষ। আমি তোমাকে সংক্ষেপে একটি কথা বলিতেছি। কখনো ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ, ধর্মের পথ পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুকেও অস্ত্রহীনাবস্থায় আক্রমণ করিবে না। তাহা হইলে তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে। কুকার্য এবং পাপানুষ্ঠান দ্বারা মানুষ কেবল আপনার শক্তিকে অস্পষ্টভাবে হ্রাস করিতে থাকে।

মীরকাশিম। তবে আপনি মাশুল আদায়ের প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে বলেন।

শাস্ত্রী। হাঁ।

মীরকাশিম। কিন্তু তাহা হইলে রাজস্ব একেবারে কমিয়া যাইবে।

শাস্ত্রী। প্রজার মঙ্গল হইলেই রাজ্যের মঙ্গল হয়। প্রজার ঘরে অর্থ থাকিলেই রাজার অর্থের অভাব হয় না। প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা কর। প্রকারান্তরে আবার রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে।

মীরকাশিম। কিন্তু ইংরাজদিগের ঈদৃশ অধীনতা আমার একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমি কেবল সেইজন্যই মুঙ্গেরে যাইয়া ইংরাজি প্রথানুসারে সৈন্যদিগকে সংগ্রাম-প্রণালী শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি দেশের রাজা। ইহারা দূরদেশ হইতে আসিয়া আমার রাজ্যে বাণিজ্য করিতেছে। এইরূপ কয়েকটা অর্থগৃধ্নু বণিকের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করা অপেক্ষা সে-রাজত্ব পরিত্যাগ করাই ভাল। ইহারা কথায়-কথায় বলে যে 'আমরা তোমাকে সুবাদারি দিয়াছি, আমাদের সকল কথা মান্য করিয়া চলিতে হইবে।'

শাস্ত্রী। যখন ইংরাজদিগের সাহায্যে সুবাদারি পদ লাভ করিয়াছ, তখন তাহারা অবশ্যই এইরূপ বলিবে। সুবাদারি লাভ করিবার নিমিত্ত ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করিলে কেন? কুকার্যের ফল হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না। তুমি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া এই সুবাদারি পদ লাভ করিয়াছ। আমার বোধহয়, তোমার রাজত্ব কখনো চিরস্থায়ী হইবে না। কিন্তু তোমার মধ্যে এই একটি মহদগুণ দেখিতেছি যে, তুমি সদুপদেশের নিকট সর্বদাই মস্তক অবনত করিতেছ।

এই কথা শুনিয় মীরকাশিমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'মহাশয় পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর কী করিব। কিন্তু এখন কী উপায় অবলম্বন করিলে আমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হইতে পারে তাহাই বলুন।'

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'বাছা, সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। মনুষ্য পাপের পথ পরিত্যাগপূর্বক সৎপথ অবলম্বন করিলেই পূর্বকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। তুমি এখন সর্বদা সত্য এবং ন্যায়পথ অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে।'

মীরকাশিম। পণ্ডিত মহাশয়! আমি আপনার উপদেশ প্রতিপালন করিতে সর্বদা যত্ন করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে মুঙ্গেরে চলুন। আপনি নিকটে থাকিলে কখন কোনো সৎপরামর্শের অভাব হইবে না।

শাস্ত্রী। আমাকে এখন সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে লইয়া গেলে তোমার কোনো লাভ নাই। আমি নিশ্চয় তোমাকে বলিতেছি সর্বদা প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কর, তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবে।

মীরকাশিম এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় উষ্ণীষ বাপুদেবের চরণোপরি স্থাপন করিলেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি বাপুদেবের উপদেশ প্রতিপালন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। যাহাতে প্রজাসাধারণের মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসারে মানুষ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া সর্বদাই ভ্রমজালে নিপতিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে পর, মীরকাশিম হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন, অস্ত্রহীনাবস্থায় কয়েকটি ইংরাজের প্রাণবধ করিয়া স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করিলেন; কৃষ্ণদাস প্রভৃতি তিন চারি পুত্রসহ রাজা রাজবল্লভের গলদেশে বালুকাপূর্ণ গৌণী বদ্ধ করিয়া গঙ্গার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করাইলেন; রাজা রামনারায়ণ, উমেদ সিংহ, বনিয়াদ সিংহ, ফতে সিংহ এবং শেঠ বংশীয় কয়েকটি সম্ভ্রান্ত লোকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। এইরূপে মীরকাশিম রাজত্বাভিনয় শেষ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু ইনি যে প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন, তাহাতে কোনোরূপ সন্দেহ নাই। প্রতিকূলাবস্থায় নিপতিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন এইরূপ কুকার্য দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

মীরকাশিম প্রাগুক্ত নরহত্যা দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত না করিলে নিশ্চয়ই সম্মুখ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যে বাপুদেবের কয়েকটি উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ভাবী বংশাবলীর নিকট প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র বঙ্গবাসিদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়।

তেইশ
কারাগার দর্শন

পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা এতদ্ পূর্ববর্তী কয়েক অধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিলাম। এখন আবার পূর্বোক্ত অনাথা কন্যাত্রয়ের বিষয়ই উল্লিখিত হইবে। বাপুদেব শাস্ত্রীর গৃহে সাবিত্রী, জগদম্বা এবং অহল্যা আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা প্রমদা দেবী এই নিরাশ্রয়া কন্যাত্রয়ের সকল দুরাবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। প্রমদা দেবীর হৃদয় দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ‘বাবা অদ্যই সাবিত্রীর ভ্রাতা এবং স্বামীকে আর এই নিরাশ্রয়া বালিকাদ্বয়ের পিতাকে কারামুক্ত করিয়া আনিবার কোনো উপায় অবধারণ করুন।’

শাস্ত্রী মহাশয় সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, সাবিত্রীর স্বামী ও ভ্রাতাকে এবং মদন দত্তকে ইংরাজেরা কেবল জরিমানার টাকার নিমিত্ত কারাগারে রাখিয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আজকাল শাস্ত্রী মহাশয় একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার লাখেরাজের সমুদয় প্রজা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির সাহেবদিগের দৌরাত্ম্য দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। মৃত স্ত্রীর যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়াই তিনি এখন জীবিকানির্বাহ করিতেছেন। কিরূপে যে ইহাদিগের জরিমানার টাকা দিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

যে দিবস সাবিত্রী প্রভৃতি বাপুদেবের বাড়ি আসিয়াছিল, তাহার পরদিন, তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ইংরাজদিগের কলিকাতাস্থ কারাগারের নিকট চলিয়া গেলেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করিলে পর জেলের জমাদার এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধে মদন দত্ত, নবীন পাল এবং কালাচাঁদকে তাহাদের স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল।

শাস্ত্রী মহাশয়কে জমাদার কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। মদন দত্ত কালাচাঁদ এবং নবীন পালকে বাহিরে আনিয়া তাহাদের স্বজনবর্গের সহিত, সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রদান করিল। শাস্ত্রী মহাশয় যে এই কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন না, সে ভালই হইয়াছিল। এ কারাগারের অভ্যন্তরস্থ ভীষণ দৃশ্য, ভয়ানক অত্যাচার, কারারুদ্ধ হতভাগ্যদিগের আর্তনাদ এবং ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই বাপুদেবের ন্যায় হৃদয়বান লোকের প্রাণ বিয়োগ হইত।

পাঠকদিগের নিকট এ কারাগারের বিষয় অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এইমাত্র বলিতেছি যে এই গৃহ হইতে সর্বদা মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস সমুত্থিত হইতেছে; কত কত লোক দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া অধোমুখে বসিয়া আপন আপন পরিবারের বিষয় চিন্তা করিতেছে। তাহাদের চক্ষের জলে সম্মুখস্থিত ভূমি সিক্ত হইয়াছে, তাহারা বারম্বার বলিতেছে, 'হা পরমেশ্বর, না জানি সন্তান-সন্ততির কতই দুরবস্থা হইয়াছে, না জানি স্ত্রীকে বোধহয় জাতিভ্রষ্ট হইতে হইল।'

আবার কারাগারের কোনো কোনো স্থানে বসিয়া কোন-কোন লবণের বণিক অন্যান্য কয়েদির নিকট বলিতেছে, 'ভাই, আমি আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আমার সকল ধন সম্পত্তি গিয়াছে। আমার মৃত্যু হইলেই সকল কষ্টের অবসান হয়।'

এই বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতেছে। 'জগতে ঈশ্বর নাই' এই বলিয়া চিৎকার করিতেছে।

এই গৃহের ক্রন্দন ধ্বনি, এই গৃহের আর্তনাদ, এই গৃহ হইতে সমুত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস সর্বদাই সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমীপে পৌঁছিতেছে। কিন্তু জগৎপিতার প্রবোধবাক্য ইহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। এই হতভাগ্য বঙ্গবাসিগণ এখনও বুঝিতে পারে না যে, পারস্পরিক সহনুভূতি শূন্য হইয়া জীবনযাপন করিত বলিয়াই ইহাদের এই দুরবস্থা হইয়াছে। যদি বঙ্গবাসিদিগের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকিত, যদি একের বিপদে অপরাপর লোক তাহার সাহায্য করিত, তবে কি ইংরাজ বণিকগণ ইহাদিগের উপর এতাদৃশ ভয়ানক অত্যাচার করিতে সমর্থ হইত! কারাবদ্ধ কয়েদিগণ! তোমরা নিজ-নিজ কুকার্যের ফল ভোগ করিতেছ। কেন 'জগতে ঈশ্বর নাই'—'ঈশ্বর নাই' বলিয়া চিৎকার করিতেছ!

মদন দত্ত, কালাচাঁদ এবং নবীন পাল কারাগার হইতে বাহির হইয়া দেখে যে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুদূরে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে তিনটি কন্যা। জমাদার তাহাদিগকে সেই বৃদ্ধের নিকট যাইতে বলিল।

ইহারা তিনজনই কারাগারের কষ্ট নিবন্ধন অস্থিচর্মসার হইয়াছিল। মদন দত্তের কন্যাদ্বয় আর পিতাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু মদন তাহাদিগকে দেখিবামাত্র তাহাদিগকে চিনিল। সে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া কন্যা দুইটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল এবং হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবামাত্র তাহার গলা ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে পার্শ্বস্থিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সভারামের যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কালাচাঁদ কি নবীন পাল আজ পর্যন্তও শুনিতে পায় নাই। সাবিত্রী একাকিনী কলিকাতা আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা মনে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিল।

ইহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শন উপলক্ষে যেরূপ ক্রন্দনের ধ্বনি উপস্থিত হইল, ইহারা যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার এইরূপ অবস্থায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে পরস্পরে সন্দর্শন মনে মনে কল্পনা করুন, তবেই ইহাদিগের তৎসাময়িক হৃদয়ের ভাব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

ইহাদিগের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কিঞ্চিৎ সম্বরিত হইলে, বাপুদেব শাস্ত্রী সাবিত্রীর সমুদয় পূর্ব বিবরণ আনুপূর্বিক নবীন পাল, কালাচাঁদ এবং মদন দত্তের নিকট বলিতে লাগিলেন—যেরূপে সাবিত্রীর মাতা এবং ভ্রাতৃবধূদিগের মৃত্যু হইল—যেরূপে সাবিত্রী বৃধধ পিতাকে লইয়া তাহাদের ভগ্ন গৃহে অবস্থান কালে রামহরি কর্তৃক কাশিমবাজারে নীত হইয়াছিল— যেরূপে সাবিত্রীকে আরাটুন সাহেবের সহধর্মিণী আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন—পরে কলিকাতা আসিতে তাহার যে সকল কষ্ট হইয়াছে—তৎসমুদয় এক এক করিয়া বিবৃত করিলেন। তৎপরে সাবিত্রীর সহিত মদন দত্তের জ্যেষ্ঠ কন্যার যেরূপ সাক্ষাৎ হইল—মদনের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং স্ত্রীর মৃত্যু বিবরণ সমুদয় আনুপূর্বিক বলিলেন।

মদন স্বীয় স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া 'হা আমার অন্নপূর্ণা তোমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল,' এই বলিয়া স্ত্রী ও কন্যার শোকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

এদিকে কালাচাঁদ পিতৃ মাতৃ বিয়োগ, স্ত্রী বিয়োগ এবং ভ্রাতৃবধূগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইল। নবীন পালও হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে জেলের জমাদার আসিয়া বাপুদেবকে বলিল, 'ঠাকুর আর অনেকক্ষণ আমি কয়েদীদিগকে বাহিরে রাখিতে পারিব না।'

মদন দত্ত, নবীন পাল এবং কালাচাঁদ বাপুদেবের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'প্রভো, আপনি সত্য সত্যই দেবতা। আপনি আশ্রয় না দিলে আর ইহাদের সঙ্গে আমাদের এজন্মেও সাক্ষাৎ হইত না।'

কালাচাঁদ এবং নবীন পূর্ব হইতেই বাপুদেবকে চিনিত। বাপুদেব যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু মদন এই প্রথম জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণ কুলে এই কলিযুগেও দুই একটি দেবতা আছেন। বাপুদেব বলিলেন, 'তোমাদের আর চিন্তা নাই। আমি আত্মবিক্রয় করিয়াও তোমাদের জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া দিয়া সত্বরই তোমাদিগকে কারামুক্ত করিব।'

এইরূপ বিপদের সময় তাহারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিবামাত্র বাপুদেবের প্রতি তাহাদের যেরূপ ভক্তির ভাব হইল তাহা কখনো ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ইহার পর জমাদার ইহাদিগকে আর কথা বলিতে দিল না। তিনজনকে ধরিয়া জেলের মধ্যে লইয়া গেল।

বাপুদেব সাবিত্রী, জগদম্বা এবং অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

চব্বিশ
ক্যারাপিট আরাটুন

প্রমদা দেবী মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা, সাবিত্রীর স্বামী এবং ভ্রাতাকে আর মদন দত্তকে অদ্যই কারামুক্ত করিয়া আনিবেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাদিগের তিনজনকে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অত্যন্ত নিরাশ হইলেন।

বাপুদেব কন্যাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই যে, জরিমানার টাকা দিতে পারি। শুনিলাম তিনজনের জরিমানা প্রায় এক হাজার টাকা হইবেক। ইহার কী উপায় করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।'

প্রমদা দেবী তাঁহার নিজের সমুদয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে তাঁহার পিতা সেই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিতে গেলে তাহার উপযুক্ত মূল্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসার মধ্যে নানাবিধ প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার রহিয়াছে। বাপুদের শাস্ত্রী তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

প্রমদা দেবী পিতার নিকট অলঙ্কার বিক্রয়ের অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। তাঁহার পিতাকে কেবল বলিলেন, 'বাবা, দাদাকে এখানে একবার আসিতে বলিয়া পাঠান।'

প্রমদা দেবী মহারাজ নন্দকুমারকে বাল্যাবস্থা হইতে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কিন্তু তাঁহার পিতা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'না, মা, তাহা হইবে না। নন্দকুমার আমর শিষ্য। আমার টাকার অবশ্যক হইয়াছে, এই কথা শুনিলে সে নিশ্চয়ই যেরূপে পারে টাকা দিতে চেষ্টা করিবে। আমি প্রাণান্তেও তাঁহার নিকট অর্থের প্রার্থী হইব না। তাঁহার নিকট বলিয়া কী—আমার ইচ্ছা হয় না যে কাহারও নিকট অর্থের প্রার্থী হই। বিশেষতঃ নন্দকুমারের এখন ঘোর বিপদ। সে পদচ্যুত হইয়া এক প্রকার বন্দীস্বরূপ কলিকাতা অবস্থান করিতেছে। এই সময় আমি কখনও তাহার নিকট টাকা চাহিতে পারিব না।'

প্রমদা বলিলেন, 'না বাবা, আমি দাদার নিকট টাকা চাহিব না। আমার নিজের অলঙ্কার তাঁহাকে বিক্রয় করিতে দিব। তাঁহার লোকেরা এই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিলে উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারিব। কিন্তু আপনি এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে গেলে আপনাকে নিশ্চয়ই লোক ঠকাইবে।'

সাবিত্রী ইহাদিগের ঈদৃশ দয়া দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে মনে মনে

ভাবিতে লাগিল যে মানুষের নিকট আসিয়াছি, না দেবতার বাড়িতে আসিয়াছি। আমাদিগকে কিরূপে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, তাহার নিমিত্ত ইহারা যথা সর্বস্ব বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে প্রমদা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মাঠাকুরানী! সৈদাবাদের আরাটুন সাহেবের মেম আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আরাটুন সাহেবের নিকট তিনি এক পত্র দিয়াছেন। আমার সঙ্গে সে পত্র আছে। সেখানে যাইতে পারিলে, বোধ হয় আরাটুন সাহেব আমাকে কতক টাকা দিতে পারেন। তাহা হইলে আর আপনার এই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না।'

বাপুদেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বাছা, কল্য আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আরাটুন সাহেবের বাড়ি যাইব। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সভারামের তো অনেক টাকা ছিল, তাহা কি কোম্পানির লোকেরা নিয়া গিয়াছে?'

সাবিত্রী বলিল, 'শুনিয়াছি আমাদের গুপ্তধন অনুসন্ধান করিয়া পায় নাই। কিন্তু বাবারটাকা কোন ঘরের মৃত্তিকার নিচে ছিল, তাহা আমি জানি না। বাবা, মা এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেবল জানিতেন।'

শাস্ত্রী। তোমার বাবা মৃত্যুকালে তাহা কাহাকেও বলিয়া যায় নাই?

সাবিত্রী। বাবা মৃত্যুকালে কিছুই বলিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে কেবল 'হলধর', 'মহর' দুইটি শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।

শাস্ত্রী। সভারাম সত্য সত্যই ধার্মিক লোক ছিল। হলধরের টাকা এবং মহর আমি তাহার ঘরে রাখিয়াছিলাম, তাহাই বোধ হয় মৃত্যুকালে বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। হলধরের টাকা কোথায় রাখিয়াছিল তাহা তুমি জান?

সাবিত্রী। আজ্ঞে না।

শাস্ত্রী। হলধরকে তুমি চিনিতে?

সাবিত্রী। আজ্ঞে তিনি আমার মামা ছিলেন। শুনিয়াছি আমার জন্ম হইবার পূর্বে বাবা আমার মামার বাড়ি মামার সঙ্গে একত্র ছিলেন। পরে লাখেরাজ জমি পাইয়া পৃথক বাড়ি করেন।

শাস্ত্রী। হাঁ, তাই বটে। তুমি হলধরের পুত্রকে কখন বোধ হয় দেখ নাই?

সাবিত্রী। মামার মৃত্যু হইবার পর আর কখনো দেখি নাই। সে জীবিত আছে কি না তাহাও জানি না। শুনিয়াছিলাম মামী পুত্র কোলে করিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। পরে ছেলেটি ভাসিয়া উঠিলে আপনি তাহাকে নদী হইতে উঠাইয়াছেন।

শাস্ত্রী। এই যে ছয় বৎসরের বালক প্রমদা প্রতিপালন করিতেছেন, এই বালকই হলধরের পুত্র।

সাবিত্রী এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইল। প্রমদা দেবীর চরণ ধরিয়া বলিল, 'মা, আপনি

কখনো মানুষ নহেন, নিশ্চয়ই দেবকন্যা হইবেন। অনাথ কাঙ্গালের প্রতি আপনার এত দয়া। আপনি ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া আমাদের তাঁতির ছেলেকে এত যত্নের সহিত পালন করিতেছেন!'

এই বলিতে বলিতে সাবিত্রীর চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে প্রমদার পার্শ্বস্থিত বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল।

এই তিন বৎসর যাবত প্রমদা দেবী নিজে এই পিতৃমাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছেন।

ইহার পরদিন প্রাতে বাপুদের শাস্ত্রী সাবিত্রীকে সঙ্গে করিয়া ফৌজদারি বালাখানার নিকট আরমানিয়ান পাড়ায় আসিলেন। ক্যারাপিট আরাটুনকে তিনি নিজেও চিনিতেন।

এই সময়ে আরাটুন সাহেব নিজের মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানার নিকট একখানি ক্ষুদ্র একতলা গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে সাবিত্রীকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। মুর্শিদাবাদের সমুদয় লোকই বাপুদেব শাস্ত্রীকে বুড় নবাবের পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন। ক্যারাপিট আরাটুন এবং তাহার পিতা সামুয়েল আরাটুন সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আরাটুন সাহেব সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন।

সাবিত্রী অঞ্চল হইতে এস্থার বিবির পত্রখানি খুলিয়া ক্যারাপিটের হস্তে প্রদান করিল।

এস্থার বিবি যে কিরূপ সহৃদয়া রমণী ছিলেন, তাহা পাঠকগণ তাঁহার লিখিতপত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত ছিল। পত্রের অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাবিত্রীর সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

'নাথ! আমাদের এখন যেরূপ বিপদ, তাহাতে আমরা এখন কাহাকেও টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারি এমন সাধ্য নাই। কিন্তু তথাপি তোমাকে এই দুঃখিনী সাবিত্রীর দুঃখ বিমোচনার্থ ইহার যত টাকার আবশ্যক হইবে তাহা দিতে অনুরোধ করি। তোমার এস্থারের এই অনুরোধ রাখিতে হইবেই হইবে। এই দুঃখিনীর দুরবস্থা যখন মনে হয়, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার পিতা মাতা ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ সকলই মরিয়া গিয়াছে। কেবল একটি ভাই এবং ইহার স্বামী এখন পর্যন্ত জীবিত আছে। রামহরি ইহার ধর্ম নষ্ট করিবার চক্রান্ত করিলে পর আমি নিজের গৃহে ইহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। সাবিত্রী পতিপ্রাণা, তাই পতির উদ্ধারার্থ কলিকাতা চলিয়াছে। যেরূপে পার ইহার ভ্রাতা এবং স্বামীকে কারামুক্ত করিয়া দিবে।

তোমার চিরানুগত দাসী
এস্থার।'

আরাটুন সাহেব এই পত্র পাঠ করিবামাত্র তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। 'হা পরমেশ্বর!' এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বাপুদেব শাস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়, ইংরাজদিগের অত্যাচারে আমার রেশমের কারবার একেবারে গিয়াছে। আমার সমুদয় লোকজন ধরিয়া নিয়া তাহাদের কুঠিতে কাজ করাইতেছে। দস্যুর ন্যায় আমার দিনাজপুরের লবণের গোলা লুটিয়া নিয়য়াছে। সেই লবণের মূল্যের দাবীতে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছি। এই মোকদ্দমার খরচের নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছি। এখন হাতে একটি পয়সাও নাই। কেহ আমায় একটি পয়সা ধার দিতে সম্মত হয় না। ৯ই মে তারিখে আমার মোকদ্দমার বিচারের দিন ধার্য হইয়াছে। আর ছয়দিন পরেই মোকদ্দমার বিচার হইবে। যদি এই মোকদ্দমার সুবিচার না হয়, তবে সাবিত্রীর ন্যায় আমার এস্থার বিবিও পথের ভিখারিণী হইবেন। আমি আর প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আর যদি মোকদ্দমা ডিক্রী হয় তবেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, লোকেও তখন দুই চারি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিবে না। আপনি যদি ছয় সাতদিন পরে সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া আমার এখানে আইসেন, তবে ইহাকে টাকা দিতে পারিব কি না নিশ্চয় বলিয়া দিতে পারিব। মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে ইহার যত টাকা লাগিবে তাহা সমুদয় আমি দিব।'

আরাটুন সাহেবের এইরূপ দুরবস্থার কথা শুনিয়া বাপুদেব অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ক্যারাপিট আরাটুনের পিতা সামুয়েল আরাটুনের ঘরে লক্ষ টাকার খাড়া হুণ্ডী হইত। কিন্তু আজ ক্যারাপিট কাহারও নিকট একটি পয়সা ধার চাহিলে পায় না। এই কি অল্প দুঃখের বিষয়! বঙ্গের অর্থলোভী গবর্ণর বেরেলস্ট সাহেবের অর্থগৃধ্নুতা প্রযুক্ত ক্যারাপিটের এই দুরবস্থা হইয়াছে।

বাপুদেব কিছুকাল আরাটুনের সহিত অন্যান্য বিষয় কথাবার্তা বলিবার পরে সাবিত্রীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক প্রমদাকে বলিলেন যে, আরাটুন সাহেবের বড় দুরবস্থা হইয়াছে; আরাটুন টাকা দিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই।

পঁচিশ
ভ্রাতা ভগ্নী

প্রমদা দেবী পিতার কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। অপরাহ্ণে মহারাজ নন্দকুমার আসিয়া প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তার পর প্রমদা বলিলেন, 'দাদা, আপনার গোমস্তা চৈতান নাথের দ্বারা আমার কয়েকখানা অলঙ্কার বিক্রয় করাইয়া দিতে হইবে। আমার বড় টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। এই যে তিনটি কন্যা দেখিতেছেন, ইহাদের আত্মীয়-স্বজন কারাগারে আছে। তাহাদিগের জরিমানার টাকা দিয়া তাহাদিগকে আমি মুক্ত করিয়া দিব।'

মহারাজ নন্দকুমার প্রমদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রমদাকে দেখিলেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি কিছুকাল পরে বলিলেন, 'প্রমদা, তোমার এ আভরণ বিক্রয় করিতে হইবে না। তোমার অলঙ্কার বিক্রয়ের কতক টাকা আমার নিকট আছে।'

প্রমদা দেবী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে কী! আমার কোনো অলঙ্কার তো বাবা কখনো বিক্রয় করেন নাই।'

তখন মহারাজ নন্দকুমার বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন, 'প্রমদা, অতি বাল্যকালে আমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। মাতৃস্নেহ যে কী অমূল্য ধন তাহা আমি কখনো সম্ভোগ করি নাই। তোমাদের গৃহে অবস্থানকালে তোমার জননী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রসাদে মাতৃহীন হইয়াও মাতৃস্নেহ সম্ভোগ করিয়াছিলাম। আমি সর্বদাই তাঁহাকে আপন গর্ভধারিণী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, সেই স্নেহময়ী জননীকে এবং তোমাকে উপহার স্বরূপ কয়েকখানি হীরকমণ্ডিত স্বর্ণার্ভরণ উপহার প্রদান করিব। তোমাকে আমি বাল্যকাল হইতে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি। কিন্তু আমার ন্যায় পাপী বোধ হয় আর জগতে নাই। জননীকে স্বর্ণাভরণ প্রদান করা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমি হুগলি হইতে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিবার সময়, তোমার নিমিত্ত এবং সেই স্নেহময়ী জননীর জন্য কয়েকখানি হীরকমণ্ডিত স্বর্ণাভরণ সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলাম। তোমাদের বাড়ি পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে, জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন; আর তোমাকে এই অল্প বয়সেই বৈধব্যাবস্থা প্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল আভরণ আমার এক নূতন শোকের কারণ হইল। একবার মনে করিয়াছিলাম যে, সেই সকল আভরণ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলিব। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার পোড়াইয়া ফেলিলে কোনো উপকার নাই। তাই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া টাকা রাখিয়া দিব। তোমার কখনো টাকার প্রয়োজন হইলে সেই টাকা তোমাকে দিব। এই

ভাবিয়া সেই সকল আভরণ রঘুনাথ রায়ের দ্বারা আমার অনুগত বোলাকি দাসের দোকানে রাখিয়াছিলাম। ছয় বৎসর যাবৎ সেই সকল অলঙ্কার বোলাকির দোকানেই পড়িয়াছিল। আমার কী আর ঐ সকল অলঙ্কার চোক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মীরকাশিমের যুদ্ধের সময় বোলাকির দোকান লুট হইতে লুণ্ঠনকারিগণ সেই সকল অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছিল।

'আমি কলিকাতা আসিয়াছি পর বোলাকি একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, সে আমার আমানতি অলঙ্কারের মূল্য এখন দিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার মূল্যের বাবদ আট চল্লিশ হাজার একুশ টাকার তমসুক দিতে ইচ্ছুক আছে। পরে তমসুকের দেনা পরিশোধ করিবে।

'আমি প্রথমত বোলাকিকে তমসুক দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমানতি অলঙ্কার যখন লুট হইয়াছে, তখন তাহার নিকট হইতে ইহার মূল্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

'কিন্তু বোলাকি বলিল—মহারাজ এই অলঙ্কার বাপুদেব শাস্ত্রীর কন্যা প্রমদা দেবীর। তিনি পরম সাধ্বী! স্বয়ং ভগবতী সদৃশী। আমরা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করি না। তাঁহার অলঙ্কার যখন আমার গোমস্তাদিগের অনবধানতাবশত ক্ষোয়া গিয়াছে, তখন ইহার মূল্য কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া দিব। ব্রাহ্মণের ধন। ইহার মূল্য না দিলে আমি সর্বস্বান্ত হইব।

'বোলাকি তোমার সেই আভরণের জন্য ৪৮০২১ টাকার এক তমসুক দিয়াছে। সে তাহার কোম্পানির খতের টাকা পাইলেই এই টাকা পরিশোধ করিবে। তোমার যখন যত টাকার আবশ্যক হয়, আমার নিকট চাহিলেই পাইবে। তোমার সেই সকল অলঙ্কারের বাবদ ৮৪০২১ টাকা আমার নিকট আমানত আছে বলিয়া মনে রাখিবে।'

এই সকল কথা বলিয়া নন্দকুমার গুরুর চরণে প্রণামপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং তৎপর দিবস চৈতান নাথের দ্বারা প্রমদাকে দুই হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

বাপুদেব চৈতান নাথকে সঙ্গে করিয়া মদন দত্ত, নবীন পাল এবং কালাচাঁদের জরিমানার টাকা দিতে অফিসে চলিয়া গেলেন। তাহাদের তিনজনের এক হাজার আড়াই শত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। জরিমানার টাকা দিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া আপন বাসস্থানে লইয়া আসিলেন। সাবিত্রী এবং মদন দত্তের কন্যাদ্বয় যে কত আনন্দিত হইল তাহা আর বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

নবীন পাল এবং কালাচাঁদ আর মুর্শিদাবাদে যাইতে সাহস করিল না। শূন্য গ্রামে যাইয়া এখন কিরূপেই বা বাস করিবে; তাহাদের গ্রামস্থ সমুদয় তন্তুবায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে কুটির নির্মাণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা যাহাতে ব্যবসায় চালাইতে পারে তজ্জন্য প্রমদা দেবী তাহাদিগকে কিছু টাকা দিলেন।

মদন দত্তও নিজ গ্রামবাসিগণের নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়া আর দেশে গেল না; কালাচাঁদ ও নবীন পালের ন্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতেই কন্যাদ্বয়কে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এবং প্রমদা দেবীর নিকট হইতে তিন শত টাকা নিয়া একটা কারবার আরম্ভ করিল।

ছাব্বিশ
ক্যারাপিট আরাটুন সাহেবের মৃত্যু

ক্যারাপিট আরাটুন সাবিত্রীকে ১০ই মে তারিখে তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। ৯ই মে তারিখে তাঁহার মোকদ্দমার বিচারের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু সাবিত্রীর আর এখন টাকার জন্য তাঁহার নিকট যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

১০ই মে তারিখে সাবিত্রী তাহার স্বামী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিল, 'আরাটুন সাহেবের মোকদ্দমার কী হইয়াছে সে বিষয়ে তত্ত্ব লওয়া উচিত। আরাটুন সাহেবের মেম আমাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমার প্রাণ, মান এবং ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের পরম বান্ধব। অতএব চল তিনজনেই তাঁহার নিকট গিয়া বলি যে, আমাদের টাকার আর প্রয়োজন নাই। আর তাঁহার মোকদ্দমার কী হইল তাহাও জানিয়া আসি।

নবীন এবং কালাচাঁদ সাবিত্রীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সঙ্গে করিয়া আরাটুন সাহেবের কুঠিতে গেল। সেখানে যাইয়া দেখিল আরাটুনের গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ভৃত্য বারান্দায় বসিয়া আছে। আরাটুন সাহেব কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, গবর্ণর সাহেবের বাড়ি গিয়াছেন, এখনই ফিরিয়া আসিবেন। তাহারা এই কথা শুনিয়া সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতে দেখিল যে, চারি পাঁচজন লোক আরাটুন সাহেবকে স্কন্ধে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন, আরাটুন সাহেব অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে আরও পাঁচ ছয় জন লোক রহিয়াছে।

যে সকল লোক আরাটুন সাহেবকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে অপর দুইটি লোক ছিল। তাহাদের একজনের নাম গোকুল সোনার। সে একজন সুবর্ণ বণিক। দ্বিতীয়ের নাম রমানাথ দাস।

আরাটুন সাহেবের গৃহ মধ্যে প্রবেশ কালে, গোকুল সোনার রামনাথের নিকট বক বক করিয়া কি বলিতেছিল, তাহা কেহ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল না। তাহার শেষ কথাটি মাত্র শুনা গেল, তাহা এই—'যে শালারা বেরেলস্ট সাহেব আর বারওয়েল সাহেবকে ঘুষ জুটাইয়া দেয়, তাদের নামে নালিশ করিলে গবর্ণর সাহেব সে নালিশের বিচার করে না।'

রামনাথ এবং গোকুল সোনার কিছুকাল পরেই চলিয়া গেল। সাবিত্রী, নবীন, কালাচাঁদ এবং আরাটুন সাহেবের ভৃত্য এ ব্যাপারের কিছুই মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না।

নবীন ও কাঁলাচাঁদ আরাটুনের মাথায় জল ঢালিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে তাঁহার একটু চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। শয্যা পার্শ্বে সাবিত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমার এস্থার—আমার প্রাণের এরফান! তুমি পথের কাঙ্গালিনী হইলে, তুমি ভিখারিণী হইলে, আমি চলিলাম।'

সাবিত্রী বলিল, 'আমি এস্থার বিবি নহি। আমি সাবিত্রী। আপনার মোকদ্দামার কি হইয়াছে তাহা জানিতে আসিয়াছি।'

মোকদ্দমার কথা শুনিবামাত্র আরাটুন কপালে হাত দিয়া বলিলেন, 'আমার সব গিয়াছে, আমার এস্থার পথের ভিখারিণী হইল।'

এই বলিয়া তিনি আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন সাবিত্রী, কালাচাঁদ, নবীন সকলেই অনুমান করিল যে সাহেব মোকদ্দমা হারিয়াছেন তাহাতেই মনের দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন।

তাহারা পুনর্বার তাঁহার মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল। কিছুকাল পরে আরাটুন সাহেব হাঁ করিয়া জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার মুখের নিকট জলের গ্লাস ধরিল। তিনি জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এবং আবার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার কথা বলিতেও কষ্ট হইতে লাগিল। সাবিত্রীকে তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মৃত্যুকালে আর আমার প্রাণের এস্থারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।'

সাবিত্রী বলিল, 'আমার ভাই জেল হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছেন। এস্থার বিবিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিব।'

আরাটুন সাহেব বলিলেন, 'পাঠাইয়া দিলেই বা কী হইবে। তাঁহার এখানে আসিবার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইবে।'

তখন কালাচাঁদ আরাটুনের নিকটে যাইয়া বলিল, 'বাবা সাহেব, (কালাচাঁদ আরাটুনকে বাবা সাহেব বলিয়া ডাকিত) আপনি স্থির হউন, মোকদ্দমার চিন্তা ছাড়িয়া দিন।'

ক্যারাপিটের আবার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। গ্রিগরী খাজেমাল নামক আর একজন আরমানিয়ান বণিক ক্যারাপিটের বাড়ির নিকট বাস করিতেন। ইহার সহিত ক্যারাপিটের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত ক্যারাপিট স্বীয় ভৃত্যকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। খাজেমাল আসিয়া আরাটুনের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ক্যারাপিট অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাই আমার সর্বনাশ হইয়াছে। গত কল্য আমার মোকদ্দমা ডাক হইবামাত্র আমি উকিল সহ হাজির হইলাম। কিন্তু সেই সময়ে গবর্ণর বেরেলস্য সাহেবের এক পাত্র আসিয়া মেয়র

কোর্টের প্রধান জজ কের্ণলিয়াস্ গুড্উইন (Cornelius Goodwin)* সাহেবের নিকট পৌঁছিল। বিচারপতি গুড্উইল সেই পত্র পাঠ করিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার মোকদ্দমা অপোসে নিষ্পত্তি হইবে। তোমার মোকদ্দমা আর বিচার হবে না। তুমি সমুদয় টাকা আপোসে পাইবে।'

'আমি বারম্বার বলিতে লাগিলাম যে আমার সহিত কখনো কোনো আপোসের প্রস্তাব হয় নাই। আমার উকিল বলিল যে আমরা কখনো আপোস করিব না। কিন্তু গুড্উইন সাহেব আমার ও আমার উকিলের কথা না শুনিয়া আপোসে নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া মোকদ্দমা ডিসমিশ করিলেন। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া আপন দুরবস্থার কথা বলিলে তিনি বেরেলস্ট সাহেবের নিকট এই সকল কথা বলিতে বলিলেন।

'আজ দশ ঘটিকার পর গবর্ণর বেরেলস্ট সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি প্রথমত আমাকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন যে তিনি আমার মোকদ্দমার বিষয় কিছু জানেন না। আমি দ্বিতীয়বার কথা বলিতে উদ্যত হইলে, তাহার ভৃত্যদিগকে আমাকে তাড়াইয়া দিতে হুকুম করিলেন।

'ভাই আমার উপর ডাকাতি করিয়াছে। আমার ষাট হাজার টাকার লবণের গোলা লুঠ করিয়াছে। আমি ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ করিয়া এই মোকদ্দমার খরচা দিয়াছি। কিন্তু এই ইংরাজ বিচারকগণকে সত্য সত্য চোর বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। ইহাদিগের গবর্ণর একজন ডাকাত! ইহাদিগের বিচারকগণ চোর! আমি ইহাদিগের নিকট কোনো দিন কোনো অপরাধ করি নাই। ইহারা কেবল অর্থ লোভেই আমার সমুদয় লবণ অপহরণ করিয়াছে। এইরূপ কপটাচারী, স্বার্থপর জাতি আর কোথাও দেখা যায় না।'

'ভাই আমার সর্বনাশ হইয়াছে। আমি সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি আর বাঁচিব না। আমার প্রাণের এস্থার, আমার পুত্র দুইটি, আমার বিমাতা একেবারে পথের কাঙ্গালিনী হইলেন।'

এই সকল কথা বলিতে বলিতে ক্যারাপিট আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। গ্রিগরী খাজেমাল একজন ডাক্তার আনাইলেন। ক্যারাপিটের ডাক্তারকে দুইটি টাকা দিবারও সাধ্য ছিল না। ডাক্তার তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, ইহার এখনই মৃত্যু হইবে।

রাত্রে খাজেমাল গৃহে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী তাহার ভ্রাতা কালাচাঁদ এবং নবীন পালকে বলিল, 'তোমরা সৈদাবাদে যাইয়া এস্তার বিবিকে সংবাদ দেও। এস্থার বিবি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর এরূপ ব্যারাম হইয়াছে; এ সংবাদ তাঁহার নিকট অবশ্য পাঠাইতে হইবে।'

*Vide note (21) in the appendix.

কালাচাঁদ বলিল, 'নবীনের যাইবার কোনো দরকার নাই। আমি একলাই আজ রাত্রে চলিয়া যাইব। আমি চারি দিবসের মধ্যে সৈদাবাদে পৌঁছিতে পারিব। তুমি এবং নবীন এখানে থাকিয়া দেখ সাহেবকে বাঁচাইতে পার কি না।'

কালাচাঁদ তৎক্ষণাৎ বাপুদেব শাস্ত্রীর বাড়ি আসিয়া তাহার নিকট সকল কথা বলিল। বাপুদেব কালাচাঁদকে বলিলেন, 'মদন দত্ত যদি তোমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হয়, তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। একাকী মুর্শিদাবাদে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।'

মদন দত্ত পূর্বে পরোপকারার্থ কখনো কোনো কষ্ট স্বীকার করিত না। কিন্তু সাবিত্রীর , বং বাপুদেব শাস্ত্রীর আচরণ দেখিয়া তাহার সেই পূর্বের কঠিন হৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়াছে। এখন সে কাহার কোন কষ্ট দেখিলে সেই কষ্ট নিবারণার্থ প্রাণপণে যত্ন করে। সে কালাচাঁদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে যাইতে সম্মত হইল। তাহার কন্যাদ্বয় বাপুদেবের বাড়িতে রহিল।

এদিকে রাত্র দুই প্রহরের সময় আবার ক্যারাপিটের চৈতন্য হইল। তখন তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'আমার এস্থার আসিয়াছে? একটু জল।'

সাবিত্রী তাঁহার মুখের নিকট জলের গ্লাস ধরিল।

তিনি জলপান করিয়া আবার বলিলেন, 'হায়! আমার এস্থারকে কে ভরণপোষণ করিবে?'

ইহার পর আরাটুন সাহেব ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিলেন। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। 'এস্থার—এস্থার' দুইবার এই শব্দ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইলে পরই তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাত্রি অবসান হইলে পর খাজেমাল আসিয়া দেখিলেন যে ক্যারাপিটের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তখন আর কয়েকজন আরমনিয়ানকে ডাকাইয়া আনিয়া ক্যারাপিটের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী এবং নবীন পাল ক্যারাপিটের মৃত্যুর পর দিবস প্রাতে বাপুদেবের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিল।

সাতাশ
এস্থার বিবির কলিকাতা যাত্রা

কালাচাঁদ এবং মদন দত্ত সাত আট দিবসের মধ্যে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া এস্থার বিবি এবং বদরন্নেসার নিকট ক্যারাপিট আরাটুনের পীড়ার সংবাদ প্রদান করিল। পতিপ্রাণা এস্থার স্বামীর সাংঘাতিক রোগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, একেবারে উন্মত্তার ন্যায় হইলেন; এবং পদব্রজে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা আসিবেন বলিয়া স্থিরকরিলেন। কিন্তু বদরন্নেসা অত্যন্ত দূরদর্শিনী এবং বুদ্ধিমতা রমণী ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে এস্থারের ন্যায় কুলকামিনীর পক্ষে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা পদব্রজে গমন করা একেবারে দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং তিনি এস্থারকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে নৌকারোহণে এস্থার বিবি এবং বদরন্নেসা, কালাচাঁদ ও মদন দত্তকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহাদিগের যাত্রাকালে রামার মা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, ‘আমার রামা প্রায় একমাত্র যাবৎ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। হয়তো সে কলিকাতা যাইয়া থাকিবেক, আমিও রামার অনুসন্ধানে কলিকাতা যাইব।’

এস্থার বিবি রামার মাতাকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইবার দুই তিন দিন পরে তাহাদের নৌকা আসিয়া একটি বাজারের নিকট উপস্থিত হইল। আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত নৌকার লোক বাজারে উঠিল। এই বাজারের মধ্যে অকস্মাৎ রামার সহিত তাহার মাতার সাক্ষাৎ হইল।

রামার মা রামাকে উচ্চৈঃস্বরে ‘রামা’, ‘রামা’ বলিয়া ডাকিবামাত্র সে তাহার মাতার নিকট আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; এবং চুপে চুপে বলিল, ‘কোম্পানির লোকেরা ধরিতে পারিলে আমাকে ফাঁসি দিবে। আমি রামহরিকে খুন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।’

রামার মাতা রামাকে লইয়া নৌকায় উঠিল। রামা নৌকারোহণ পূর্বক ইহাদিগের সঙ্গে কলিকাতা চলিল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ইহারা সকলেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল।

এস্থার বিবি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শোকে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী সর্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিত। মৃত্যুকালে তাঁর স্বামী বিলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর কিরূপ হইয়াছিল, ইহাই কেবল তিনি সাবিত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অহর্নিশ কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন।

এস্থার এবং বদরন্নেসার যে সকল অলঙ্কার ছিল তৎসমুদয় দুই লক্ষ টাকার বিক্রয় করিয়া মৃত স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিলেন। পর যে ক্ষুদ্রগৃহে আরাটুনের মৃত্যু হইয়াছিল, খাজেমালের নিকট হইতে সেই গৃহ ক্রয় করিয়া তাহারা কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাদের ভবিষ্যতের ভরণপোষণের নিমিত্ত হাতে আর অধিক টাকা রহিল না।

সেনাপতি মীরমদনের কন্যা, ধনাঢ্য আরমানিয়ান বণিক স্যামুয়েল আয়ারাটুনের পুত্রবধূ আজ নিতান্ত কাঙ্গালিনীর ন্যায় কলিকাতা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আটাশ
রামা ও রামহরি

রামাতাঁতি যে নিমিত্ত সৈদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহা পাঠকগণ এখন পর্যন্তও জানিতে পারেন নাই। রামহরির বিরুদ্ধে রামার অন্তরে দীর্ঘকাল হইতেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইতেছিল। রামা মনে করিত যে, রামহরির কুপরামর্শেই তাহাকে ও অন্যান্য তাঁতিদিগকে ক্যারাপিট সাহেবের কুঠি হইতে ধরিয়া নিয়া কাশিমবাজারের কুঠির কাছে নিযুক্ত করিয়াছেন। রামা এবং অন্যান্য তাঁতিগণ পূর্বে ক্যারাপিট আরাটুন সাহেবের রেশমের কুঠিতে কার্য করিবার সময় কখনো কোনো কষ্টানুভব করে নাই। আরাটুন সাহেব এই সকল তাঁতিদিগকে মাসিক আড়াই টাকা হারে বেতন দিতেন, কিন্তু ইংরাজেরা তাহাদিগকে মাত্র দেড় টাকা বেতন দিতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের কুঠিতে কাজ করিতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই সকল তাঁতিগণ প্রথমত আপন আপন দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিল। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজেরা ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

সাইক সাহেব কলিকাতা কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন যে তাঁতিগণ বড় ধূর্ত। তাহাদিগকে কাজ না করিতে হয়, সেই জন্য আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিতেছে।

কলিকাতা কৌন্সিল হইতে হুকুম হইল—যে সকল তাঁতি এইরূপ শঠতা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়াছে, তাহাদের বেতন কমাইতে হইবে। সুতরাং রামা প্রভৃতিকে ইংরাজেরা, এখন মাত্র মাসিক এক টাকা হারে বেতন দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

যে মাস হইতে রামা প্রভৃতির বেতন কমাইবার হুকুম হইল, তাহার পরের মাসের প্রথম দিন কাশিমবাজারের ফেক্টরির আসিস্টাণ্ট জেমস্ হারগ্রেব সাহেব (James Hargrave) রেশমের কুঠির বারান্দায় বসিয়া তাঁতিদগণকে বেতন দেওয়াইতেছেন। দুইখানি তক্তপোষের উপর একটি টেবিল। টেবিলের উপর ক্যাশবাক্স (cash-box) রহিয়াছে। সাহেব একটি কেদারার উপর বসিয়া বাক্স খুলিয়া রামহরির হাতে টাকা দিতেছেন। রামহরি ফর্দ হাতে করিয়া সাহেবের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক একজন তাঁতির নাম ডাকিয়া তাহার বেতন তাহার হাতে দিতেছে।

রামার নাম ডাকিয়া তাহার হাতে রামহরি একটি টাকা দিলেন। রামা বলিল, ‘এক টাকা দিলে কেন? আর আট আনা দিবে না?’

রামা জানিত না যে তাহাদের বেতন কমাইবার হুকুম হইয়াছে। সে মনে করিল রামহরি তাহার বেতন হইতে আট আনা আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে মাত্র এক টাকা দিয়াছে।

রামা এই প্রকার গোল করিয়া উঠিলে রামহরি কোপাবিষ্ট হইয়া তাহাকে পদাঘাতপূর্বক বলিল, 'বজ্জাত চুপ কর।'

রামার চরিত্র বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। অপরের নিষ্ঠুর ব্যবহার রামা কখনো সহ্য করিতে পারে না।

রামহরি তাহাকে পদাঘাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ হাতের বাঁশের লাঠি উত্তোলন পূর্বক বলিল, 'শালা না হয় ফাঁসি হবে—আজ তোকে খুন করব।'

এই বলিয়া হাতের লাঠি দ্বারা রামা রামহরির পৃষ্ঠে এবং কটিদেশে সজোরে বার বার আঘাত করিতে লাগিল। রামহরি তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেল, তাহার কটিদেশ এবং পদদ্বয় তক্তপোষের উপর রহিল, মস্তকটি তক্তপোষের নীচে ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। রামা তদবস্থাপন্ন রামহরির কটিদেশে আবার সজোরে আঘাত করিবামাত্র রামহরির কটিদেশের অস্থি একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

হারগ্রেব সাহেব 'শালা বজ্জাতকো পাকড়াও' বলিয়া উঠিবামত্র, রামা লাঠি দ্বারা সাহেবের পৃষ্ঠের উপর দুই তিন বার আঘাত করিল।

হরগোবিন্দ মুখজ্যা প্রভৃতি দেওয়ান ও অন্যান্য মহুরি, যাহারা গৃহের মধ্যে বসিয়া কার্য করিতেছিলেন, তাহারা আপন আপন প্রাণের ভয়ে ভিতর হইতে দরজা কয়েকটি বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

হারগ্রেব সাহেব দুই তিনটি যষ্টির আঘাত প্রাপ্তি মাত্রই 'রামসিং, গোপালসিং' বলিয়া কুঠির দ্বারবান এবং জমাদারকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

রাম সিংহ এবং গোপাল সিংহকে যখন সাহেবের নিকট আসিতে হয় তাহারা চাপকানটি পরিধান করিয়া আসে। আবার নিজের ঘরে গেলেই চাপকানটি খুলিয়া হাতের কাছে রাখে।

সাহেব তাহাদিগকে ডাকিবামত্র 'গোলাম হাজির' এই বলিয়া চাপকান পরিধান করিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়ি আর চাপকানের বাঁধ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের আসিতে একটু বিলম্ব হইল। সাহেব লাফ দিয়া নীচে পড়িয়া রিবলবার আনিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে রামা রামহরিকে মৃতপ্রায় করিয়া পলায়ন করিল।

সাহেবের রিবলবার এবং বন্দুক তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠে ছিল। সেখানে বসিয়া মেম সায়ংকালীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। সে প্রকোষ্ঠের দ্বার বন্ধ। পূর্বেই মেম সাহেবের সঙ্গে সাহেবের কথা ছিল যে, তিন চারি ঘটিকার পর আফিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মেম সাহেবকে লইয়া নদীর পারে বেড়াইতে যাইবেন।

সাহেব শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বার সজোরে আঘাত পূর্বক বলিলেন 'Open the door dear, open the door—প্রিয়ে দরজা খোল—প্রিয়ে দরজা খোল।

মেম। Hargrave you are too early; it is not yet three— তুমি বড় সকালে আসিয়াছ—এখনও তিনটা বাজে নাই।

সাহেব। Open the door dear. I went my revolver দরজা খোল—আমার রিবলবার চাই।

মেম। Wait a little, I will be ready in fifteen minutes—একটু বিলম্ব কর, পনর মিনিটের মধ্যেই আমি প্রস্তত হইব।

সাহেব। O dear what a silly girl you must be – Ramhari is being murdered – প্রিয় তুমি কি নির্বোধ — দরজা খোল। রামহরিকে যে খুন করিল।

মেম। That fool ought to be murdeared, I had been tilling him so often to get some Dacca muslin for me; but he has not brought it yet. Hargrave ! do you not recollect how pretty Miss Bensley looked, when she came to our house. She put on a very fine dress made of Dacca muslin — রামহরি মরিলেই ভাল। আমি বারম্বার তাহাকে ঢাকাই মস্‌লি ন আনিতে বলিয়াছি, কিন্তু আজও সে আনিল না। হারগ্রেব, তোমার মনে নাই মিস বেনস্লি যে দিন আমাদের বাড়ি ঢাকাই মস্‌লিনের পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেমন সুন্দর দেখা গিয়াছিল।

সাহেব। সজোরে আঘাত পূর্বক—What a silly girlyou are. I want my revolver – open the door dear. তুমি বড় নির্বোধ, দরজা খোল—আমি রিবলবার, চাই।

মেম। O you want you revolver – perhaps to shoot Ramhari – very good —তুমি রিবলবার চাও। রামহরিকে গুলি করিবে—আচ্ছা ভাল।

এই বলিয়া মেম সাহেব দরজা খুলিলেন। সাহেব আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া বাক্স খুলিয়া রিবলবার হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু রামা পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে। রামহরির পদদ্বয় এবং কটিদেশ তক্তপোষের উপর রহিয়াছে। মস্তকটি নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। সে ক্ষীণস্বরে হরগোবিন্দ মুখজ্যাকে ডাকিতেছে। মুখজ্যা মহাশয় একজন মুহুরিকে বলিতেছেন, ‘আগে খিড়কি খুলিয়া দেখ রামাতাঁতি গিয়াছে কি না। রামা ওখানে থাকিলে দরজা খুলিও না।’

হরগ্রেব সাহেব আসিয়া সাজোরে রামহরির হাত ধরিয়া দাঁড় করাইবার উপক্রম করিলে, রামহরি চিৎকার করিয়া বলিল, ‘সাহেব মলেম—মলেম। আমার প্রাণ যায়, আমাকে এখন তুমি একেবারে খুন করিও না। রাখ—রাখ।’

সাহেবের শব্দ শুনিয়া হরগোবিন্দ মুখজ্যা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন; অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া বলিলেন, 'বেটা দৌড়াইয়া পলাইল, নহিলে শালার হাড় গুঁড়ো করিয়া দিতাম।'

রামহরির কটিদেশের এবং পায়ের অস্থি একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার আর দাঁড়াইবার সাধ্য রহিল না; তাকিয়া ঠেস না দিয়া বসিতেও পারিত না। প্রায় দুই মাস যাবত রামহরি কাশিমবাজারে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসক বলিলেন যে কটিদেশের এবং পৃষ্ঠের হাড় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে। এই ভগ্ন হাড় আর জোড়া লাগিবে না। সুতরাং অগত্যা রামহরিকে কার্য পরিত্যাগপূর্বক স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইল। ইহার বাসস্থান কাটোয়া ছিল।

ঊনত্রিশ
রামহরি

পাঠকগণের সহিত রামহরির আর সাক্ষাৎ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোমস্তার কার্য ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং রামহরির পারিবারিক ইতিহাস এবং তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই স্থানেই উল্লেখ করিতেছি।

রামহরি একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহার পিতা জয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যূন পঞ্চাশটি বিবাহ করিয়াছিল। কেবল বিবাহ করিয়াই জয়গোবিন্দ জীবিকা নির্বাহ করিত। বিবাহ করাই তাহার একমাত্র ব্যবসা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদিগের রাজত্বকালে একবার জয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় চৌর্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সে আর লজ্জায় কখনো কোনো শ্বশুরবাড়ি যাইত না। মুর্শিদাবাদে কোনো এক ভদ্রলোকের পাচকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া, সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিল।

পলাসির যুদ্ধের সময় নবকৃষ্ণ মুন্সী যখন ক্লাইবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন; তখন তাঁহার সঙ্গী পাচক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। রামহরির পিতা এই ঘটনা উপলক্ষে নবকৃষ্ণের পাচকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া আসিল।

ইহার প্রায় পনর বৎসর পূর্বে রামহরির মাতা চরিত্র দোষে গৃহ বহিষ্কৃতা হইয়াছিল। সে পাঁচ বৎসর বয়স্ক স্বীয়পুত্র রামহরিকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা যাইয়া কোনো এক ভদ্র পরিবারের বাড়িতে পাচিকার কার্যে নিযুক্ত হইল।

এই সময়ে কলিকাতা অতি ক্ষুদ্র শহর ছিল। সুতরাং শহরের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গেই অপরাপর লোকের সহজে আলাপ পরিচয় হইত। নবকৃষ্ণ মুন্সির সঙ্গে রামহরির পিতা কলিকাতা আসিলে পর, রামহরির মাতার সঙ্গে তাহার গঙ্গার ঘাটে স্নান উপলক্ষে পরিচয় হইল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিচয় শ্রবণ করিবামাত্র তাহাদের স্মরণ হইল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল। রামহরির পিতা আপন স্ত্রী এবং পুত্রকে গ্রহণ করিল। সে নিজে তখন বৃদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতে রামহরি তাহাকে প্রতিপালন করিবে এই আশাতেই সে আপন বিবাহিতা স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পুত্রের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিল।

রামহরির বয়স এই সময়ে প্রায় বিশ বৎসর হইয়াছিল। সে স্বীয় পিতার সঙ্গে এখন প্রায়ই শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ মুন্সীর বাড়ি থাকিত। নবকৃষ্ণ মুন্সী অনেক কাঙ্গাল গরিবকে

অন্ন প্রদান করিতেন। নবকৃষ্ণের অনুরোধেই রামহরি প্রথমত ইংরাজদিগের কাশিমবাজারের কুঠির গোমস্তার কার্যে নিযুক্ত হইল।

রামহরি অত্যন্ত সুচতুর এবং কার্যদক্ষ ছিল। সে অনতিবিলম্বেই কাশিমবাজারের কুঠির সাহেবদিগের প্রসন্নতা লাভ করিল। ছিদাম বিশ্বাসের মৃত্যুর পর বোল্টস্ সাহেব তাহাকেই ছিদামের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ছিদামের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্বে রামহরির পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছিল। সে পিতা মাতার মৃত্যুর পর আর কলিকাতা যাইত না। কলিকাতার লোকে তাহাকে নবকৃষ্ণ মুন্সির পাচকের পুত্র বলিয়া জানিত। ইহাতে তাহার অপমান বোধ হইত। ছিদামের মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্বেই রামহরি বিলক্ষণ অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। সে তখন বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় মাতামহের বাড়ি কাটোয়া চলিয়া গেল। তাহার মাতামহের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার অন্য কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। কেবল একমাত্র বিধবা কন্যা তাহার বাড়িতে বাস করিতে ছিল। রামহরি আপন মাতামহের বাড়িতে যাইয়া তাহার বিধবা মাসীর সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিল। তাহার মাসী তাহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

রামহরির মাতা যে গৃহ বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন তজ্জন্য গ্রামস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাহাকে সমাজচ্যুত করিলেন না। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ সে সকল কথা লইয়া আর কোনো আন্দোলনও উপস্থিত করিলেন না। রামহরি এখন কোম্পানির সরকারে চাকরি করে। সে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। তাহার সহিত শত্রুতা করিতে কাহারও সাহস হইল না। বিশেষত গ্রামের দুই তিনজন প্রধান প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ পাত্রাভাবে কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামহরি একজন প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রামের অনেকেই মনে করিলেন যে, রামহরির নিকট কন্যাদান করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবেন। রামহরির অর্থ সম্পত্তি আছে। তাহার নিকট কন্যাদান করিলে কন্যাও সুখে থাকিবে।

দেবীবর কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন হইয়াছিল পরে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উপস্থিত হইত, রামহরিকে পাইয়া অনেকের মনেই আশার সঞ্চার হইল।

রামহরি প্রথমত গ্রামের প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তবিংশতিতম বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু এই কুলীন কন্যাটির কিছু অধিক বয়স হইয়াছিল বলিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার সাত আট দিন পরে, সে আবার রামগতি তর্কপঞ্চাননের কন্যাকে বিবাহ করিল। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কন্যাটি কিছু মুখরা ছিলেন। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা হইলেও তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না। একদিন রামহরি তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল; এবং তাহাকে কুলটা বলিয়া অপবাদ প্রদান পূর্বক হরিনাথ বাচস্পতির একাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। বাচস্পতি মহাশয় কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়াছিলেন না। কিন্তু রামহরি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের স্ত্রী

আগ্রহাতিশয়সহকারে বৃদ্ধ পতিকে রামহরির নিকট কন্যাদান করিতে বাধ্য করিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে বাচস্পতি মহাশয় অগত্যা রামহরির নিকটই কন্যা দান করিলেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের একাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবার দশ পনের দিন পরেই রামহরি ১৭৫৯ কি ১৭৬০ সালে পুনর্বার কাশিমবাজারে চলিয়া গেল। বিবাহ করিবার নিমিত্ত মাত্র তিন মাসের বিদায় লইয়া কাটোয়া আসিয়াছিল। তিন মাসের মধ্যে অনায়াসে ক্রমে তিনটি বিবাহ করিয়া কার্যস্থানে চলিয়া গেল। তিন স্ত্রীই তাহার বিধবা মাসীর সহিত তাহার মাতামহের গৃহে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার পর সাত বৎসরের মধ্যেও আর রামহরি দেশে আসিবার নিমিত্ত বিদায় পাইল না। কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির অধ্যক্ষ সাহেবেরা রামহরিকে বিদায় দিতে সম্মত হইতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, রামহরির অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাণিজ্যের কার্যকলাপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে।

রামহরির প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহের পরই স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। স্বামীর ভালবাসাই রমণীদিগকে কুপথ হইতে দূরে রাখে। সুতরাং রামহরির প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া মানব প্রকৃতির দুর্বলতা নিবন্ধন সত্বরই কুপথগামিনী হইল। তাহারা রামহরির গৃহেই অবস্থান করিত। কিন্তু গৃহকর্মে কখনো মনোনিবেশ করিত না। মধ্যাহ্নে চারিটি আহার করিয়াই গ্রামের এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াইয়া বেড়াইত। তাহার তৃতীয়া স্ত্রীকে তাহার মাসী যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেছিলেন। বিবাহের সময় তাহার মাত্র এগার বৎসর বয়স ছিল।

রামহরির মাসী তখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বামী অন্যূন এক শত বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর এই রমণীর আর কখনো স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বামীর মৃত্যুর এগার বৎসর পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি বিধবা হইয়াছেন।

শত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন স্ত্রীলোক নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পুঁথি শুনিবার অভ্যাস বিলক্ষণ ছিল। যে স্ত্রীলোকের যেরূপ রুচি, তিনি সেই প্রকার পুস্তক শ্রবণ করিতেন।

বর্তমান সময়ে যদ্রূপ বঙ্গদেশে দুই শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোক দেখা যায়, শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে অনেকানেক ভদ্রমহিলা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মনীতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মোপদেশ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগিশের লিখিত পুস্তক, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ করিতে ভালবাসেন। কিন্তু পক্ষান্তরে আবার অনেকানেক রমণী এই সকল পুস্তক স্পর্শও করেন না। তাঁহারা 'ফস্‌কে ছুঁড়ীর প্রেমের কথা' নামক সুগ্রন্থ, 'বাঙ্গালী চরিত', পাঁচুঠাকুরের লিখিত পুস্তকাবলী, সর্বদাই আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন।

শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে এই প্রকার দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিল। অনেকানেক স্ত্রীলোক রামায়ণ, মহাভারত এবং মুকুন্দরামের কবিকঙ্কনচণ্ডী ইত্যাদি পুস্তক শ্রবণ করিতেন। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোক বিদ্যাসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, রসিকরঞ্জন ইত্যাদি পুস্তক পাঠ ও শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন।

হরিদাস তর্কপঞ্চাননের কন্যা সুদক্ষিণা কিম্বা রামদাস শিরোমণির কন্যা শ্যামাসুন্দরী রামায়ণ এবং মহাভারতই সর্বদা পাঠ করিতেন।

কিন্তু রামহরির মাসী বাল্যকাল হইতে রামায়ণ মহাভারত শ্রবণ করিতে বড় ভালবাসিতেন না। বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণলীলা, রসিকরঞ্জন ইত্যাদি সুগ্রন্থ শ্রবণ করিতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত।

রামহরির বাড়ির নিকটেই অদ্বৈতানন্দ বাবাজীর আখড়া ছিল। আমাদের পূর্বোল্লিখিত ললিতানন্দ বাবাজী এই আখড়ায় থাকিতেন। রামহরি বিবাহ করিয়া কাশিমবাজারে চলিয়া গেলে পর, ললিতানন্দ বাবাজী প্রায় প্রত্যহ রামহরির বাড়ি আসিয়া তাহার মাসীর নিকট বিদ্যাসুন্দর, রাসলীলা ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিতেন। এই ঘটনার দশ বার বৎসর পূর্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে বিদ্যাসুন্দরের বিশেষ সমাদর ছিল।

রামহরির মাসী এবং তাহার তৃতীয়া স্ত্রী প্রত্যহই এই সকল পুস্তক বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। তাহার প্রথমা এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর মন বাড়িতে বড় তিষ্ঠিত না। তাহারা দুই জনে আহারান্তেই পাড়ার মধ্যে প্রতিবেশিদিগের বাড়িতে বেড়াইতে যাইতেন। এইরূপে রামহরির বিবাহের পর প্রায় সাত বৎসর যাবতই ললিতানন্দ বাবাজী বৈকাল বেলা রামহরির বাড়ি আসিয়া পুস্তক পাঠ করিত। রামহরির বাড়ি আসিবার দুই বৎসর পূর্ব হইতে রামহরির তৃতীয়া স্ত্রী কখনো কখনো অদ্বৈতানন্দ বাবাজীর আখড়ায় যাইয়া ললিতানন্দের কুটিরে বসিয়া বিদ্যাসুন্দর রাসলীলা ইত্যাদি গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। রামহরির মাসী তাঁহাকে কখনো আখড়ায় যাইতে নিষেধ করিতেন না। তিনি জানিতেন যে ললিতানন্দ বাবাজী অত্যন্ত ধার্মিক এবং শাস্ত্রজ্ঞ; তাহার গৃহে যাইয়া পুঁথি শুনিতে কোনো দোষ নাই। বিশেষত গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা শহরের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় একেবারে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকেন না। তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের বাড়ি কখনো কখনো পদব্রজে চলিয়া যান।

ললিতানন্দ বাবাজী সর্বদাই আপনাকে একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ বৈরাগী বলিয়া মনে করিত। তাহার আচার-ব্যবহার ভাব-ভঙ্গী সবই বৈষ্ণবোচিত ছিল।

ললিতানন্দ বাবাজীর পূর্ব বিবরণ জানিবার নিমিত্ত পাঠকদিগের কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইতে পারে, অতএব আমরা এখানে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ললিতানন্দ বাবাজী চণ্ডাল কুলতিলক অভিরাম মণ্ডলের পুত্র। তাহার পূর্ব নাম কেনারাম ছিল। তাহার পিতা অভিরাম গ্রামস্থ চাঁড়ালদিগের মধ্যে একজন মণ্ডল ছিল। তাহার বার্ষিক আয় এক শত টাকার ন্যূন ছিল না। সে আপন পুত্র কেনারামকে বাল্যকালে

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়াছিল, কেনারাম পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া এক কবির দলের সরকার হইল। কিন্তু সেই কবির দলে কয়েকজন কায়স্থের সন্তান এবং দুই একটি ব্রাহ্মণও ছিল। আহারাদি করিবার সময় কেনারামকে ঘরের বাহিরে বসিয়া আহার করিতে হইত। কবির দলের লোকের সঙ্গে যে একটি ভৃত্য ছিল, সে অন্যান্য সকলের উচ্ছিষ্টই পরিষ্কার করিত। কিন্তু কেনারামের নিজের উচ্ছিষ্ট পাত্র নিজের পরিষ্কার করিতে হইত। ইহাতে কেনারামের মনে মনে একটু অপমান বোধ হইতে লাগিল। কবির দলের মধ্যে সে একজন প্রধান গায়ক। কিন্তু নীচ জাতি বলিয়া তাহাকে বাহিরে বসিয়া আহার করিতে হয়; আপনার উচ্ছিষ্ট পাত্র আপনাকে ধৌত করিতে হয়। কেনারাম এই নিমিত্ত কবির দল পরিত্যাগ করিল এবং অদ্বৈতানন্দ বাবাজীর আখড়ায় আসিয়া মুস্তক মুণ্ডন পূর্বক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। বৈরাগীদিগের আখড়ায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চাঁড়াল সকলেই একত্রে আহার করে। সুতরাং চাণ্ডাল বলিয়া কেনারামের এখানে আর কোনো অপমান সহ্য করিতে হইল না। অদ্বৈতানন্দ বাবাজী কেনারাম চাঁড়ালকে ভেক প্রদানকালে ললিতানন্দ নামে অভিহিত করিলেন।

ললিতানন্দ বাবাজী পূর্বে কবির দলে ছিল বলিয়া রাগ রাগরাগিণী সহকারে পুস্তক পাঠ করিত। রামহরির মাসী এবং তার তৃতীয়া স্ত্রী ললিতানন্দকে পরম শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব বলিয়া মনে করিতেন। আবার ললিতানন্দের প্রত্যেক কার্য এবং অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভাব পরিলক্ষিত হইত। সে সর্বদাই শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অনুকরণ করিত। রামহরি চাকরি ত্যাগ করিয়া বাড়ি আসিলে পরও ললিতানন্দ বাবাজী তাহার বাড়ি আসিয়া তাহার মাসী এবং তাহার তৃতীয়া স্ত্রীর নিকট বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি পাঠ করিত। রামহরির মাসী রামহরির নিকট সর্বদাই ললিতানন্দ বাবাজীর প্রশংসা করিতেন।

রামহরির আজ পর্যন্তও কোনো সন্তানাদি হয় নাই। তাহার মাসী সর্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'বাছার আমার এত ধন দৌলত; কিন্তু একটি পুত্র জন্মিল না; এ ধন দৌলত কে ভোগ করিবে!'

রামহরি কার্য পরিত্যাগ করিয়া ১৭৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ি আসিয়াছিল। তাহার এখন আর উত্থানশক্তি নাই। সে সর্বদাই শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মাসী প্রথম দুই তিন দিন তাহার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন। কিন্তু তাহার সে শোক দুঃখ সত্বরই বিদুরিত হইল। দুই দিন পরে তিনি রামহরির শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বাপু তুমি যে টাকা রোজগার করিয়াছ তাহাতে আজন্ম চাকরি না করিলেও চলিবে। আর না হয় চাকরি নাই বা করিলে—তাহাতেই বা কী হইবে। কিন্তু বাপু তোমার একটি পুত্র সন্তান হইল না—তোমার এ ধন দৌলত কে খাইবে, তাই আমি সর্বদা ভাবিতেছি।

যে বৎসর আশ্বিন মাসে রামহরি অন্যূন সাত বৎসরের পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছিল; সেই বৎসর কার্ত্তিক মাসে তাহার তৃতীয়া স্ত্রী, পুত্র কামনা করিয়া কার্ত্তিকের ব্রত করিলেন। মাঘ, মাসেই রামহরির তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মিল।

রামহরির মাসী রামহরির পুত্র হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন পাড়ার নাপ্‌তানি, ধোপানি, প্রভৃতি স্ত্রীলোক আসিয়া বিশেষ আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিল।

রামহরির মাসী এই সকল স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাছারা তোমরা সকলে আমার রামহরির খোকাকে আশীর্বাদ কর। আমার রামহরি এই পাঁচ মাস হয় বাড়ি আসিয়াছে। খোকা পাঁচ মাসে হইয়াছে, অনেকে বলে যে পাঁচ মাসে সন্তান হসলে সে সন্তান বাঁচে না।'

নাপ্‌তানি বলিল, 'মা ঠাকরুণ, আপনার কোনো ভয় নাই, ছোট বৌ ঠাকরুণ কার্ত্তিকের ব্রত করিয়াছেন, তাহাতে ছেলে হইয়াছে। কার্ত্তিকের ইচ্ছা হইলে দুই মাসেও ছেলে হইতে পারে।'

ধোপানি বলিল, 'তাহার বাপের বাড়ি যে গ্রামে, সেই গ্রামে একজনের তিন মাসে এক ছেলে হইয়াছিল। সেও কার্ত্তিকের ব্রত করিয়াছিল বলিয়া এত শীঘ্র ছেলে হইল। কিন্তু সে ছেলের বয়স এখন দশ এগার বৎসর হইয়াছে।'

গ্রামের আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, 'যে পাঁচ মাসে হইয়াছে বলিয়াই একটি ছেলে হইয়াছে। দশ মাসে হইলে দুইটি ছেলে একত্রে হইত। কার্ত্তিকের কৃপা হইলে সকলেই হইতে পারে।'

রামহরি পাঁচ মাসে পুত্র হইয়াছে বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রায় সমুদয় স্ত্রীলোকই ইহার পর বৎসর হইতে কার্ত্তিকের ব্রতাবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। শত শত বন্ধ্যা স্ত্রীলোকও কার্ত্তিকের ব্রতাবলম্বন করিয়া পুত্রলাভ করিবেন বলিয়া আশা করিতে লাগিলেন। বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়ায় এই ঘটনা হইতে কার্ত্তিকের ভারি পশার হইয়া উঠিল। কিন্তু সতীনের শত্রু সতীন। রামহরির দ্বিতীয়া স্ত্রী কার্ত্তিকের এই পশার নষ্ট করিবার উপক্রম করিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ইনি অত্যন্ত মুখরা স্ত্রীলোক। ইনি বাড়ি বাড়ি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, 'কেবল কার্ত্তিকের কৃপায় ছেলে হইত না; ললিতানন্দ বাবাজীর নিকট পুথি শুনিয়াছে বলিয়া সেই পুণ্যেই ছেলে হইয়াছে।'

রামহরির তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের ক্রমে ছয় মাস বয়স হইল। তখন রামহরির মাসী অনেক সমারোহ করিয়া তাহার নামকরণ করাইলেন। রামহরির পুত্রের নাম কৃষ্ণহরি হইল।

রামহরির নিজে একদিনও স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে লইল না। সময়ে সময়ে তাহার মাসী অত্যড়ত আহ্লাদ করিয়া কৃষ্ণহরিকে আনিয়া রাহমহির ক্রোড়ে দিতেন। কিন্তু রামহরি স্বীয় তনয়কে বড় আদর করিত না। বিশেষত তাহার পায়ের হাড় একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল।

কটিদেশের হাড়ও ভাঙ্গিয়া ছিল। কেহ ধরিয়া না বসাইলে রামহরির উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কিরূপেই বা পুত্র ক্রোড়ে লইবে!

তাহার তিন স্ত্রী রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত না। কখনো কখনো সে তিন চারি দিন একক্রমে মলমূত্রের মধ্যে পড়িয়া থাকিত। তাহার পত্নীদিগের মধ্যে কেহ আসিয়া তাহার শয্যাস্তরণও পরিবর্তন করিয়া দিত না। তিন চারি দিন পরে শয্যা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহার প্রথমা স্ত্রীই তাহার বিছানাপত্র একবার ধৌত করিয়া দিত।

এইরূপে ক্রমে পাঁচ সাত বৎসর যাবত রামহরিকে কষ্ট ভোগ করিতে হইল। মলমূত্রের মধ্যে পড়িয়া থাকিত বলিয়া তাহার শরীর দুর্গন্ধময় হইল। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইত পুঁজ রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। শরীরের বেদনায় সর্বদা চিৎকার করিত। সময়ে সময়ে একটু জল চাহিয়াও পাইত না।

তাহার প্রথমা এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী মধ্যাহ্নে আহার করিয়াই প্রতিবেশিদিগের বাড়ি বেড়াইতে যাইতেন। তৃতীয়া স্ত্রীর নিকট এখনও ললিতানন্দ বাবাজী আসিয়া পূর্বের ন্যায় পুস্তক পাঠ করিত। ইনি পুস্তক শ্রবণে এত নিমগ্ন হইতেন যে, রামহরি তাহাকে শত চিৎকার করিয়া ডাকিলেও কোনো প্রত্যুত্তর পাইত না।

একদিন রামহরি ললিতানন্দ বাবাজীকে অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল, ‘শালা বৈরাগী, তুই আর আমার বাড়ি আসিস্ না।’

রামহরির তৃতীয়া স্ত্রীর তখন সক্রোধে স্বামীকে তিরস্কার পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘তোমার এই দুরবস্থা হইয়াছে—তাহাতে আবার বৈষ্ণব নিন্দা করিতেছে—বৈষ্ণবকে কর্কশ বাক্য বলিতেছে—না জানি তোমার অদৃষ্টে আর কত যন্ত্রণা রহিয়াছে।’

রামহরি তখন শুইয়া শুইয়া দন্ত কিড়মিড় করিতে লাগিল। কিন্তু উঠিয়া যাইয়া যে ললিতানন্দকে তাড়াইয়া দিবে এমন সাধ্য নাই।

সাত বৎসর যাবত নানাকষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বঙ্গীয় কুলাঙ্গার রামহরি পরলোকে গমন করিল। তাহার তৃতীয় স্ত্রীর ভ্রাতা রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় রামহরির নাবালক পুত্র কৃষ্ণহরিবাবুর অছি মকরর হইয়া রামহরির ত্যজ্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

রামহরি অনেক বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিল। হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়া এই তিন জিলায়ই তাহার অনেক তালুক ছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণহরিবাবু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় সেই সকল তালুক এবং অন্যান্য অনেক জমিদারি কায়েমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলেন। অনেকানেক সাহেবের হস্তলিখিত সার্টিফিকেট রামহরির বাক্সে ছিল। কৃষ্ণহরিবাবু লর্ড কর্ণওয়ালিসকে সেই সকল সার্টিফিকেট দেখাইয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন।

কৃষ্ণহরিবাবু বঙ্গদেশে একজন বিখ্যাত জমিদার হইয়া পড়িলেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, বীরভূম এই চারি জিলার ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতি হইলেন। তিনি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া পরিচিত; তাহাতে আবার তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য রহিয়াছে; সুতরাং হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য স্থাপিত না হইলে আর কাহার প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে? যখন রাজা রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা নিবারণার্থ উইলিয়েম্ বেণ্টিঙ্কের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তখন এই কৃষ্ণহরিবাবুই দেশীয় অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত একত্র হইয়া সহমরণ প্রথা সংরক্ষণার্থ বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেরূপ উচ্চ বংশে ইনি জন্মিয়াছেন তাহাতে এইরূপ চেষ্টা ইনি না করিলে আর কে করিবে। ইহার সঙ্গে অন্যান্য অনেকানেক লোক জুটিয়াছিল। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, দিনাজপুরের মহারাজাধিরাজ গাধাকান্ত রায় বাহাদুর, সৈদাবাদের জগন্নাথ বিশ্বাসের পৌত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদুর ইহারা সকলেই কৃষ্ণহরিবাবুর সহিত একত্র হইয়া হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণার্থ উইলিয়েম বেণ্টিঙ্কের নিকট এক দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু উইলিয়েম বেণ্টিঙ্ক ইহাদিগের দরখাস্তের পৃষ্ঠে স্বহস্তে লিখিলেন—'মহারাজাধিরাজ গাধাকান্তের এবং তাঁহার দলস্থ লোকের দরখাস্ত অগ্রাহ্য।'

কৃষ্ণহরিবাবুর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণবাবু এখন পিতার সকল প্রভুত্বই সংরক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুকে হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের গরিব বাহ্মণগণ বড় অভিসম্পাত করে। ইনি নাকি অনেকানেক গরিব ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করেন। স্বীয় পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণ সমাজে ইঁহারও সম্পূর্ণ আধিপত্যই রহিয়াছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি হুগলি বর্ধমান বাঁকুড়ার ব্রাহ্মণদিগকে ঠাকুরদিগের সহিত আহরাদি করিতে দিতেন না। ঠাকুরদিগকে পীরালি বলিয়া ঘৃণা করেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের মত প্রচার করিলে পর এই রামকৃষ্ণবাবুর সমাজস্থ লোকেরাই বিদ্যাসাগরকে একঘরে করিয়াছিল। ইনি এখনও জীবিত আছেন।

এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে দুইটি প্রধান অভিজাত পরিবারের অভ্যুদয় হইল। জগন্নাথ বিশ্বাসের পুত্র পৌত্রাদিগণ কায়স্থ সমাজের সমাজপতি হইয়া কায়স্থ সমাজ শাসন করিতেছেন। আর ব্রাহ্মণ সমাজে রামহরির পুত্র বলিয়া পরিচিত কৃষ্ণহরিবাবুর পুত্র পৌত্রগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজপতি হইয়াছেন।

তিরিশ
দুর্ভিক্ষ

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কালসহকারে সকলই রূপান্তরিত এবং পরিবর্তিত হইতেছে। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ জোয়ার ভাটার ন্যায় পর্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হইয়া সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছে। বর্তমান বিপদ ভাবী সম্পদের বীজ বপন করিতেছে, আবার সম্পদ রাশি সময়ে সময়ে বিপদের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু যিনি বিপদে, সম্পদে, সকল অবস্থায় সমভাবে সেই অবিনাশী, অলক্ষিত মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভীক চিত্তে সংসারের সকল কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ, যিনি আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সমগ্র মানব মণ্ডলীর সুখশান্তির জন্য সমাজ ব্যাপ্ত পাপ ও অত্যাচারের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন; তাঁহার নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। তিনি চির সুখী। সংসারের কষ্ট যন্ত্রণা এবং বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে কখনো পরাস্ত করিতে পারে না।

পক্ষান্তরে যাহাদের স্বার্থপরতা এবং অর্থগৃধ্নুতা নিবন্ধন বিবিধ নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং অত্যাচারে বিশ্বসংসার পরিপূর্ণ হইতেছে; যাহাদিগের অন্যায়াচরণই সমাজ ব্যাপ্ত শোক তাপ ও অশান্তির একমাত্র মূল কারণ; তাহারা কখনো এ সংসারে সুখ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

আশ্রয়হীনা, বিপন্না রমণী সাবিত্রী স্বীয় স্বামী এবং ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিয়াছে, তাহার পূর্বের সকল কষ্ট নিঃশেষিত হইয়াছ; তাহার দুঃখের অমানিশা অবসান হইয়াছে, তাহার সুখ-সূর্য ক্রমে উদয় হইতেছে।

সুখ সম্পদের ক্রোড়ভ্রষ্টা, সহৃদয়া এস্তার বিবি পতি শোকে দুর্বিসহ কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তাঁহার সেই চির হাস্য বিরাজিত প্রকল্প মুখকমল রাহুগ্রাসিতা চন্দ্রমার ন্যায় বিষাদের মলিন ছায়ায় সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি পবিত্র হৃদয়া নির্মল চরিত্রা, পুণ্যবতী। এ সংসারে তাঁহাকে দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। তাঁহার এই ক্ষণস্থায়ী দুঃখ কষ্ট সত্বরই নিঃশেষিত হইবে। তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি মঙ্গলময় পিতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে; জগন্মাতার ক্রোড় তাঁহার নিমিত্ত প্রসারিত রহিয়াছে। তিনি সত্বরই এই পাপ অত্যাচার পরিপূর্ণ নরক সদৃশ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতময়ের অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ সংসারের অনিত্য ধন লাভ করিবার নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সকল অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপরায়ণ ইংরাজ, বঙ্গসমাজ বিবিধ পাপ ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ করিল, যাহাদের অর্থগৃধ্নুতা নিবন্ধন শত শত বালক বালিকা পিতৃ মাতৃহীন হইল; পতিপ্রাণা এস্থার বিবি পতিহীনা হইলেন, তাহারা কি সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে পাপদণ্ড হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। কুকার্যের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। কি লর্ড ক্লাইব, কি বেরেলস্ট, কি কার্টিয়ার , কি বারওয়েল, কি বোল্টস্ ইহারা কেহই আপন আপন অন্যায়োপার্জিত ধনসম্পত্তি দ্বারা সুখী হইতে সমর্থ হয়েন নাই।

* * * * *

সাবিত্রী স্বামী এবং ভ্রাতার সঙ্গে বাপুদেবের বাড়িতে স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার স্বামী এবং ভ্রাতা অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। কলিকাতা থাকিয়া তাহারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জন করিতে লাগিল। হলধরের পুত্রের প্রতিপালনের ভার এখন সাবিত্রীই গ্রহণ করিল। কিন্তু বালকটি প্রমদা দেবীকেই মা বলিয়া ডাকিত, সর্বদা তাঁহারই নিকট থাকিতে ভাল বাসিত।

এস্তার বিবির হাতে আর একটি পয়সাও নাই। তিনি অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী এবং প্রমদা দেবী, এস্থার এবং এস্থারের সন্তানদিগের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন।

মদন দত্ত সোনা রূপার গহনার কারবার করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

মহারাজ নন্দকুমার কলিকাতা অবস্থান করিতেছেন। কী প্রকারে মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করাইয়া তিনি নিজে নায়েব সুবাদারে পদ লাভ করিবেন তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করাইয়া তিনি নিজে নায়েব সুবাদারের পদ লাভ করিতে পারিলে, পরে ক্রমে ইংরাজদিগকে এই বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কী দুরাশা! ইংরাজদিগের সাহায্যে পদ লাভ করিয়া পরে তাহাদিগের আধিপত্যের মূলে কুঠারাগাত করিবেন। মনে মনে সদভিপ্রায় থাকিলেও এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া কেহ কখনো কৃতকার্য হইতে পারে না।

মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির নিমিত্ত তিনি দিন দিন নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে সকল কৌশল ব্যর্থ হইল, তখন ইংলণ্ডে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নিয়োজিত এজেণ্ট কোর্ট অব ডিরেক্টর সমীপে রেজা খাঁর সকল দোষ ব্যক্ত করিতে লাগিল।

এই সকল বড় বড় লোকের কথা বলিতে বলিতে গরিব রামা তাঁতির নাম আমাদিগকে সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইতে হয়। কিন্তু রামা গরিব হইলেও ঈশ্বরের চক্ষে সে ক্ষুদ্র নহে। জ্ঞান, ধন, প্রভূত্ব সকলেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু সচ্চরিত্র লাভ করা সকলের ভাগ্যে

ঘটে না। রামা গরিব হইলেও সে সচ্চরিত্র ছিল। আমরা তাহার বিষয় দুই একটি কথা এস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

রামা কলিকাতা আসিয়া সাবিত্রীর ভ্রাতা কালাচাঁদের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিল। সে নিজে দুই একখানা বস্ত্র বয়ন করিয়া যে দুই এক টাকা উপার্জন করিত, তাহা সমুদয়ই এস্থার বিবিকে দিত। রামার মা এখন সাবিত্রীর সঙ্গে একত্রে বাস করে। সাবিত্রী তাহাকে স্বীয় জননীর ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রামার মা এখন বুঝিল যে সাবিত্রী কুচরিত্রা নহে; সে পরম পুণ্যবতী। সাবিত্রীর বিরুদ্ধে পূর্বে সে আপন অন্তরে যে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিত, তজ্জন্য মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিল।

মহারাজ নন্দকুমার বাপুদেবের বাড়ি আসিলে পর যখনই শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখনই রামা ইঁহাদিগের নিকটে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শ্রবণ করিত।

বাপুদেব শাস্ত্রী যে মহারাজ নন্দকুমারকে নিজের বাহুবলে মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিতে বলিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রামার মনে বড় আনন্দ হইত। সংগ্রামর কথা শুনিলে তাহার মন উল্লসিত হইত।

রামা সময়ে সময়ে ভাবিত যে মহারাজ নন্দকুমার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলে সে সর্বাগ্রে যুদ্ধে জীবন বিসর্জন করিবে।

রামার অন্তর বীরোচিত ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সে সময়ে সময়ে বলিত, 'আর তিন জন লোক আমার সঙ্গে জুটিলে কাশিমবাজারের রেশমের কুঠি গঙ্গায় ডুবাইয়া দিতে পারি।'

রামা অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কি শর্ত বৎসর পূর্বে, কি বর্তমান সময়ে, আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে বঙ্গদেশে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যে ঘোর স্বার্থপরতা রহিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়স্থ প্রায় অধিকাংশের কার্যের মধ্যে স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অশিক্ষিত রামার সকল কার্যের মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের ভাব রহিয়াছে।

* * * *

এই উপন্যাসের উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। কেবল কৃষ্ণানন্দ নামধারী নবকিশোর চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার ভগ্নীপতি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু সমাজের অগ্রণী হরিদাস তর্কপঞ্চানন এবং রামদাস শিরোমণি প্রভৃৎত কয়েকজন আপন আপন বাসস্থানেই পূর্বের ন্যায় বাস করিতেছিলেন। ইহাদিগের বিষয় কিছু বলিবার পূর্বে ১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষে দেশের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল; এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ যেরূপ আচরণ করিলেন, তাহাই অগ্রে উল্লেখ করিতেছি।

দিন দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে

অত্যাচারেরও বৃদ্ধি হইল। লর্ড ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিকসভার কার্য প্রণালী এবং লবণের একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপনে নিয়মাবলী কোর্ট অব ডিরেক্টর অনুমোদন করিলেন না। কেনই বা তাঁহারা অনুমোদন করিবেন? এ ত বাণিজ্য নহে। এ এক প্রকার ডাকাতি। দেশের সমুদয় লবণ ইংরাজেরা প্রত্যেক মণ বার আনা মূল্যে ক্রয় করিয়া, পরে দেশীয় বণিকদিগের নিকট পাঁচ টাকা হারে মণ বিক্রয় করিতেন, ইহাও কি ডাকাতি নহে?

কোর্ট অব ডিরেক্টর লবণের একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপনের নিয়মাবলী একেবারে রহিত করিবার নিমিত্ত বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতার গবর্ণর এবং কৌন্সিল তথাপি চক্রান্ত করিয়া, এই নিয়ম দুই বৎসরের মধ্যেও রহিত করিলেন না। দুই বৎসর পরে যখন কোর্ট অব জিরক্টর দেখিলেন যে লবণের বাণিজ্য ইহারা কোনো ক্রমেই রহিত করিতে চাহে না, তখন তাহারা দুই টাকা হারে লবণ বিক্রয় করিতে আদেশ করিলেন। পূর্বে ইংরাজেরা বার আনা হারে এক এক মণ লবণ ক্রয় করিয়া পাঁচ টাকা হারে বিক্রয় করিতে ছিলেন। এখন তাহারা সেই পাঁচ টাকার স্থলে প্রত্যেক মণের মূল্য দুই টাকা করিয়া লইতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহাদের প্রবল অর্থলিপ্সা ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। ক্লাইবের ভারত পরিত্যাগের পর বেরেলষ্ট সাহেবের সময় হইতে ইংরাজগণ ধান এবং চাউলের বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন।

নবাব আলিবর্দি খাঁ বিদেশীয় বণিকদিগকে ধান্য এবং চাউলের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে ধান বঙ্গবাসীদিগের প্রাণ। দেশ ধান চাউল শূন্য হইলে আর প্রজার প্রাণ রক্ষা হইবে না। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে কি আরমানিয়ান, কি পর্তুগিজ, কি ফরাশি, কি ইংরেজ, ধান্য এবং চাউল ক্রয় বিক্রয় করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না।

কিন্তু ইংরাজগণ ধান্যের বাণিজ্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলেন। ১৭৬৬ সনের পর ইহাতেই তাঁহারা ধান্যের বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৬৮ সনের বঙ্গদেশে অত্যল্প শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রজাগণ যে কর দিতে পারে এমন সাধ্য ছিল না। কিন্তু এ বৎসর প্রজাগণের নিকট হইতে কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া কর আদায় করা হইল। কৃষকগণকে আপন আপন গৃহের বীজ ধান্য পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া কর দিতে হইল। প্রজার গৃহে আর অধিক বীজ ধান্য রহিল না। এদিকে ইংরাজ বণিকগণ অনেক ধান্য ক্রয় করিয়া অধিকতর মূল্যে বিক্রয়ার্থ মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ১৭৬৯ সালে আবার অনাবৃষ্টি হইল। এক দিকে কৃষকের গৃহে বীজ ধান্যের অভাব রহিয়াছে; তাহার উপর আবার অনাবৃষ্টি। সুতরাং ১৭৬৮ সাল অপেক্ষাও এ বৎসর অত্যল্প শস্য হইল। প্রায় সমুদয় ধান্যক্ষেত্রই এক প্রকার শস্য শূন্য হইয়া পড়িয়া

রহিল। কলিকাতার গবর্ণর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় পূর্বেই সৈন্যদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট চাউল ক্রয় করিয়া রাখিলেন। সৈন্যদিগের প্রাণরক্ষা হইলেই তাহাদের ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য চলিবে। দেশের লোকের নিমিত্ত কে চিন্তা করে?

যে অল্প পরিমাণ শস্য হইয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রজাগণ স্বীয় স্বীয় দেয় কর আদায় করিল। কার্টিয়ার সাহেব এই সময় কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিলেন—'কোনো ভাবনা নাই, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দেশে শস্য অধিক না হইলেও কর আদায় সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।'

কিন্তু বৎসর শেষ হইতে না হইতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইল। দেশ শুদ্ধ লোকের হাহাকারে বঙ্গদেশ পূর্ণ হইল। সহস্র সহস্র নরনারী, সহস্র সহস্র বালক বালিকা দিন দিন অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ একেবারে শ্মশান হইয়া পড়িল।

একত্রিশ

এ কী ভীষণ দৃশ্য

Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.

বঙ্গদেশ অরাজক! বঙ্গে আর এখন কোনো প্রজাবৎসল রাজা নাই। এ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে যে কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিয়া ইহাদের প্রাণ বাঁচাইবে এমন কোনো লোক নাই।

মহম্মদ রেজা খাঁর হাতে রাজ্য শাসনের ভার রহিয়াছে। সে রাজপ্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। একবারও প্রজার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করে না। এ নিরপিশাচের হৃদয়ে দয়াধর্মের লেশমাত্র নাই। এ নির্দয়ের নাম স্মরণ করিলেও মন অপবিত্র হয়।

দেশে অনেক ধনী লোক রহিয়াছে। কিন্তু এবার আর সে ধনী লোকদিগের কিছু করিবার সাধ্য নাই। কি কৃষক, কি ধনী, কাহারও ঘরে অন্ন নাই। ধনীর গৃহে যথেষ্ট রৌপ্য মুদ্রা আছে, যথেষ্ট স্বর্ণ মহর রহিয়াছে, কিন্তু দেশে চাউল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ধনী, দুঃখী, কৃষক, ভূম্যধিকারী, সকলেরই সমান অবস্থা। সকলেই বলিতেছে, ‘মা অন্নপূর্ণা অনাহারে প্রাণ বিনাশ হইল—মা অন্ন প্রদান কর।’ ‘অন্ন—অন্ন—অন্ন’—সকলের মুখেই কেবল এই চিৎকার শুনা যায়। কোথায় গেলে অন্ন মিলিবে এ চিন্তা সকলের মনেই উদয় হইল।

দেশের অনেক ধান্য ইংরাজ বণিকগণ ক্রয় করিয়া কলিকাতা রাখিয়াছেন। পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। গৃহস্থের গৃহে কুলকামিনীগণ সন্তান বক্ষে করিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল। আহা! চন্দ্রসূর্যের মুখ যাহারা কখনো অবলোকন করে নাই, যাহারা কখনো গৃহের বাহির হয় নাই, আজ সেই কুলবধূগণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়া ভিখারিণীর বেশে কলিকাতা চলিল। স্বীয় স্বীয় অঞ্চলে স্বর্ণ মুদ্রা এবং বিবিধ মূল্যবান আভরণ বান্ধিয়া এক মুষ্টি অন্ন ক্রয় করিবার প্রত্যাশায় দেশ ছাড়িয়া চলিল।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা পর্যন্ত পৌঁছিতেই সমর্থ হইল না। শত শত কুলকামিনী, শত শত সুস্থকায় পুরুষ পথেই অনাহারে জীবন হারাইল। সন্তানবৎসলা

জননী সন্তান বক্ষে করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্তানক অনাহারে মরিয়া গেল। তাঁহার ক্রোড় শূন্য হইল। জননী সন্তান শোকে এবং ক্ষুৎপিপাসায় উন্মত্তার ন্যায় হইয়া অনতি-বিলম্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভ্রান্ত নর-নারীগণ! তোমরা বৃথা আশায় প্রতারিত হইয়া কলিকাতা চলিয়াছ। যে চাউল কলিকাতায় সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা তোমরা পাইবে না। তোমরা মরিলেই বা কী, বাঁচিলেই বা কী? তোমাদের নিমিত্ত কে চিন্তা করে? আর কি ভারতে প্রজাবৎসল রামচন্দ্র আছেন? উদারচেতা আকবর আছেন? অর্থগৃধ্নু রাজা কি কখনো প্রজার মঙ্গল কামনা করে? তাহার সৈন্যের প্রাণ রক্ষা হইলে হয়; সুতরাং সৈন্যদিগের নিমিত্ত তণ্ডুল সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ অতি মূল্যবান। তাহারা মরিয়া গেলে কে মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিবে? কে মহম্মদ রেজা খাঁর সদৃশ নরপিশাচের একাধিপত্য সংরক্ষণ করিবে?

কৃষক! তুমি কোন আশায় কলিকাতা চলিয়াছ? তুমি দেশের অন্নদাতা হইলেও তোমাকে কেহই এক মুষ্টি অন্ন দিবে না। ঐ দেখ, ধনীর গৃহের কুলকামিনীগণ স্বর্ণমুদ্রা অঞ্চলে বান্ধিয়া তণ্ডুল ক্রয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতা যাইতেছে। ইহার এক মুষ্টি অন্ন মিলিলেও মিলিতে পারে। ইহার সঙ্গে টাকা রহিয়াছে। কিন্তু বিনামূল্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ কাহাকেও এক মুষ্টি অন্ন দিবে না। কৃষকগণ! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। তোমাদের পরমায়ু এবার নিশ্চয় শেষ হইয়াছে। তোমার এই সংসার পরিত্যাগ করাই ভাল। পরমেশ্বর তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে তোমাকে স্থান প্রদান করিবেন। এ নিরপিশাচ পরিপূর্ণ শ্মশান সদৃশ বঙ্গদেশে থাকিয়া তুমি কখনো সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।

* * * *

ঘোর দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারী দ্বারা দিন দিন কলিকাতার রাস্তা-ঘাট পরিপূর্ণ হইতেছে। গঙ্গার পারে শত শত নারী অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছে। তাহাদিগের আর্তনাদ শ্রবণে গঙ্গা কল কল ধ্বনিতে বলিতেছেন—‘আমার বক্ষে তোমাদের শ্মশান নির্মিত হইতেছে; দুঃখ সন্তাপ পরিত্যাগ কর; তোমাদের সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা নিঃশেষিত হইবে। আমি তোমাদিগকে স্বীয় বক্ষে স্থান প্রদান করিব।’

অনাহারে দিন দিন সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোত তাহাদের মৃতদেহ ভাসাইয়া বঙ্গসাগরাভিমুখে লইয়া চলিল।

শত শত জননী মৃত সন্তান বক্ষে করিয়া অনাহারে গঙ্গার পারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এখন পর্যন্তও তাহাদের জীবন বায়ু নিঃশেষিত হয় নাই, কিন্তু ডোম ও মেথরগণ জীবিতাবস্থায়ই ইহাদিগকে অন্যান্য মৃতদেহের সঙ্গে একত্রে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করিতেছে।

কোথাও পাঁচ সাত জন পুরুষ ক্ষুধায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃক্ষপত্র চর্বণ করিতেছে।

গঙ্গার পার্শ্বস্থিত বটবৃক্ষ সমূহের আর পাতা নাই। সমুদয় বৃক্ষই প্রায় পল্লব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

শহরের মধ্যে কত শত দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত রমণী প্রবেশ করিয়া, এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ ঘোর দুর্ভিক্ষ মাতৃ হৃদয় স্নেহশূন্য করিল—নর নারীকে রাক্ষস প্রকৃতি প্রদান করিল।

পরদুঃখকাতর বাপুদের শাস্ত্রী প্রত্যহই গঙ্গার ঘাটে প্রাতঃস্নান করিতে আসিতেন। কিন্তু এই ভয়ানক অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। নর নারীর এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মণ সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ-কুলকামিনী শূদ্রের স্পৃষ্ট জল পান করিতেও ঘৃণা করিতেন। আজ তাহারা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন পাইলেও আহার করেন।

ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া বাপুদেবের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি এক দিন, চারি পাঁচ ঝুড়ি অন্ন আনিয়া গঙ্গার পারে এক দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কী ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল। অন্ন বিতরণ করিতে দেখিয়া চতুর্দিক হইতে প্রায় দুই তিন শত লোক দৌড়িয়া আসিয়া একত্রিত হইল। প্রত্যেকেই অপরাপর লোক পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বাপুদেবের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিষ্ণুপুরের দুই তিনটি ভদ্রবংশজাতা মহিলা, অন্যান্য লোকের পদতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। ইঁহারাও দুইটি অন্নের নিমিত্ত বাপুদেবের নিকট যাইতে ছিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে অনেক লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিল। তাঁহারা ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। শত শত লোক তাহাদিগের বুকের উপর পা দিয়া চলিয়া গেল। লোকের পদতলে পড়িয়া ইহাদিগের মৃত্যু হইল।

সমুদয় অন্ন বিতরিত হইলে পর আর শত শত লোক বাপুদেবের নিকট আসিয়া অন্ন চাহিতে লাগিল। এই লোকারণ্যের মধ্যে পড়িয়া বাপুদেবের প্রাণ বিনাশের উপক্রম হইলে, তাহার সঙ্গী রামা তাঁতি সমুদয় লোকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ নিজের বিপদের বিষয় কিছুই চিন্তা করিলেন না। শত শত লোককে অন্ন দিতে পারিলেন না বলিয়া, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। পঁচিশ ত্রিশ জন লোক আবার ‘অন্ন দাও—অন্ন দাও’ বলিয়া তাঁহাকে ধরিবামাত্র বৃদ্ধ সজল নয়নে দক্ষিণ হস্তখানি বাহির করিয়া বলিলেন, ‘বাছা! আমার এই হস্তখানি আহার করিয়া যদি তোমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় তবে এই মুহূর্তেই এই হস্তখানি দিতে পারি। আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমার সঙ্গে আর অন্ন নাই।’

ব্রাহ্মণের এই কাতরোক্তি শুনিয়া ক্ষুধার্ত লোকেরা চলিয়া গেল। লোকারণ্যের কোলাহল শেষ হইলে, বাপুদেব দেখিলেন যে অন্ন বিতরণকালে লোকের পদতলে পড়িয়া দুইটি ভদ্রমহিলা এবং আট নয়টি বালক মরিয়া গিয়াছে।

বাপুদেব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে কতদূর যাইয়া দেখেন রাস্তার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বুকের উপর একটি দুই বৎসর বয়স্ক বালক অবিশ্রান্ত মাতৃস্তন চোষণ করিতেছে। মাতার স্তনে আর দুগ্ধ নাই। স্তন হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু রুধির বালকের মুখে প্রবেশ করিতেছে।

বাপুদেব বালকটিকে উঠাইবামাত্র তাহার জননী চমকিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আবার কিছু দূর গমন করিয়া কী ভয়ানক দৃশ্যই অবলোকন করিলেন, 'এ কী ভীষণ দৃশ্য!' এই বলিয়া শাস্ত্রী ভূমিতলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সত্য সত্যই এ ভীষণ দৃশ্য! দরিদ্রতা এবং অন্নকষ্ট কি মাতৃ হৃদয় এইরূপ স্নেহ শূন্য করিতে পারে? মানুষ কি সত্য সত্যই দরিদ্রতা নিবন্ধন প্রকৃতি বিবর্জিত হয়? তবে তো দরিদ্রতাই সকল পাপের মূল কারণ! তবে এ মনুষ্য সমাজে যতদিন দরিদ্রতা থাকিবে, ততদিনই পাপতাপ শোক দুঃখ জগতে বিরাজ করিবে। দরিদ্রতা কি মানুষকে রাক্ষস প্রকৃতি প্রদান করে। দরিদ্রতা কি মানুষকে পিশাচ করিয়া তুলে? এ কী ভীষণ দৃশ্য! জননী ক্রোড়স্থিত মৃত সন্তানের মাংস আহার করিতেছে।

অসীম মাতৃস্নেহের তো কেহ সীমা করিতে পারে না। প্রশান্ত সাগর শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু মাতৃ হৃদয় তো কখনো স্নেহরস শূন্য হয় না। প্রশান্ত সাগর অপেক্ষা সুগভীর মাতৃ হৃদয় আজ স্নেহরস শূন্য হইল!

দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যদি মাতৃ হৃদয়ই স্নেহশূন্য হয়, তবে এ সংসারের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা সকলই বৃথা; সকলই অসার। সম্পদে লোকের স্নেহ ভালবাসা, প্রেম সকলই সংরক্ষিত হয়; কিন্তু বিপদকালে সকল চলিয়া যায়। তবে এ সংসারের স্নেহ প্রেম দয়া সুদ্ধ কেবল অবস্থার উপরেই নির্ভর করে? না—কখনো না—মাতৃস্নেহ, সাধ্বীর প্রেম কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এ ভীষণ দৃশ্য সমগ্র মানবমণ্ডলীর জীবনের অবস্থা সপ্রমাণ করে না।

পাঠক! এ ভীষণ দৃশ্য পরিত্যাগ কর। একবার কলিকাতার আরমানিয়ান পাড়ায় গমন কর। এস্থার বিবি যে ক্ষুদ্র একতালা গৃহে মাতৃশয্যায় পড়িয়া আছেন সেই গৃহে প্রবেশ কর। দেখিতে পাইবে বিপদ দরিদ্রতা কিছুতেই সাধ্বীর প্রেম, জননীর স্নেহ, বিনাশ করিতে পারে না।

* * * *

দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন কলিকাতায় তণ্ডুলের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সাবিত্রী এবং প্রমদা দেবী এস্থার বিবিকে যে কয়েকটি টাকা দিতেছেন তদ্দ্বারা তাঁহার সকল ব্যয় নির্বাহ হয় না।

এস্থার বিবি বদরন্নেসা এবং এস্থারের পুত্র দুইটি এখন দিনের মধ্যে একবার মাত্র আহার করেন। দুই সন্ধ্যা আহার করিবার সাধ্য নাই।

কিন্তু পুত্রদ্বয়ের আহারের কষ্ট দেখিয়া সন্তানবৎসলা এস্থারের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে

লাগিল। তিন নিজে কিছুই খাইতেন না। তাঁহার ভাগের অন্ন চারিটি রাখিয়া দিতেন। অপরাহ্ণে সেই অন্ন ভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে এবং স্বীয় জননীসদৃশী বদরন্নেসাকে দিতেন।

বদরন্নেসা এস্থারকে প্রাণ অপেক্ষাকে ভালবাসিতেন। তিনি এস্থারকে এইরূপ অনাহারে থাকিতে দিতেন না। পরে এস্থার বিবি নিজের ভাগের অন্ন আহার না করিয়া, গোপনে অপরাহ্ণে সন্তানদ্বয়কে খাওয়াইতে লাগিলেন। তিন চারি দিন পরেই অনাহারে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। বদরন্নেসা এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, নিজে আর অন্ন মুখে করিতেন না। এস্থারকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এস্থার বিবি তাঁহাকে বলিতেন, 'মা, আমার মৃত্যু হইলে তুমি ভিক্ষা করিয়াও আমার এই পুত্র দুইটিকে বাঁচাইতে পারিবে। তুমি অনাহারে মরিয়া গেলে আমার সন্তান দুইটিও বাঁচিবে না।'

বদরন্নেসা এই সকল কথা শুনিয়া কেবল ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি অনাহারে থাকিয়া এস্থারকে আহার করাইবেন। এস্থারের ইচ্ছা যে তিনি অনাহারে থাকিয়াও বদরন্নেসার জীবন রক্ষা করেন।

বদরন্নেসা অপেক্ষাও এস্থারের হৃদয় বড় সুকোমল ছিল। সুতরাং বদরন্নেসা শত চেষ্টা করিয়াও এস্থারকে খাওয়াইতে পারিতেন না। আজ এস্থার মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সাবিত্রী তাঁহার এই অবস্থার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। সে সজল নয়নে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে।

এস্থার বলিতেছেন, 'সাবিত্রী, আমি চলিলাম আমার সন্তান দুইটি এবং মাতা যাহাতে বাঁচিয়া থাকে তাহার চেষ্টা করিবে।'

'মা, তুমি চলিলে! তুমি মাতার ন্যায় আমাকে আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছিলে। তোমার একথা শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।' এই বলিয়া সাবিত্রী এস্থারের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এস্থার। আমি সন্তানের ন্যায় তোমাকে ভালবাসি। তুমিও আমার সন্তানের কার্যই করিয়াছ। আমার স্বামীর মুখে মৃত্যুশয্যায় যে তুমি জল দিয়াছিলে, তাহা আমি কখনো ভুলিব না। এ সংসার ছাড়িয়া যাইতে আমার আর কোনো কষ্ট নাই। কেবল সন্তান দুইটি এবং মার জন্য কষ্ট হইতেছে।

সাবিত্রী। তুমি কখনো চলিয়া যাইতে পারিবে না। আমি যেরূপে হয় তোমাকে বাঁচাইব। তুমি আহার কর। এই দেখ, প্রমদা দেবী তোমার নিমিত্ত রামার দ্বারা পথ্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রমদা দেবীর নাম শুনিয়া এস্থারের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কিছু কাল পরে বলিলেন, 'প্রমদা দেবী বড় দয়াবতী। একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়।'

সাবিত্রী। তিনি কি মানুষ! তিনি সত্য সত্যই দেবতা! তাঁহাকে বলিলে এখনই আসিয়া তিনি আপনাকে দেখিয়া যাইবেন।

এস্থারের এই কথা শুনিয়া রামা তখনই যাইয়া বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকট বলিল, 'ক্যারাপিট সাহেবের মেম মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন। তিনি প্রমদা দেবীকে একবার দেখিতে চাহেন।'

বাপুদেব কন্যাকে সঙ্গে করিয়া এস্থারের বাটী আসিলেন। প্রমদা দেবীকে দেখিবামাত্রই এস্থারের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

এস্থার বলিলেন, 'আপনি আমার সন্তান দুইটিকে এবং আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার নিকট চিরঋণী হইয়া চলিলাম।'

প্রমদা দেবী। (সজল নয়নে) আপনি একটু দুগ্ধ পান করুন। তবে সবল হইতে পারিবেন।

এস্থার। আমার আর বাঁচিবার আশা নাই।

এস্থার বিবির এই কথা শুনিয়া প্রমদা দেবীর চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি বাক্য দ্বারা হৃদয়ের ভাব কখনো প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তিনি প্রায়ই নির্বাক থাকিতেন। কখনো তাঁহাকে কেহ অধিক কথা বলিতে শুনে নাই। তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় ভালবাসা, তাঁহার সেই নিঃস্বার্থ প্রেম এবং দয়া, বাক্য দ্বারা কি প্রকাশ করা যাইতে পারে? সেইরূপ স্বর্গীয় প্রেম, সেইরূপ দয়া, জগতে কখনো পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং মানবভাষায় হৃদয়ের সে ভাব প্রকাশার্থ উপযুক্ত শব্দ আজ পর্যন্তও বিরচিত হয় নাই।

এস্থার বিবির শরীর ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিল; ক্রমে তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইতে লাগিল। তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

বদরন্নেসা বলিল, 'মা, আমাকে ফেলিয়া চলিলে?'

এস্থার। (স্বীয় পুত্র দুইটির হাত ধরিয়া) এই দুই সন্তান তোমাকে দিয়া চলিলাম।

বদরন্নেসা। মা, আমি তোমাকে ছাড়িয়া এ সংসারে কিরূপে থাকিব?

এস্থার। আমার দুইটি সন্তান বুকে করিয়া থাক।

সাবিত্রী। মা! আমার মার মৃত্যুর পর আপনি আমার মা হইয়াছিলেন। কী অপরাধে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন? মা, তুমি যাইতে পারিবে না।

এস্থার। (সাবিত্রীর হাতের উপর হাত রাখিয়া) পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, আমি চলিলাম।

মৃত্যুশয্যায় ইহাদের প্রত্যেককে এইরূপ শোকার্ত দেখিয়া প্রমদা দেবী নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

ইহার কিছু কাল পরেই এস্থার বিবির কণ্ঠ একেবারে অবরোধ হইল। আর কথা বলিবার সাধ্য নাই। বদরন্নেসা এবং সাবিত্রী হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহাদিগেরও আর্তনাদ শ্রবণে প্রমদা দেবী একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

এস্থার বিবির অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি স্থির নেত্রে সন্তানদ্বয়ের মুখের দিকে

চাহিয়াছিলেন। 'ক্যারাপিট' এই শব্দ বলিবামাত্র তাঁহার দেহ জীবন শূন্য হইল। পাপ ও অত্যাচার পরিপূর্ণ নরক সদৃশ্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্মল আত্মা অমৃত ধামে চলিয়া গেল।

হা পরমেশ্বর! সেনাপতি মীরমদনের কন্যা, অতুল ঐশ্বর্যশালী আরমানিয়ান বণিক স্যামুয়েল আরাটুনের পুত্রবধু, এস্তার বিবি আজ দরিদ্রতা নিবন্ধন অনাহারে অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলেন। যিনি প্রত্যহ শত শত কাঙ্গাল গরিবকে অন্ন বিতরণ করিতেন; যাঁহার অপার দয়া ও দানশীলতা নিবন্ধন সৈদাবাদে কোনো কাঙ্গালীকে কখনো অনাহারে থাকিতে হয় নাই, আজ সেই দয়াবতী পূর্ণ লক্ষ্মী এস্থার বিবি অন্নকষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন। ধিক্ এ সংসারের অর্থগৃধ্নু লোকদিগকে, অর্থ লোভে ইহারা এই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে, দিন দিন, মুহূর্তে মুহূর্তে, ঈদৃশ হৃদয়ভেদী দৃশ্য আনয়ন করিতেছে।

বত্রিশ
বাপুদেব শাস্ত্রী এবং মহম্মদ রেজা খাঁ

এস্থার বিবির মৃত্যু শয্যায় প্রমদা দেবী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা সেই অচৈতন্যাবস্থায়ই তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের সময় দিন দিন লোকের নানাবিধ কষ্ট যাতনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে তাঁহার বড় নিদ্রা হইত না। এইরূপ মানসিক কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িল। বাপুদেব বুঝিতে পারিলেন যে, কোমলহৃদয়া প্রমদা আর অধিক কাল এ সংসারে থাকিতে সমর্থ হইবেন না।

এস্থারের মৃত্যুর তিন দিন পরে, প্রমদা এত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর উত্থান শক্তি রহিল না। তাঁহার পিতা তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সাবিত্রী তাঁহার চরণতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

কিছুকাল পরে প্রমদা দেবী বলিলেন, 'বাবা, এই দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের কষ্ট নিবারণার্থ কি কোনো উপায় নাই?'

শাস্ত্রী। বাছা! আমি গরিব ব্রহ্মণ। আমার কী সাধ্য আছে।

প্রমদা। বাবা! দাদা বলিয়াছিলেন যে তিনি আমাকে এবং মাকে উপাহার প্রদান করিবেন বলিয়া যে অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যের টাকা আমার প্রয়োজন হইলেই আমাকে দিবেন। আমি কখননো তাঁহার নিকট সেই টাকা চাহিতাম না। কিন্তু এখন সেই টাকা আনাইয়া এই অনাথদিগের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিলে ভাল হয় না?

শাস্ত্রী। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি সেই টাকা চাহিতে পার। কিন্তু আমি নিজে নন্দকুমারের নিকট এই সকল কথা কিছু বলিতে পারিব না।

প্রমদা। তবে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনুন।

বাপুদেব শাস্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল মহারাজ বোলাকি দাসের বাড়ী গিয়াছেন। বোলাকি দাস শেঠের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর সহিত সম্পত্তি লইয়া গঙ্গাবিষ্ণুর বিবাদ হইতেছে।

প্রমদা দেবী জানিতেন যে তাঁহার অলঙ্কারের মূল্যের নিমিত্ত বোলাকী দাস মহারাজ নন্দকুমারকে তমশুক দিয়াছেন। কিন্তু বোলাকী দাসের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অলঙ্কারের মূল্যের টাকা আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সেই টাকা

দ্বারা তিনি যে দুর্ভিক্ষ নিপীক্ষিত লোকের সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল চিন্তা করিয়া প্রমদা দেবী আবার বলিলেন, 'বাবা! ইতিপূর্বে এদেশে কখনো দুর্ভিক্ষ হইয়াছে?'

বাপুদেব। অনাবৃষ্টি কিম্বা দৈব দুর্ঘটনা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বই কী। কিন্তু এইরূপ ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা যে আর কখনো এই দেশে সমুপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার বোধ হয় না।

প্রমদা। পূর্বে কখনো দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকিলে বোধ হয় দেশের ধনী লোকেরা গরিবদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

বাপুদেব। বাছা! দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত রাজাকেই যত্ন করিতে হয়। কিন্তু দেশ এখন অরাজক। মহম্মদ রেজা খাঁর উপর রাজ্যশাসনের ভার। সে কিরূপে কোম্পানির লোককে ঘুষ দিয়া আপন পদ রক্ষা করিবে তাহারই কেবল চেষ্টা করে। কোম্পানির লোকেরা আবার কিরূপে এদেশের সমুদয় অর্থ সম্পত্তি লুট করিবে তাহারই উপায় দেখিতেছে। এখন প্রজার কষ্ট কে দেখে। দেশে প্রজাবৎসল রাজা থাকিলে এ দুর্ভিক্ষে একটি লোকেরও প্রাণ নষ্ট হইত না।

প্রমদা। বাবা, তবে আপনি একবার সেই রেজা খাঁর নিকট যাইয়া লোকের দুরবস্থার কথা বলুন। অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে।

শাস্ত্রী। বাছা! তুমি এ সংসারে কে কেমন লোক তাহা জান না, তাই এইরূপ বলিতেছ। রেজা খাঁ শুনিয়াছি অনেক ধান্য ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে, সে উচ্চমূল্যের বাজারে তাহা বিক্রয় করিবে। সে কি আর প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিবে।

প্রমদা। না, বাবা! লোকের এইরূপ দুরবস্থার কথা শুনিলে অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে। এও কি সম্ভব? মানুষ মানুষের এত কষ্ট দেখিতে পারে? বিশেষত সে দেশের রাজা।

শাস্ত্রী। রেজা খাঁ নিতান্ত নরপিশাচ। সে কখনো প্রজাদিগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না। আমি নিজেও একবার মনে করিয়াছিলাম যে মুর্শিদাবাদে যাইয়া তাহার নিকট এই সকল বিষয় বলিব। কিন্তু নন্দকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেষে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাতে কোনো ফল হইবে না। বিশেষত এখন তোমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমি তোমাকে ফেলিয়া আর কোথাও যাইতে পারিব না।

প্রমদা। বাবা! আমার জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই। এই সকল লোকের কষ্ট দেখিয়াই আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না। তাহাতেই এইরূপ হইয়াছে। আপনি এখনই মুর্শিদাবাদে যাইয়া তাঁহাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলুন। আমার নিমিত্ত এক মুহূর্তও চিন্তা করিবে না। সাবিত্রী এখানে আমার সেবা শুশ্রূষা করিবে।

শাস্ত্রী। বাছা! মহম্মদ রেজা খাঁর নিকট এই সকল বিষয় বলিলে কোনো ফল হইবে না। তুমি কেন আমাকে অনর্থক তাহার নিকট যাইতে বলিতেছ।

প্রমদা। না, বাবা। আপনি এখনিই মুর্শিদাবাদে গমন করুন। এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবেন না। দিন দিন সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইতেছে। অনেক অনেক নবাবই তো আপনার পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতেন।

শাস্ত্রী। বাছা, তুমি কিছুই বুঝিতে পার না। রেজা খাঁর ন্যায় নরপিশাচ কখনো আমার কথা গ্রহ্য করিবে না। হয়তো ঘৃণা করিয়া আমাকে তাহার দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিবে। আমার সহিত সাক্ষাৎও করিবে না।

প্রমদা। আচ্ছা আপনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না।

বাপুদেব শাস্ত্রী পূর্বেও মহম্মদ রেজা খাঁর নিকট যাইবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এখন আবার প্রমদা বারম্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকের কষ্ট দেখিয়া তিনি নিজেও মনে মনে যারপরনাই কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে মুর্শিদাবাদ যাইবেন বলিয়াই স্থির করিলেন; এবং অনতিবিলম্বে রামা তাঁতিকে সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রামা ইংরেজদিগের ভয়ে পলাইয়া কলিকাতায় রহিয়াছে। কিন্তু পরোপকার করিবার কোনো সুযোগ উপস্থিত হইলে, সে নিজের বিপদের নিমিত্ত ভ্রূক্ষেপও করিত না।

বাপুদেবের বয়স আশী বৎসরের অধিক হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই যৌবন সুলভ জ্বলন্ত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ইহারা মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। এখন সৈদাবাদ এবং কাশিমবাজারের নিকটবর্তী গ্রামসমূহের দুরবস্থা দেখিয়া বাপুদেবের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। এই সকল লোকপরিপূর্ণ গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

বাপুদেব মুর্শিদাবাদে প্রায় সমুদয় লোকের নিকটই পরিচিত ছিলেন। আলিবর্দির রাজত্বকালে মহম্মদ রেজা খাঁর ন্যায় শত শত লোক বাপুদেবের প্রসাদাকাঙ্ক্ষা ছিলেন। সুতরাং তিনি নির্ভীক চিত্তে মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাহার নিকট লোক দ্বারা খবর পাঠাইলেন। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, তিনি বাপুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ।

মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এইরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কোপানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া মহম্মদ রেজা খাঁর লোককে বলিলেন, 'এখনই তোর প্রভুর নিকট যাইয়া বল যে, সে নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুক; নহিলে নিশ্চয়ই তাহার অমঙ্গল হইবে।'

মহম্মদ রেজা খাঁর লোক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ ভীত হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রভুর নিকট গমন করিয়া অবিকল এই সকল কথা বলিল।

এ সংসারে স্বার্থপরায়ণ, অর্থগৃধ্নু, নীচাশয় লোক প্রায়ই কাপুরুষ। সদ্ব্যবহার কিম্বা মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা এই সকল কাপুরুষদিগকে কখনো বশীভূত করা যায় না। ভয় প্রদর্শন না করিলে ইহারা লোকের সহিত কখনও সদ্ব্যবহার করে না। যাহাদের অন্তরে বীরত্বের ভাব আছে তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেও তাহারা লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করে; কিন্তু কাপুরুষদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিলেও তাহারা বিনীত ভাব অবলম্বন করে। মহম্মদ রেজা খাঁ নিতান্ত কাপুরুষ ছিল। ভৃত্যের প্রমুখাৎ বাপুদেব শাস্ত্রীর তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। মনে করিল হয়তো বাপুদেব শাস্ত্রীর সহিত কলিকাতাস্থ গবর্ণর কিম্বা কৌন্সিলের মেম্বারদিগের আলাপ পরিচয় থাকিতে পারে। এই ভাবিয়া বাপুদেবকে নিজের প্রকোষ্ঠে আনয়ন করিতে ভৃত্যকে প্রেরণ করিল।

বাপুদেব গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রেজা খাঁ সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার হস্তেই এখন রাজ্যশাসনের ভার রহিয়াছে। প্রজার কী দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা কি আপনি একবারও চিন্তা করেন?'

রেজা খাঁ। পণ্ডিত মহাশয়! এই তিন মাস যাবৎ আমি শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন বড় কষ্ট পাইতেছি—কই কোনো প্রজার তো কোনো দুরবস্থার কথা শুনি নাই—তবে খাজনা আদায় সম্বন্ধে এ বৎসর বড় কষ্ট হইতেছে বটে।

শাস্ত্রী। দেশে যে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। দিন দিন যে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতেছে, তাহা কি আপনি দেখেন না?

রেজা খাঁ। বোধ হয় সেই জন্যই খাজনা আদায়ের কিছু বাধা পড়িতেছে। খাজনা আদায়ের নিমিত্ত যে কী উপায় অবলম্বন করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারি না।

শাস্ত্রী। তুমি কেবল খাজনা আদায়ের বিষয়ই চিন্তা করিতেছ। দেশ যে একেবারে জনশূন্য হইল সে বিষয় কোনো চিন্তা কর না।

রেজা খাঁ। পণ্ডিত মহাশয় মানুষ মরিয়া গেলে আমি কী করিব। খোদার ইচ্ছা। আমি তো আর কাহারো পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারি না।

শাস্ত্রী। দেশের লোক যে সব অনাহারে মরিতেছে। ইহাদের আহারের কোনো সংস্থান করিবার উপায় দেখিতে হয় না?

রেজা খাঁ। আমি তো আর দেশশুদ্ধ লোকের খোরাকি দিতে পারি না।

শাস্ত্রী। তুমি এখন বঙ্গের নায়েব সুবাদার। যাহাতে প্রজার প্রাণরক্ষা হয় তাহা তোমাকেই করিতে হইবে।

রেজা খাঁ। মশাই আমি কিরূপে প্রজার প্রাণরক্ষা করিব? খাজনা আদায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহার উপর আবার নিজে এই তিন মাস যাবৎ ব্যারামে কষ্ট পাইতেছি।

রাজস্ব আদায়ের কাজকর্ম পর্যন্ত দেখিবার সাধ্য নাই। এখন কে মরে, আর কে বাঁচে, তাহার খবরও কি আবার আমাকে লইতে হইবে?

শাস্ত্রী। তুমি আমার কথা শুনিয়া বুঝি কিছু বিরক্ত হইয়াছ। কিন্তু তোমার ন্যায় ঘৃণিত মুসলমান কুলাঙ্গারকে আমি ভয় করি না। তোমার বিরক্তি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসা করি, তুমি প্রজাগণের প্রাণ রক্ষার্থে কিছু করিবে কি না?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কাপুরুষদিগকে ধমকাইলেই তাহারা বিনীত ভাব অবলম্বন করে। রেজা খাঁ শাস্ত্রীর কথা শুনিয়া আবার একটু ভীত হইয়া বলিল, 'পণ্ডিত মশাই, রাগ করিবে না। আমি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বড় কষ্ট পাইতেছি। কাজকর্ম কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই।'

শাস্ত্রী। কাজকর্ম দেখিবার সাধ্য নাই? তবে বেতন গ্রহণ করিতেছ কেন? বেতন গ্রহণ করিতে লজ্জা হয় না?

রেজা খাঁ। (সমধিক ভীত হইয়া) আজ্ঞে আপনি বাহাদুর যখন আমার উপর মেহেরবান হইয়া এই পদ দিয়াছেন, তখন আমি অবশ্য বেতন পাইতে পারি।

শাস্ত্রী। কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের নিজের ঘর হইতে টাকা আনিয়া তোমাকে বেতন দিতেছেন নাকি? না প্রজা সাধারণের নিকট হইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা হইতেই বেতন পাইতেছ? তবে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টি করিবে না কেন?

রেজা খাঁ। পণ্ডিত মশাই আমি স্বীকার করি যে দুই টাকা দান করিলে অবশ্য পুণ্য হয়। আমাদের কোরানেও তাহা লেখা আছে। ছাখায়াত কর্ণেছে, ও তো আচ্ছা হায়।

শাস্ত্রী। তোম্ তো আচ্ছা ছাখী হায়।

রেজা খাঁ। তব্ আপ্ ক্যা বোল্তা।

শাস্ত্রী। আরে নরাধম ম্লেচ্ছ। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার প্রাণরক্ষা করা কি ছাখায়াত্? এ তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের দান নহে। প্রজার প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই সমুদয় রাজকার্য চালাইতেছ। এখন তাহারা মরিয়া যাইতেছে। তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তোমার এই ম্লেচ্ছহৃদয় যদি প্রজার দুঃখেও ব্যথিত না হয়, তবে অন্তত এই মনে করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা কর, যে প্রজা সকল মরিয়া গেলে তোমার খাজানা আদায়ও হইবে না।

রেজা খাঁ। পণ্ডিত মশাই, আপনার এই শেষের কথা স্বীকার করি। প্রজাগুলি মরিয়া গেল সত্য সত্যই খাজানা আদায় হইবে না।

শাস্ত্রী। তবে প্রজার প্রাণরক্ষার্থ তণ্ডুল বিতরণ করিবার উদ্যোগ কর। আমি শুনিয়াছি, তুমি তিন লক্ষ মণ চাউল ক্রয় করিয়া উচ্চ মূল্যের বাজারে বিক্রয় করিবে বলিয়া গোলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। হয় তাহা হইতে কতক চাউল বিতরণার্থ কলিকাতা প্রেরণ কর, নতুবা তুমি নিশ্চয়ই পদচ্যুত হইবে।

মহম্মদ রেজা খাঁ জানিতেন যে বাপুদেব শাস্ত্রীকে নবাব আলিবর্দি খাঁ, নবাব কাশিমালি প্রভৃতি সকলেই সম্মান করিতেন। সুতরাং তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে এখন বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতা অবস্থান করিতেছেন; হয়তো কলিকাতার গবর্ণর কিম্বা কৌন্সিলের মেম্বরগণ ইহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বাপুদেব শাস্ত্রীর কথা না শুনিলে তিনি কলিকাতার গবর্ণরকে তাহাকে পদচ্যুত করিতে পরামর্শ দিবেন।

কাপুরুষ রেজা খাঁ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চাশ হাজার মণ চাউল কলিকাতা প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে মুর্শিদাবাদ হইতে দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকের প্রাণরক্ষার্থ কলিকাতা চাউল প্রেরিত হইবে।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর এবং কৌন্সিলের মেম্বরদিগের কি ঘৃণিত ব্যবহার? দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার নিমিত্ত যে চাউল কলিকাতা প্রেরিত হইল, তাহা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।* এই তো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মহাত্মাগণের খৃষ্টোচিত ব্যবহার! এ বিষয় বিলাতে প্রকাশ হইলে পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ অম্লানবদনে বলিয় উঠিলেন, 'বাঙ্গালি গোমস্তাদিগের দ্বারা এইরূপ কুকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।' কিন্তু ডিরেক্টরগণ জানিতে পারিলেন যে তাঁহাদের উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণই এই সকল কুকার্যে লিপ্ত ছিলেন। কেবল বাঙ্গালিদিগের মস্তকে দোষার্পণ করিয়া তাঁহারা অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

---

*Vide note (24) in the appendix.

তেত্রিশ
স্বর্গারোহণ

দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে তণ্ডুল প্রেরিত হইলে পর, বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রমদাদেবীর শারীরিক অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া দেখিলেন যে প্রমদার আর জীবনের আশা নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বাপুদেব শাস্ত্রী মুশিদাবাদ চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রমদার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বাপুদেবের অনুপস্থিতি কালে তিনি প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রমদা দেবীকে একবার করিয়া দেখিয়া যাইতেন। কোনো কোনো দিন দুইবারও দেখিতে আসিতেন।

বাপুদেবের কলিকাতা পৌঁছিবার পর দিবস প্রভাতে প্রমদা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। এখন তাঁহার কথা বলিবারও বড় সাধ্য নাই। শাস্ত্রী মহাশয়, মহারাজ নন্দকুমার, সাবিত্রী, রামা, সাবিত্রীর স্বামী ও ভ্রাতা এবং মদন দত্ত সকলেই বিষণ্ণ বদনে প্রমদার শয়ন প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট। কাহারো মুখে কথা নাই, সাবিত্রীর চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু পড়িতেছে।

প্রমদা দেবী কখনো সংজ্ঞাশূন্য হইয়া প্রলাপ বাক্য বলিতেছেন, কখনো আবার কিঞ্চি জ্ঞানের উদয় হইলেই পিতাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের দুঃখ কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা হইল প্রমদা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ণ নিদ্রা হইতেছে না। অনিদ্রা হইতেই তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। প্রায় চার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে তাঁহার বড় নিদ্রা হইত না। এই দুঃসহ চিন্তা নিবন্ধনই তাঁহার শরীর ক্ষয় এবং পরমায়ু শেষ হইয়াছে। দুই ঘণ্টার পর প্রমদা জাগ্রত হইয়া জলপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতা ঝিনুকে করিয়া তাঁহার মুখে কিছু কিছু জল দিলেন। জল পান করিয়া প্রমদা বলিতে লাগিলেন—

‘বাবা কত দিনে এ সংসারের লোকের এই দুঃখ কষ্ট নিবারণ হইবে? উঃ, হলধরের কন্যার কী কষ্টই হইয়াছিল!’

বাপুদেব বলিলেন, ‘বাছা, তুমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শরীর ক্ষয় করিয়াছ। কিছু দিনের জন্য এ চিন্তা পরিত্যাগ কর।’

প্রমদা। আমি শত চেষ্টা করিলেও আমার মন হইতে এসকল চিন্তা দূর হয় না। দিবানিশি এই সকল কথা আমার মনে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠে। বাবা, কতদিনে এ দুর্ভিক্ষ শেষ হইবে?

বাপুদেব। দুর্ভিক্ষ চিরকাল থাকিবে না। আগামী বৎসর ফসল হইলেই লোকের দুঃখ কষ্ট দূর হইবে।

প্রমদা। বাবা, পরমেশ্বর মঙ্গলময়। তাঁহার দয়া অসীম। তবে লোকের এই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া ঈশ্বর কিছুই করিলেন না কেন?

বাপুদেব। বাছা, তুমি আরোগ্য হইলে পর সময়ান্তরে সে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিব। ঈশ্বর সত্য সত্যই মঙ্গলময়। তাঁহার দয়া অসীম। কিন্তু এখন এ সকল বিষয় বলিবার সময় নহে।

প্রমদা। বাবা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি আমি আর আরোগ্য হইব না। আমাকে বোধ হয় আজ কালই এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাকে যাহা বলিতে হয়, এখনই বলুন।

বাপুদেব। বাছা! এই স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ সংসারে প্রত্যক লোককে স্বীয় কুকর্মের ফলভোগ করিতে হইতেছে। মানুষ স্বার্থপরতা পরিশূন্য না হইলে এবং আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলে পূর্ণ সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে না। মানুষ অপরের দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল আত্মসুখান্বেষণে রত থাকে। কিন্তু এই পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা চরমে কেবল দুঃখ কষ্টই ভোগ করে।

প্রমদা। বাবা, যে সকল লোকের বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই যেন কর্মফল ভোগ করিল, কিন্তু এই দুই এক বৎসরের শিশুদিগের কষ্ট যন্ত্রণা নিবারণের জন্য পরমেশ্বর কোনো কৌশল করিলেন না কেন? তাহারা তো কিছুই বুঝিতে পারে না।

প্রমদা পিতার মুখে এ প্রশ্নের উত্তর আর শ্রবণ করিতে পারিলেন না। তিনি অজ্ঞানাবস্থায় প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, ‘আহা! হলধরের নিরাশ্রয় বালক! ইহার পিতা মাতা কে ছিল জানেও না! উঃ, এস্থার বিবি—কি নির্মল আত্মা—অনাহারে—অনাহারে মরিয়া গেল। সাবিত্রি!’ আহা, এ দুঃখিনী কত কষ্ট পাইয়াছে। দাদা মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আনিবার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে আমার সমুদয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এস্থার বিবির পুত্র দুইটির ভরণ পোষণার্থ সে টাকা দিতে বলিবে—আহা, কত মৃতশব গঙ্গায় ভাসিতেছে—দাদা যদি টাকা দিতে হয় তবে এই সময়ই দিবেন—তাহা হইলে শত শত লোকের অন্ন মিলিবে।

এইরূপ অসংযুক্ত প্রলাপ বাক্য বলিতে বলিতে প্রমদা আবার নিস্তব্ধ হইলেন। ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার এখনও পার্শ্বে বসিয়া আছেন। প্রমদা দেবী নিস্তব্ধ হইলে পর,

তিনি বাপুদেব শাস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব! প্রমদাকে উপহার প্রদান করিব বলিয়া যে আভরণ ক্রয় করিয়া ছিলাম তাহা বোলাকি দাসের দোকান হইতে খোয়া গিয়াছিল। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল বোলাকি সেই অলঙ্কারের মূল্যের নিমিত্ত আমাকে ৪৮০২১ টাকার এক তমশুক লিখিয়া দিয়াছিল। আজ প্রায় এক বৎসর হইয়াছে বোলাকির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সে আমাকে তাহার বাড়িতে ডাকাইয়া নিয়া তাহার কোম্পানির খত (Company's bond) বিক্রয় করাইয়া আবার তমশুকের পাওনা টাকা নিতে বলিয়াছিল। পাঁচ ছয় মাস হইল সে টাকা আমি পাইয়াছি। আপনি সেই টাকা দ্বারা দুভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগকে অন্ন বিতরণ করিবেন। সে সমুদয় টাকাই প্রমদার। প্রমদা যে সদনুষ্ঠানে সে টাকা ব্যয় করিতে বলিতেছেন, সেইরূপ কার্যেই টাকা ব্যয় করিতে হইবে।'

এই বলিয়া মহারাজ নন্দকুমার গুরুচরণে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের অর্ধঘন্টা পরে প্রমদা দেবী আবার জাগ্রত হইয়া প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, 'অর্থ লোভে কি মানুষ মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারে? আহা, হলধরের কন্যা—আহা, কী লজ্জা! অর্থলোভীর কি লজ্জা নাই—উঃ, কী নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর! স্ত্রীলোককে এইরূপ কষ্ট প্রদান করে! হা পরমেশ্বর! নিরপরাধিনী হলধরের কন্যা। ও দুখিনীকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে স্থান প্রদান কর। এ সংসার বড় কষ্টকর স্থান—মা, আমাকে লইয়া যাও—বাবা বিদায় দেও।'

'বাবা বিদায় দেও'—এই বাক্যটি প্রমদার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র বাপুদেব শাস্ত্রী সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, 'মা, আমি তোমাকে বিদায় দিলাম। এ দুঃখ কষ্ট পরিপূর্ণ সংসারে তোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে—তুমি পরলোক গমন করিয়া তোমার জননী পরমাসাধ্বী ছিলেন। পুণ্যবতী ছিলেন। তাই তাঁহাকে তোমার এ কষ্ট দেখিতে হইল না।'

'জননী' কী মধুর শব্দ! এই দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ সংসারেও জননীর শ্রীচরণ—জননীর স্নেহভরা মুখকমল দেখিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে পুলকিত হয়? তাই জননী শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র প্রমদা সংজ্ঞালাভ করিলেন অনিমিষ নেত্রে পিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন—মুখকমলে যেন ঈষৎ হাসির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। বোধ হইল যেন জননীকে দেখিবেন বলিয়া মন আনন্দে পুলকিত হইয়াছে।

সংসারে প্রমদা দেবীর এই শেষ জাগ্রতাবস্থা। তাঁহার জীবন-বায়ু নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার চির নির্মল স্বর্গীয় আবস্থা স্বর্গ গমনোন্মুখ হইয়াছে।

প্রমদা দেবীর কখনো অধিক কথা বলিবার অভ্যাস ছিল না। সুতরাং মৃত্যুকালেও আর অধিক কথা বলিলেন না। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে মনে মনে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সময় সময় তাঁহার মুখ হইতে, 'দয়াময় ঈশ্বর', এই শব্দ বাহির হইতে ছিল। পরে একদৃষ্টে স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রমদা, কী দেখিতেছ?'

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'বিশ্বমাতাকে—জননীকে—প্রাণেশ্বরকে।'

তাঁহার পিতা আবার বলিলেন, 'প্রমদা, তবে আজই আমাকে ফেলিয়া চলিলে?'

কোনো উত্তর নাই।

বাপুদেব শাস্ত্রী আবার বলিলেন, 'প্রমদা! প্রমদা! তুমি ঊর্ধ্বদিকে কী দেখিতেছ?'

'জননী—প্রাণেশ্বর—সকলই সমজ্জুল।'

বাপুদেব। বাছা, আমাকে কত কাল আর এ সংসারে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে?

প্রমদা। (অতি অস্পুটস্বরে) সত্বরই পুনর্মিলন হইবে।

বাপুদেব। কবে, কোথায় আবার পুনর্মিলন হইবে।

প্রমদা। পিতার অমৃতময় ক্রোড়ে—অমৃত ধামে—স্বর্গে।

বাপুদেব একজন পরম জ্ঞানী ছিলেন। সংসারের শোক দুঃখে তিনি কখনো অভিভূত হইতেন না। কিন্তু সন্তানের শোক বোধ হয় কেহই সম্বরণ করিতে পারে না। কন্যার কথা শ্রবণ করিবার সময় তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

প্রমদা দেবী পিতার মুখের দিকে চাহিয়া হস্তোত্তলন করিবার চেষ্টা করিলেন। বোধ হইল যেন হাত উঠাইয়া পিতার অশ্রু মুছাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। কিন্তু হস্তোত্তলন করিবার আর শক্তি নাই।

তাঁহার পিতা তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। প্রমদার মুখকমল আবার প্রফুল্ল দেখা গেল। পিতার চরণোপরি হস্ত স্থাপন করিবামাত্র নয়নদ্বয় নিমলিত হইল। বোধ হইল, যেন নির্মল হৃদয়া পরদুঃখকাতরা পুণ্যবতী প্রমদা দেবী পিতার চরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সাবিত্রী, জগদম্বা, অহল্যা, রামা তাঁতি প্রভৃতি হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ইহাদের আর্তনাদ ও ক্রন্দনের শব্দে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। প্রমদা দেবীর মৃত্যুতে আজ যেন ইহারা সকলেই মাতৃহীন হইল।

চৌত্রিশ
শ্যামা এবং কৃষ্ণানন্দ বাবাজী

এই ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্গের সকল প্রদেশেই চাউলের মূল্য প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গ্রাম্য গরিব ভদ্রলোকদিগের অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে হইল।

রামদাস শিরোমণি সাবিত্রীকে একোদ্দিষ্টের মন্ত্র পড়াইয়া সমাজচ্যুত হইবার পর অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণীর এবং দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যার দুর্ভিক্ষের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। এখন তাঁহার সন্তানের মধ্যে কেবল বিধবা কন্যা শ্যামা এবং বার বৎসর বয়স্কা সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীই জীবিত আছেন।

শ্যামা কখনো পৈতা কাটিয়া পিতা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর আহারের সংস্থান করিতেন। কখনো কখনো বাড়ির নিকটস্থ একটি বালকের দ্বারা গৃহস্থিত উদ্যানজাত ফলমূল বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। ইহাতে যে দুই চারি পয়সা পাইতেন, তদ্দ্বারাই পিতা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীকে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে তাঁহার পিতার ব্রহ্মত্র জমির প্রজাগণ আর কিঞ্চিৎমাত্রও কর প্রদান করিত না।

শ্যামা নিজে একদিন অন্তরএকদিন আহার করিতেন। কিন্তু পিতা এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর কষ্ট নিবারণার্থ অহর্নিশ পরিশ্রম করিতেন। এ দুর্ভিক্ষের সময় শ্যামা শত চেষ্টা করিয়াও, শত কষ্ট সহ্য করিয়াও পিতাকে প্রত্যহ আহার প্রদান করিতে সমর্থ্য হইতেন না। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন তাহার পিতাকে উপবাস করিতে হইত। বৃদ্ধ শিরোমণি এই দুর্ভিক্ষের সময়ই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যামা কনিষ্ঠা ভগ্নীর সঙ্গে পিতার গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বয়ঃক্রম প্রায় তের বৎসর হইয়াছিল। কিরূপে তাহার বিবাহ দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শিরোমণি ঠাকুর সমাজচ্যুত হইয়া জাত-বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। জাত-বৈষ্ণবদিগের দলের মধ্যে শূদ্র, ব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক একসমাজভুক্ত হইয়া আহার ব্যবহার করেন। এই সকল জাত বৈষ্ণবদিগের চরিত্র যে বড় ভাল ছিল, তাহা নহে। কি জাত-বৈষ্ণব, কি আখড়ার বৈষ্ণব, ইহাদের মধ্যে সচ্চরিত্র ও ধার্মিক লোক প্রায় দেখা যায় না। শাক্ত সম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে গ্রাম্য দলাদলি নিবন্ধন যাহারা সমাজচ্যুত হইত, তাহারাই প্রায় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন শূদ্র, তাঁতি, সুবর্ণবণিক, তেলি, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা ব্রাহ্মণসদৃশ

উচ্চ পদ প্রাপ্তির আশায় কখনো কখনো বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক পদ, প্রভুত্ব লাভ করিবার চেষ্টা করিত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই সময়ে প্রকৃত ধর্মভাব পরিলক্ষিত হইত না, তাহারা কৃষ্ণলীলার ছলনা করিয়া নানাবিধ ব্যভিচারাদি কুকার্যে রত হইত। হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া, হিন্দু বিধবাগণ প্রায়ই বৈষ্ণবাশ্রমে প্রবেশপূর্বক আপন আপন কুপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিত। ইহারা ধর্মের নামে নানাবিধ অসদনুষ্ঠান করিয়া চৈতন্যের প্রচারিত বৈরাগ্য ধর্মকে একেবারে কলঙ্কিত করিতেছিল।

এই সকল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা বলিত, 'জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপনীদিগের সহিত যে সকল লীলাখেলা করিয়াছেন, প্রত্যেক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর তাহা অনুকরণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এইরূপে ধর্মের নামে সর্বপ্রকার কুকার্যই ইহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

শ্যামা বৈষ্ণবদিগের ঈদৃশ আচরণ অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। জাত-বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ কোনো লোকের নিকট আপন সহোদরাকে বিবাহ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কিরূপে একটি ভদ্র সন্তানের সহিত সহোদরার বিবাহ দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার পিতার শিষ্য নবকিশোর বৈষ্ণবদিগের আখড়া পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিতে স্বীকার করিলে, তাঁহার সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিবেন।

নবকিশোরকে শ্যামা অতি সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি যে বিনা অপরাধে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। নবকিশোরের প্রতি স্বীয় পিতার নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণ করিয়া শ্যামা মনে মনে বিশেষ কষ্টানুভব করিতেন। নবকিশোর যে বৈরনির্যাতনের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার পিতাকে পরে সমাজচ্যুত করাইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি তাহাকে বড় অপরাধী বলিয়া মনে করিতেন না। বস্তুত সহৃদয়া নারীদিগের হৃদয়স্থিত ন্যায়পরতার ভাব যে পুরুষাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় নারীজীবন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নারীহৃদয় স্বার্থপরতার আধার বলিয়া মনে হয়। সমুদয় সুসভ্য জাতির মধ্যেই নারীশিক্ষার অভাব রহিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার অভাব এবং সমাজ প্রচলিত কুশিক্ষা নারীজীবন এইরূপ ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছে।

নবকিশোর স্বীকার করিলে তাহার নিকট ভগ্নীকে বিবাহ দিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া শ্যামা এক দিবস নিজেই কৃষ্ণানন্দ বাবাজী নামধারী নবকিশোরের নিকট চলিলেন।

কৃষ্ণানন্দ বাবাজী এখনও সেই প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় বাস করিতেছেন। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্তও অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ব্যভিচার ইত্যাদি কুকার্যে রত হয়েন নাই।

জননীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটনা স্মরণ হইলেই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। মাতৃশোকে আজও তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এইরূপ শোকাকুলাবস্থায় মন কখনো কুকার্যের দিকে ধাবিত হয় না। শোক দুঃখই অনেক সময় মানুষকে কুকার্য হইতে বিরত রাখে। সুতরাং হৃদয়স্থিত শোক দুঃখ যে মানুষের প্রকৃত ধর্ম বন্ধ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণানন্দ বাবাজী গৃহে বসিয়া সর্বদাই ভগবদগীতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আজ অপরাহ্ণে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি যখন পাঠ করিতেছিলেন—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগত।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ।।

অকস্মাৎ এই সময়ে শ্যামা আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শিরোমণির টোলে অধ্যয়নকালে নবকিশোর শ্যামাকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় শ্রদ্ধা এবং সমাদর করিতেন। শ্যামাও তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

কৃষ্ণানন্দ নামধারী নবকিশোর শ্যামাকে স্বীয় কুটীর দ্বারে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি শিরোমণির সহিত যেরূপ শত্রুতা করিয়াছেন, তাহাতে শ্যামা হয়তো তাঁহার সহিত কখনো বাক্যালাপও করিবেন না; শ্যামা অন্য কাহাকেও তল্লাস করিতে আসিয়া অকস্মাৎ ভুলক্রমে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

কিন্তু শ্যামা তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, 'নবকিশোর, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমার পিতার সহিত তোমার শত্রুতা হইয়াছিল বলিয়া, আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিবে না।'

সহৃদয়া শ্যামা এইরূপ সরলতা পরিপূর্ণ বাক্যের প্রত্যেক শব্দ যেন নবকিশোরের হৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। তিনি শ্যামাকে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি একখানি কুশাসন আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। শিরোমণির সহিত যে শত্রুতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্যামাকে মুখ দেখাইতে তাঁহার মনে মনে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

শ্যামা কুশাসনের উপর বসিয়া আবার বলিলেন, 'নবকিশোর, আমি পূর্বেও তোমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতাম, এখনও তোমার প্রতি আমার সেই ভাবই রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাবার কী দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে তোমারও ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে, আর তিনি নিজেও এসংসারে না কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ নামধারী নবকিশোর বলিলেন, 'দিদি আপনি এবং আপনার জননী যে আমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্বেও শুনিয়াছি। আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া যে আপনার পিতাকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছি, তজ্জন্য সময়ে সময়ে আমার বড় অনুতাপ হয়; আপনাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জা হয়। বিশেষত আজ আপনাকে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া সেই অনুতাপানল আমার হৃদয়ে শত গুণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।'

শ্যামা। নবকিশোর, পূর্বের সকল কথা একেবারে ছাড়িয়া দেও। আমি তোমার নিকট একটি কথা বলিতে আসিয়াছি। কিন্তু তুমি পাছে কী মনে কর ভাবিতেছি।

নবকিশোর। আপনি যাহা বলিবেন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্যামা। তুমি এই বৈরাগীর আখড়া পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিবে?

নবকিশোর। দিদি! আমি কি আর সাধ করিয়া বৈরাগী হইয়াছি! গ্রাম্য লোকেরা অনর্থক আমাকে সমাজচ্যুত করিল। আর কোথাও থাকিবার স্থান নাই। তাই দায়ে ঠেকিয়াই বৈরাগী হইয়াছি। আমি আর এখন কিরূপেই বা গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বন করিব? ভদ্র সমাজ কি আমাকে আর গ্রহণ করিবে?

শ্যামা। এই দেশ হইতে স্থানান্তরে যাইয়া কোনো ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিয়া কি ভদ্র সমাজভুক্ত হইতে পারিবে না?

নবকিশোর। তাহা হইলে অনেক প্রবঞ্চনা করিতে হয়। বিশেষত আমার মাতার মৃত্যুর বিষয় যখন মনে হয় তখন আর এ সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না! আমি সর্বদাই মৃত্যু কামনা করি। আত্মহত্যা শাস্ত্রে গুরুতর পাপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, নহিলে এতদিনে আত্মহত্যা করিয়া সকল কষ্ট দূর করিতাম।

শ্যামা। তবে চিরকালই কি এই বৈরাগীর আখড়ায় থাকিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ?

নবকিশোর। দিদি! বৈরাগীর আখড়া নরকের আদর্শ স্বরূপ। শূদ্র, ধোপা, নাপিত চাঁড়াল, সুবর্ণ বণিক, ব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যাহারা নিতান্ত কুচরিত্র, তাহারা হয় সমাজচ্যুত হইয়া, না হয় সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, বৈরাগীর আখড়ায় আসিয়া প্রবেশ করে। আবার ইহাদিগের অনেকেই এক একটি কুচরিত্রা স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া বৈরাগী হইতেছে। এইরূপ লোকের সংসর্গে কি কোনো ভদ্রলোক থাকিতে পারে?

শ্যামা। তবে এই বৈরাগীর আখড়া পরিত্যাগ কর না কেন?

নবকিশোর। বৈরাগীর আখড়া পরিত্যাগ করিব বলিয়া আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি। এই কয়েক বৎসর ভিক্ষা করিয়া আমি কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। আর কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইলেই কাশীধামে চলিয়া যাইব। এই আখড়ার এই সকল কুচরিত্র বৈরাগীর সঙ্গে আমি কখনো কোনো সংস্রব রাখি না। ইহাদিগের লীলাখেলার মধ্যে আমি কখনো প্রবেশ করি না।

শ্যামা। তবে গার্হস্থ্যধর্ম আর তুমি অবলম্বন করিবে না?

নবকিশোর। গার্হস্থ্যধর্ম তো আর কিছুই নহে; দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থের ন্যায় জীবন যাপন করিলেই গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করা হয়। কিন্তু আমার নিকট তো কোনো ভদ্রলোক কন্যাদান করিবে না। আমার দারপরিগ্রহ করিতে হইলে একটি বৈষ্ণবীকেই স্ত্রীস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা আমি কখনো করিতে ইচ্ছা করি না।

শ্যামা। যদি কোনো ভদ্রলোক তোমার নিকট কন্যাদান করে তবে গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিবে?

নবকিশোর। আমার নিকট কোনো ভদ্রলোক এখন আর কন্যাদান করিতে আসিবে না।

শ্যামা। যদি করে?

নবকিশোর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) দিদি, আপনাকে আমি নিতান্ত সরলা এবং অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবা বলিয়া জানিতাম। আপনি যে এত কথা বলিতে জানে না তাহা তো আমি জানিতাম না। যখন আমি আপনার পিতার টোলে অধ্যয়ন করিতাম, তখন তো আপনার মুখের একটি কথাও শুনি নাই। আপনার কথার ভাবে বোধ হয় যে আপনার কোন অভিপ্রায় আছে। আপনি যেন কোনো ঘট্‌কালি করিতে আসিয়াছেন?

শ্যামা। আমি ঘট্‌কালি করিতেই আসিয়াছি। ভদ্রলোকের কন্যা জুটিলে তুমি বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি না, তাই জানিতে চাই।

নবকিশোর এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, 'বিবাহ করিয়া কি আমি এ সংসারে সুখী হইতে পারিব? আমার জননীর মৃত্যু ঘটনা কি আপনার মনে হয় না?'

শ্যামা। আমার বোধ হয় তুমি গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করিলে সুখী হইবে।

নবকিশোর। আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলুন। তাহা হইলে যাহা হয় আমি পরে বলিব।

এই কথা শুনিয়া শ্যামা বলিতে লাগিলেন, 'আমার পিতাও সমাজচ্যুত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন আমরা জাত-বৈষ্ণবের দলভুক্ত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু আখড়ার বৈষ্ণবদিগের ন্যায় জাত বৈষ্ণবের দলস্থ লোকেরাও প্রায়ই অসচ্চরিত্র। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বয়স এখন তের বৎসর হইয়াছে। জাত বৈষ্ণবের দলস্থ কোনো লোকের নিকট তাহাকে বিবাহ দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তুমি আমাদের সম শ্রেণীস্ত ব্রাহ্মণ। তুমি বিনা অপরাধে যে সমাজচ্যুত হইয়াছ তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। বিশেষত তুমি শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত। তুমি যদি তাহাকে বিবাহ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া সংসার ধর্মাবলম্বন কর, তবে তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিতে আমি সম্মত আছি।'

নবকিশোর শ্যামার এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইল। শ্যামার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। অনেকক্ষণ আবার মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামার প্রস্তাবে সম্মত হইল। কয়েক দিন পরে নবকিশোর প্রেমদাস বাবাজীর আখড়া পরিত্যাগ পূর্বক শিরোমণির বাড়িতে আসিয়া শ্যামার সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিল।

কিন্তু গ্রামস্থ বৈরাগিগণ এবং অন্যান্য গ্রাম্য লোকেরা বলিয়া উঠিল, 'শ্যামাকে বৈষ্ণবী করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণানন্দ বাবাজী শিরোমণি ঠাকুরের বাড়িতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।'

নবকিশোর গ্রাম্যলোকদিগের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিল। গ্রামে আর বাস করিবে না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কল্প হইল। পরে শ্যামার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কলিকাতা যাইয়া তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সেখানেই বাস করিবেন। কিন্তু ইহাদিগের কলিকাতা রওনা হইবার দুই চারি দিন পূর্বে নবকিশোরের ভগ্নীপতী শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল। শিবদাসের স্ত্রী এবং তাঁহার অবিবাহিতা তিনটি কন্যা একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। শিবদাসের যে ঋণ ছিল তাহা তাঁহার সমুদয় বাড়ি ঘর বিক্রয় করিলেও পরিশোধ হয় না। সুতরাং শিবদাসের স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর নবকিশোরের নিকট আসিলেন।

নবকিশোর ভগ্নীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার গৃহেই থাকিবেন। আমি যেরূপে পারি আপনাকে ভরণপোষণ করিব।'

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পূর্বে তিনি সর্বদাই প্রলাপ বকিতেন। কিন্তু সে প্রলাপ বাক্য বলিবার সময় আর কিছুই বলিতেন না কেবল 'রাইমণি' 'রাইমণি' বলিয়া চিৎকার করিতেন। কখনো কখনো বলিলেন, 'ঐ রাইমণি আমাকে প্রহার করিতে আসিয়াছে। ঐ রাইমণি আমাকে মারিতে আসিয়াছে।'

কবিরাজগণ বলিতেন যে জ্বর বিকার নিবন্ধনই এইরূপ প্রলাপ বকিতেছে। কিন্তু ইহার কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল কিনা, কেহই জানিত না।

অত্যল্পকাল মধ্যে নবকিশোর, শ্যামা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী ইন্দুমতী এবং তাঁহার বিধবা ভগ্নী এবং ভাগিনীত্রয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এখানে আসিয়া তিনি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিলেন।

এখন নবকিশোরকে পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ করিতে হয়। অর্থ উপার্জনার্থ নবকিশোর কলিকাতাস্থ দুই তিনজন ইংরাজকে দেশীয় ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় ষাট সত্তর টাকা মাসিক আয় হইত।

কলিকাতার বর্তমান অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকের পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ গ্রাম্য লোকদিগের কর্তৃক নবকিশোরের ন্যায় এইরূপ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতা আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যাক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পঁয়ত্রিশ
ওয়ারেন হেষ্টিংস

১৭৬৯ সালের দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইল। ইহাদিগের মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই অধিক ছিল। দেশ প্রায় কৃষক শূন্য হইল। দুর্ভিক্ষের পর কৃষকাভাবে অনেকানেক প্রদেশের অধিকাংশ জমি পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

এখন আর রাজস্ব আদায় হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যেরও অনেক অসুবিধা হইল। ইংলণ্ডে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পৌঁছিল। কোম্পানির অর্থলোলুপ কর্মচারিগণ দেশের অবস্থা আর গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না।

ইংলণ্ডবাসী সহৃদয় ইংরাজগণ মধ্যে মেস্তর ডাণ্ডাস্ (Mr. Dandas) এবং কর্ণেল বারগয়েন (Colonel Burgoyne) কোম্পানির কর্মচারিদিগের অসদাচরণ এবং অত্যাচারের বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ কমিটি নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিলেন।

কমিটি নিযুক্ত হইলে পর ক্লাইব, বান্সিটার্ট, বেরেলষ্ট এবং কার্টিয়ার সমুদয় গবর্ণর এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগের অসদাচরণ এবং কুক্রিয়া সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ক্লাইবের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অভিযোগ আর কেহ উপস্থিত করিল না। এদিকে তিনি আত্মহত্যা করিয়া নিজেই স্বীয় কুকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ পার্লিয়ামেণ্টের তিরস্কার এড়াইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদিগের কার্যকলাপ পরিদর্শনার্থ কয়েকজন সচ্চরিত্র লোক প্রেরণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

জগদ্বিখ্যাত সদ্বক্তা মহাত্মা এড্‌মাণ্ড বাক্ সাহেবকে এই পরিদর্শন কার্যের কমিটির সভাপতির পদে মনোনীত করিলেন।

কিন্তু বঙ্গ কুলাঙ্গারদিগের পাপের ফল বোধ হয় তখন পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই। তাহাদের অদৃষ্টে আরও দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ লিখিত ছিল। সুতরাং মহাত্মা এড্‌মাণ্ড বার্কের ন্যায় উদারচেতা, সহৃদয় লোক ভারতে আসিতে সম্মত হইলেন না।

ভাতরবর্ষ দীর্ঘকাল হইতে নরপিশাচের আবাস হইয়া রহিয়াছে, এড্‌মাণ্ড বার্কের ন্যায় মহাত্মা এ নরকতুল্য দেশে কেনই বা আসিবেন! তিনি ভারতবর্ষে আসিতে অস্বীকার করিলেন। ডিরেক্টরগণ অবশেষে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭১ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া তৎপর ফেব্রুয়ারি মাসে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

হেষ্টিংস ইতিপূর্বে ১৭৫০ সালে অতি অল্প বেতনে কোম্পানির কেরাণীর কার্যে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৫৩ সালে তিনি কাশিমবাজারের ফেক্টরীর আসিষ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় হইতেই নন্দকুমরের সহিত ইঁহার শত্রুতা হইয়াছিল। ইনিই ১৭৫৩ সালের প্রারম্ভে ছিদাম বিশ্বাসকে রেশমের কুঠির প্যাদার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস অত্যন্ত ক্ষীণকায় এবং খর্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন। ইঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং চতুরতা ইঁহার প্রত্যেক কার্যেই পরিলক্ষিত হইত। এই সময় প্রায় সমুদয় ইংরাজই ক্লাইবের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

কাশিমবাজারে অবস্থান কালেই হেষ্টিংস সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল বঙ্গদেশে ছিলেন। সেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইনি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৭৬৪ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কোর্ট অব ডিরেক্টর ইহার কার্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং আবার ১৭৬৯ সালে হেষ্টিংস সাহেবকে মাদ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় মেম্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিনে। মাদ্রাজে আসিয়া ইনি আবার বিশেষ কার্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিলেন; এবং সেই নিমিত্তই ডিরেক্টরগণ ১৭৭১ সালে ইঁহাকে বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই দ্বিতীয় বার হেষ্টিংস সাহেব বড় শুভক্ষণে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এবার সকল বিষয়েই তাঁহার উদ্যম সফল হইতে লাগিল।

প্রথমত জাহাজে আরোহণ করিয়াই অতি সুকৌশলে একটি রমণীরত্ন লাভ করিলেন। হেষ্টিংস যে জাহাজে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন, সেই জাহাজের যাত্রিদিগের মধ্যে বেরন ইন্‌হফ নামক একটি জর্মন ভদ্রলোক এবং তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন। হেষ্টিংস কলে কৌশলে বেরন ইন্‌হফের পত্নীকে হস্তগত করিলেন।

হেষ্টিংস কোনো কার্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। তিনি যাহা কিছু করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা অতি সুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। জাহাজের মধ্যে অবস্থান কালেই একদিন বেরন ইন্‌হফকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! এ সংসারে ভার্যাভার বড়ই কষ্টকর; এবং এই দুচ্ছেদ্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে কাহারও সুখ শান্তি থাকে না। অতএব আপনার ইচ্ছা হইলে আমি আপনাকে এই গুরুভার এবং দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারি।'

বেরন ইন্‌হফ পূর্বেই বুঝিয়া ছিলেন যে, হেষ্টিংস সুকৌশলে তাঁহার স্ত্রীকে হস্তগত করিয়াছেন। সুতরাং হেষ্টিংসের সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হেষ্টিংস তাঁহাকে স্ত্রী পরিত্যাগের মোকদ্দমার সমুদয় খরচ পত্র দিতে সম্মত হইলেন এবং স্ত্রীর মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথোপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন। হেষ্টিংস বিশেষ সৎলোক। ইন্‌হফকে উপযুক্ত মূল্যই প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সাব্যস্ত হইলে পর, হেষ্টিংসের ব্যয়ে বেরন ইন্‌হফ জর্মণীর অন্তর্গত ফ্রাঙ্কোনিয়া প্রদেশের বিচারাদালতে স্ত্রী পরিত্যাগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। কিন্তু প্রায় সম্বৎসর অতিবাহিত হইল, ইন্‌হফের উদ্বাহ শৃঙ্খল ভঙ্গের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল না। হেষ্টিংসের সঙ্গে ইন্‌হফের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে; কিন্তু এখন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্বে আদান-প্রদান হইতে পারে না। সুতরাং ইন্‌হফকে স্ত্রী স্কন্ধে করিয়া হেষ্টিংসের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইল।

হেষ্টিংস সাহেব প্রথমত মাদ্রাজে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বেরন ইন্‌হফও সস্ত্রীক মাদ্রাজেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর ১৭৭১ সালে হেষ্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন; ইন্‌হফকেও স্ত্রী সঙ্গে করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙেগ কলিকাতা গমন করিতে হইল। কিছুকাল পরে হেষ্টিংসের সহিত বেরনেস্ ইন্‌সফের বিবাহ হইল।

বঙ্গদেশে হেষ্টিংস অনেকের নিকটই পরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্বে অন্যূন পনের বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন। সুতরাং হেষ্টিংসের আগমনে মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকেই যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের দেওয়ানি প্রাপ্তির আশা একেবারেই নিঃশেষিত হইল।

পক্ষান্তরে মহারাজ নন্দকুমার দেওয়ানি প্রাপ্তির আশায় এতদূর প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, এ আশা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে নিবারিত হইত না।

মানুষ যখন কোনো বিষয় লাভ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত লালায়িত হয়, কোনো বিষয়ের নিমিত্ত যখন একেবারে প্রমত্ত হইয়া পড়ে, তখন সে বিষয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইলেও সে তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ নন্দকুমারের সেই অবস্থাই হইয়াছিল। নহিলে সমুদয় ইংরাজ তাঁহার শত্রু, কিন্তু ইহাতেও তিনি মনে মনে আশা করিতেছেন যে, ইংরাজের সাহায্যে দেওয়ানি লাভ করিয়া ক্রমে মুসলমানের রাজত্ব লোপ করিবেন; এবং তৎপর চক্রান্ত করিয়া ইংরাজদিগকেও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

হেষ্টিংস কলিকাতা পৌঁছিলে নন্দকুমার পূর্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবঞ্চনা, প্রতারণামূলক ব্যবহারে যে হেষ্টিংস তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

ছত্রিশ
মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের বিচার

মহারাজ নন্দকুমার মহমমদ রেজা খাঁর কুক্রিয়া এবং অসদাচরণ কোর্ট অব ডিরেক্টরের কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্বেই ইংলণ্ডে একজন এজেন্ট (agent) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এদিকে দুর্ভিক্ষের পর রাজস্ব আদায়ের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। কোর্ট অব ডিরেক্টর নন্দকুমারের নিয়োজিত এজেণ্টের প্রমুখাৎ রেজা খাঁর অসদাচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যে সত্য সত্যই রেজা খাঁ রাজস্ব আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতেছে। রাজস্বের কতকাংশ তিনি যে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বিশেষত দুর্ভিক্ষের সময় যে তিনি কলকাতাস্থ ইংরাজদিগের ন্যায় অনেক চাউল ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে গোলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছিল।

হেষ্টিংস সাহেব মুখে মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি বন্ধুভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, কোনো প্রকারে রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে স্বয়ং রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিবেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে নন্দকুমারের এজেন্ট যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত কোর্ট অব ডিরেক্টর হেষ্টিংসকে আদেশ করিলেন কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিতে লিখিলেন।

অকস্মাৎ হেষ্টিংসের নিকট ডিরেক্টরদিগের এই আদেশ পৌঁছিল। তিনি কৌন্সিলের অন্য কোনো মেম্বরকে এই হুকুমের বিষয় জ্ঞাপন করিবার পূর্বেই মহম্মদ রেজা খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডল্‌টন সাহেবের নিকট লিখিলেন।

* * * *

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। রমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মহম্মদ রেজা খাঁ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন। দুইজন মুসলমান মহিলা তাঁহার পদতলে বসিয়া চরণ সেবা করিতেছে, আর দুইজন স্ত্রীলোক শয্যার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তালবৃন্ত হস্তে করিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। শয়ন প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থিত গৃহে তিন চারি জন স্ত্রীলোক

জাগিয়া রহিয়াছে। নবাব জাগ্রত হইলেই ইহাদিগকে আলবোলা হস্তে করিয়া নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে হয়।

হঠাৎ বাহির মহলে বহুলোকের পদসঞ্চারের শব্দ শুনা গেল। দেখিতে না দেখিতে রাজপ্রাসাদ বহুসংখ্যক সিপাহী এবং অগণ্য সৈনিক পুরুষে পরিপূর্ণ হইল। রণবংশীর (bugle) ধ্বনিতে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দলে দলে খোজাগণ অন্দর মহলে প্রবেশ পূর্বক মহম্মদ রেজা খাঁকে এই বিষয় অবগত করিল।

মহম্মদ রেজা খাঁ অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া দেখেন যে স্বীয় রাজপ্রাসাদ অগণ্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত। তিনি তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে কঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, 'আয়ে খোদা, মেরি তক্‌দীর্ মে যো লিখা হায় উই হোয়ে—তেরা যো কুচ মতলব হায় ছব তামিল হো চুকে—কিছ্ মত্ মে যো কুচ্ লিখা হায় এলাহি! ছিতাব হো—'

অর্থলোভী কাপুরুষদিগের স্বাভাবিক ভীরুতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের এক প্রকার নির্ভরের এবং ভক্তির ভাব থাকে। ইহারা বিপদে পড়িলেই ঈশ্বরকে সাহায্য করিতে ডাকে; এবং সংসারের ধন সম্পত্তি, পদ প্রভুত্ব লাভ করিবার নিমিত্তই কেবল ঈশ্বরের শরণাগত হয়। কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তির ভাব ইহাদের জীবনে কখনো পরিলক্ষিত হয় না। নিঃস্বার্থ ভাবে ইহারা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে জানে না। ইহাদিগের নিকট ঈশ্বর কেবল অসীম শক্তির আধার। কিন্তু ঈশ্বর যে পরম ন্যায়বান এবং প্রেমময় তাহা ইহারা বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তই সংসারের অনেকানেক ধার্মিক বলিয়া পরিচিত লোকের কার্যকলাপের মধ্যে ঘোর স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়। নিঃস্বার্থ প্রেমের ভিত্তির উপর ইহাদিগের ধর্ম বিশ্বাস সংস্থাপিত নহে। ভীরুতাই ইহাদিগের ধর্মবিশ্বাসের মূল কারণ।

রেজা খাঁর ধর্ম বিশ্বাসের মূল কারণ তাঁহার স্বাভাবিক ভীরুতা। সুতরাং আসন্ন বিপদ দেখিয়া একেবারে ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া পড়িলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ নির্ভর স্থাপন করিয়া বাহির বাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাহির মহলে মিডলটন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র, তিনি শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার নিকট সকল কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দীস্বরূপ কলিকাতা প্রেরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাটনা হইতে সিতাব রায়ও বন্দীস্বরূপ কলিকাতা প্রেরিত হইলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে মহারাজ নন্দকুমারের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। সিতাব রায়ের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট মহারাজ নন্দকুমারকে একখানি পালকি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাটনা পর্যন্ত সেই পালকি পৌছিলে সিতাব রায় তাহা আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতেই নন্দুকমারের সহিত সিতাব রায়ের মনোবিবাদ হয়।

নন্দকুমার এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর দোষ সপ্রমাণ হইলেই তিনি নায়েব সুবাদারের পদ লাভ করিবেন। এই আশায় তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে প্রাণপণে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস সাহেব এক বৎসরের মধ্যেও রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের অপরাধের তদন্ত শেষ করিলেন না। প্রায় চৌদ্দ মাস যাবত ইহাদিগকে কয়েদীস্বরূপ কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইল। হেষ্টিংস এই চৌদ্দ মাস যাবত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, রাজস্ব আদায়ের কার্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদিগের দ্বারা চালাইতে পরিবেন কি না। বিশেষত কোন মোকদ্দমা দীর্ঘকাল দায়ের থাকিলে দশ টাকা অধিক আয় হইবার সম্ভব।

চৌদ্দ মাস পরে মহম্মদ রেজা খাঁর অপরাধ উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। সিতাব রায় একেবারে নির্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। হেষ্টিংস নায়েব সুবাদারের পদ একেবারে উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে নিজ হস্তে আনিলেন। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের চাতুরিতে পড়িয়া একেবারে প্রতারিত হইলেন। তাঁহার দেওয়ানি প্রাপ্তির আশা সমুলে উৎপাটিত হইল। কিন্তু হেষ্টিংস নন্দকুমারকে ভয় করিতেন। পাছে নন্দকুমার তাঁহার সমুদয় উৎকোচ গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন, সেই আশঙ্কায় নন্দকুমারের পুত্র মহারাজ গুরুদাসকে নবাবের গৃহকার্যের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিলেন।

নবাবের অভিভাবক নিযুক্তি সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেব বড় সঙ্কটে পড়িলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর একজন সৎলোক নবাবের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিতে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ভাল লোক এই পদে নিযুক্ত করিলে উৎকোচ গ্রহণের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কোনো স্ত্রীলোককে এই পদে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরের পত্রে একজন পুরুষ নিযুক্ত করিবার আদেশ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া এইপদে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিবার উপায় নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হেষ্টিংস নবাবের বিমাতা মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবক এবং রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট লিখিলেন, 'আপনাদের পত্রের অভিপ্রায় অনুসারেই নবাবের রক্ষক এবং অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়াছে। আপনারা সৎলোক নিযুক্ত করিতে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে সৎলোক বড় দুষ্প্রাপ্য। এই দেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এই মাত্র বিভিন্নতা দেখিতে পাই যে, পুরুষেরা প্রকাশ্য ভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়ায়, আর স্ত্রীলোক অবরুদ্ধাবস্থায় থাকে। এই ভিন্ন বঙ্গদেশে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অন্য কোনো বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মণিবেগম নবাবের অন্দরভুক্ত হইবার পূর্বে বরাবর প্রকাশ্য ভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেন। সুতরাং তিনি যে পুরুষ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তিনি নবাবের বেগম হইবার পর আবার সৎ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ভিন্ন বঙ্গদেশে আর সৎপুরুষ নাই। আমি এই নিমিত তাঁহাকেই সৎপুরুষ মনে করিয়া নবাবের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিলাম।'

মনি বেগম বিশুবেগ নামক এক ব্যক্তির দলের একজন নর্তকী ছিলেন। পরে

সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পড়িলেন। মীরজাফর তাঁহাকে অন্দরভুক্ত করিলেন। তিনি পর্দানিশী হইবার পূর্বে প্রকাশ্য ভাবে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং হেষ্টিংস সাহেবের অভিধানানুসারে তিনি তখন পুরুষ ছিলেন; নবাবের অন্দরভুক্ত হইয়া আবার সৎ হইয়াছেন। সুতরাং মণিবেগম নিশ্চয়ই সৎপুরুষ ছিলেন।

মণিবেগমকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া হেষ্টিংস এবং মিডণ্টন প্রভৃতি সকলেই কিছু কিছু লাভ করিলেন।

রেজা খাঁ একেবারে পদচ্যুত হইয়া রহিলেন। তাঁহার নায়েব সুবাদার হইবার পূর্বে ঢাকাতে তাঁহার যে পদ ছিল, সে পদেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল না। সিতাব রায় নির্দোষী সাব্যস্ত হইবার পর আর অপমান সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। অনতিবিলম্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

সাইত্রিশ

নব কৌন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট

মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর ১৭৭৩ সালেই প্রথমত ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেন্টের ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গের মেয়র কোর্টের অবিচার নিবারার্থ তাঁহারা কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপন করিয়া ইলাইজা ইম্পিকে প্রধান জজের পদে এবং চেম্বারস্, হাইড, লিমেইষ্টার সাহেব ত্রয়কে পিউনি জজের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে শাসনকার্য নির্বাহার্থ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গবর্ণর জেনেরলের পদে, আর রিচার্ড বারওয়েল, জেনারেল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন এবং ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এই চারিজনকে কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ পর্যন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে ছিলেন। কৌন্সিলের অপর তের জন মেম্বর তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করিতেন না। কিন্তু এখন তিন জন উদারচেতা, স্বাধীন লোক কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। পূর্বে গবর্ণর হেস্টংস এবং অপর তেরজন মেম্বর কর্তৃক কৌন্সিল গংিত হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণ তৎপরিবর্তে হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারল এং সভাপতি, আর অপর চারিজন মাত্র কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। কৌন্সিলের অপর চারিজন মেম্বর মধ্যে রিচার্ড বারওয়েল সাহেব পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। উৎকোচ গ্রহণ, অত্যাচার এবং অসদাচরণে ইনি বোল্টস সাহেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, উইলিয়ম বোল্টস্ সাহেব মুর্শিদাবাদ প্রদেশের তন্তুবায় ও অপরাপর দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীর রক্ত শোষণ করিয়া অন্যূন বিরানব্বই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রিচার্ড বারওয়েও ঢাকার তন্তুবায় এবং লবণ ব্যবসায়িদিগের সর্বস্বান্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঢাকার তন্তুবায়গণ একবার ইঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতা কৌন্সলে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আসিলে, ইনি তাহাদিগকে ধৃত করিয়া বন্দিস্বরূপ সঙ্গে দিয়া ঢাকায় পুনঃপ্রেরণ করিলেন। তাহার পর তাহারা আর দুইবার ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই।*

---

* Vide note (20) in the appendix.

কৌন্সিলের অপর তিন জন মেম্বর পূর্বে কখনো ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তাঁহারা তিন জন সত্য সত্যিই ভদ্রবংশজাত এবং হৃদয়বান ছিলেন। ভারতবাসী অন্যান্য সমুদয় ইংরাজের কার্যকলাপের মধ্যেই নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু এই নবাগত কৌন্সিলের মেম্বরত্রয়ের (জেনেরল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্‌সিসের)— আচরণের মধ্যে প্রবঞ্চনা কি নীচাশয়তা কখনো পরিলক্ষিত হয় নাই। উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা কখনো স্বীয় স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করেন না। ইঁহারা হেষ্টিংস প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উৎকোচগ্রাহী রিচার্ড বারওয়েল হেষ্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। নব কৌন্সিলের মধ্যে দুই পক্ষ হইল। জেনেরল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন এবং ফ্রান্সিস্ ফিলিপ ইংরাজবণিকদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ যত্ন করিতেন, পক্ষান্তরে হেষ্টিংস এবং বারওয়েল যাহাতে অধিক অর্থ লাভ হয় তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন।

ক্লাইব ইতিপূর্বে যে লবণের একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কোর্ট অব ডিরেক্টর কয়েক বৎসর পরে তাহা একেবারে রহিত করলেন। কিন্তু ১৭৭২ সনে হেষ্টিংস সাহেব আবার রূপান্তরে সেই একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিলেন। ক্লাইবের সংস্থাপিত নিয়মানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ কর্তৃক যে বণিকসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই বণিকসভাই লবণের বাণিজ্যের মূলধনী ছিল। হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মূলধনী করিয়া বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে লবণ মহালের ইজারাদারদিগকে কোম্পানির নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইত। পরে তাহাদিগকে সমুদয় লবণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতে হইত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ কখনো এই বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পরিবেন না বলিয়া নির্ধারিত হইল। কিন্তু রিচার্ড বারওয়েল সাহেব কোনো কোনো বাঙ্গালির বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা লইতেন এবং হেষ্টিংস সাহেবের প্রিয় বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার, কামালদ্দিন প্রভৃতি কয়েকজন ধূর্ত লোকের বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা লইতে লাগিল।

পূর্বের ন্যায় এবারও এই লবণের বাণিজ্য উপলক্ষে দেশীয় লোকদিগকে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হইল। এদিকে আবার বারওয়েল সাহেব বাঙ্গালিদিগের বেনামীতে যে সকল লবণের মহাল ইজারা লইতেন, সেই সকল মহাল আবার দেশীয় লোকদিগের নিকট তাহার বেনামী ইজারাদারগণকে ইজারা দিতে হইত। বারওয়েল সাহেবের নিকট হইতে এইরূপে যাহারা মহাল ইজারা লইত, তাহাদিগের কোম্পানির প্রদত্ত টাকার কতকাংশ বারওয়েল সাহেব নিজে আত্মস্মাৎ করিতেন।* কেবল যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার অধীনস্থ ইজারাদারগণকে দিতেন।

* Vide note (26) in the appendix.

নবাগত কৌন্সিলের মেম্বর জেনেরল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্‌সিস, হেষ্টিংস এবং বারওয়েলের এই সকল অসদাচরণের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে পর, হেষ্টিংস তৎকাল প্রচলিত রাজনৈতিক কৌশলে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি অতি সুকৌশলে নবাগত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক চতুষ্টয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌজন্য সংস্থাপন করিলেন। এই বিচারকগণ হেষ্টিংসের প্রভুত্ব যাহাতে সংরক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে সর্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই বিচারকদিগের আচরণ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ইঁহারাও হেষ্টিংস এবং বারওয়েলের সমশ্রেণীর লোকই ছিলেন।

* * * *

মহারাজ নন্দকুমারের নায়েব সুবাদারি প্রাপ্তির আশা সমুলে উৎপাটিত হইলে পর, তাঁহার হৃদয়ে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংসের অত্যাচার এবং অবৈধাচরণ সকল প্রকাশ করিবেন বলিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন।

আটত্রিশ
অভিযোগ

হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের অত্যাচার নিবারণের উপায় অবধারণ করিবার অভিপ্রায়ে, মহারাজ নন্দকুমারের কলিকাতাস্থ ভবনে রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ঢাকা, দিনাজপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জমিদারগণ সর্বদাই একত্রে সমবেত হইতেন। ইহাদিগের অনেকের উপরই হেষ্টিংস এবং বারওয়েল রাজস্ব আদায়ের ছলনা করিয়া সময় সময় অত্যাচার করিতেন। ভূমিতে জমিদারদিগের কোনো স্বত্ব আছে বলিয়া হেষ্টিংস এবং বারওয়েল কখনো স্বীকার করিতে না। তাঁহারা বলিতেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কোম্পানি ইচ্ছা করিলে জমিদারদিগকে তাহাদের জমিদারি হইতে উৎখাত করিতে পারেন। কিন্তু ফিলিপ ফ্রান্সিস এইরূপ মত পোষণ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে ভূমিতে জমিদারদিগের সীমাবদ্ধ স্বত্ব রহিয়াছে। এবং মুসলমান রাজগণ কর্তৃক তাহাদর সেই সীমাবদ্ধ অধিকার (limited right) স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং বিনা অপরাধে জমিদারদিগকে তাহাদের জমিদারী হইতে উৎখাত করিতে কোম্পানির কোনো অধিকার নাই।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারীস্বত্ব রাণী ভবানীর ছিল। হেষ্টিংস সাহেব রাণী ভবানীকে বিনা অপরাধে বাহিরবন্দ পরগণা হইতে উৎখাত করিয়া কান্ত পোদ্দারকে এই পরগণার জমিদারী প্রদান করিলেন। কান্ত পোদ্দারের নাবালক পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে এই পরগণা বন্দোবস্ত করা হইল। কান্ত পোদ্দার হেষ্টিংসের বেনিয়ান ছিল। সে হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের উৎকোচ গ্রহণের সহায়তা করিত। সুতরাং হেষ্টিংস তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারীপ্রদান করিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের গৃহে যে জমিদারগণ হেষ্টিংসের অত্যাচার নিবারণার্থ সর্বদাই সমবেত হইতে লাগিলেন, তাহা অল্পকাল মধ্যেই হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইল। সুতরাং তিনিও স্বীয় সহচর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার, নবকৃষ্ণ মুন্সী প্রভৃতির সহিত নন্দকুমারের বিনাশের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত হইলে সাক্ষীর অভাব না হয়। কিম্বা হেষ্টিংস এবং বারওয়েলকে নন্দকুমারের নামে কোনো মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে

হইলে, তাহার ফরিয়াদি ও সাক্ষী সহজে পাওয়া যাইতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে কান্ত পোদ্দার, মোহনপ্রসাদ এবং মুন্সী সদরদ্দি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান ধূর্ত লোককে হস্তগত করিয়া রাখিল।

১৭৭৫ সালের ১১ মার্চ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার ওয়ারেন হেষ্টিংসের কুকার্য সকল বিবৃত করিয়া কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ সাহেবের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। এই আবেদন পত্রে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অনেকানেক কথা লিখিত ছিল। কিন্তু এই স্থানে সেই আবেদন পত্রের কেবল কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—'আবেদন পত্রের উল্লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া হয় তো কৌন্সিলের মেম্বরগণ আমাকেও অসচ্চরিত্র লোক বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু এই সকল বিষয় গোপন করিলে আমার চরিত্রের উপর অপেক্ষাকৃত অধিকতর কলঙ্ক পড়িবে। সুতরাং হেষ্টিংস সাহেবের সমুদয় কুক্রিয়া আমি কৌন্সিলের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গের শাসন কর্তা। স্বার্থ রক্ষার্থ আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার অনেক কুক্রিয়ার সহায়তা করিতে হইয়াছে।

'হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পৌঁছিলে পর আমাকে বলিয়াছিলেন—'মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায় যে রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে এবং সিতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া আমাকে নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

'তাঁহার অনুরোধেই মহম্মদ রেজা খাঁর প্রদত্ত হিসাবপত্র আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

'রেজা খাঁ যে অন্যূন তিন ক্রোর টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আমলের কাগজপত্র দ্বারা প্রকাশ হইলে পর, তিনি আমাকে দুই লক্ষ টাকা এবং হেষ্টিংস সাহেবকে এগার লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন।'

'আমি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট এইরূপ উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাবের কথা বলিলে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই হেষ্টিংস রেজা খাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহতেই অনুমান হয় যে, হেষ্টিংস রেজা খাঁর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

'দুর্ভিক্ষের সময় মহম্মদ রেজা খাঁ যে অনেক ধান্য ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে গোলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও সপ্রমাণ হইয়াছিল।

'হেষ্টিংস রাণী ভবাণীকে বিনা অপরাধে বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারী হইতে উৎখাত করিয়া তাহার বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের সহিত প্রাগুক্ত পরগণা বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

'দিল্লীর বাদশাহ আমার নিমিত্ত পুরস্কার স্বরূপ একখানি পালকি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাটনা পর্যন্ত সে পালকি পৌঁছিলে সিতাব রায় তাহা আটক করিয়া রাখিলেন। এই বিষয়ে আমি হেষ্টিংসকে বলিলে তিনি সে পালকি পাটনা হইতে আনাইয়া নিজে রাখিয়াছেন। আজ পর্যন্তও আমাকে সে পালকি প্রদান করেন নাই।

‘হেষ্টিংস আমার পুত্র মহারাজ গুরুদাসকে নায়েব দেওয়ানের পদে এবং মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিবার সময় অনেক উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন।

‘প্রথমত আমি নিজে তাঁহাকে আমার গোমস্তা চৈতান নাথের মারফতে তাঁহার ভৃত্য জগন্নাথ এবং বালকৃষ্ণ এবং তাঁহার বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার প্রভৃতির নিকট তিন থলি স্বর্ণ মোহর প্রদান করিয়াছি। ইহার এক থলিতে ১৪৭১ মহর, দ্বিতীয় থলিতেও ১৪৭১ মোহর এবং তৃতীয় থলিতে ৯৮০ মহর এর ৫৭০ আধুলি ছিল। ‘দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ১৪৭০ মহর প্রদান করা হয়।

‘হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাব মবারিক উদ্দৌলার গর্ভধারিণী বহুবেগমকে পদচ্যুত করিয়া মণিবেগমকে গৃহের সমুদয় কর্তৃত্বভার প্রদান করিবার সময় একলক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন।

‘তৎপর তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলে, মণিবেগম মহারাজ গুরুদাসের দ্বারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, গবর্ণর সাহেবের বক্রী দেড় লক্ষ টাকা কাহার মারফতে পাঠাইতে হইবে। আমি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কান্ত পোদ্দারের ভ্রাতা নূর সিংহের নিকট কাশিমবাজারে টাকা প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। সেই দেড় লক্ষ টাকা যে নুর সিংহের নিকট দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহারাজ গুরুদাস পরে আমার নিকট লিখিয়াছেন।

‘হেষ্টিংস সাহেবের এই সকল কুক্রিয়া আমার দ্বারা ব্যক্ত হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই আমার বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। আমার পরম শত্রু মোহন প্রসাদের সহিত তিনি সৌহৃদ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মোহনপ্রসাদ অতি ক্ষুদ্র লোক। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংস তাহাকে আপন বাড়িতে আহ্বান করিয়া, সর্বদাই তাহাকে বিশেষ সমাদর করেন এবং সমকক্ষ লোকের ন্যায় তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার করেন।’

মহারাজ নন্দকুমারের এই আবেদন পত্র কৌন্সিল গৃহে পঠিত হইলে পর হেষ্টিংস ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘোর বিপদের আশঙ্কা করিয়া একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এবং জেনেরল ক্লেবারিংকে দৃঢ়স্বরে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, ‘আপনারা চক্রান্ত করিয়া নন্দকুমারের দ্বারা এই সকল অভিযোগ উপস্থিত করাইয়াছেন।’

ফ্রান্সিস্ বলিলেন, মহারাজ নন্দকুমারের আবেদন পত্রে যে সব অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদন্ত করা উচিত।’

হেষ্টিংস। নন্দকুমার ধূর্ত, প্রবঞ্চক এবং নীচাশয়। সে কোনো অভিযোগ উপস্থিত করিলে তাহা তদন্ত করা উচিত নহে।

জেনেরল ক্লেবারিং। মহারাজ নন্দকুমার এই দেশের একজন প্রধান লোক। তিনি সুবেদারের দেওয়ান ছিলেন। আপনার অপেক্ষাও তিনি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আবেদন পত্রের উল্লিখিত অভিযোগ অবশ্য তদন্ত করিতে হইবে।

হেষ্টিংস। এই বিষয় আপনারা তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলে, আমি এখনই কৌন্সিল ভঙ্গ করিব। আমি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল। আমি কখনো অভিযুক্তের পরিচ্ছদে এখানে উপস্থিত থাকিব না।

কর্ণেল মন্সন্। আপনি নির্দোষী হইলে আপনার পদের কোনো অমর্যাদা হইবে না।

হেষ্টিংস। আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হইলে, তাহা আপনাদের তদন্ত করিবার অধিকার নাই।

ফ্রান্সিস্। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদিগের দুর্ব্যবহার, অন্যায়াচরণ, এবং জুয়াচুরি নিবারণার্থই এই নব কৌন্সিল নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যেকোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবে, তাহাই আমাদিগকে তদন্ত করিতে হইবে।

হেষ্টিংস। তবে আমি এখনই কৌন্সিল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম।

হেষ্টিংস কৌন্সিল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলে,তাঁহার সহোদরসদৃশ উৎকোচগ্রাহী বারওয়েল, হেষ্টিংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। অপর তিনজন কৌন্সিলের মেম্বর মহারাজ নন্দকুমারকে কৌন্সিল গৃহে আনিয়া তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার অকপটে হেষ্টিংসের সমুদয় কুক্রিয়া বিবৃত করিলেন। তিনি এই বিষয় প্রমাণার্থ অনেক সাক্ষীর নাম উল্লেখ করিলেন। হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র কান্ত পোদ্দারকে পর্যন্ত সাক্ষী মান্য করিলেন।

কৌন্সিলের এই মেম্বরত্রয় ইহার পর দিন কান্ত পোদ্দারের জবানবন্দী গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস কান্ত পোদ্দারকে কৌন্সিল গৃহে যাইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। কান্ত কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আদেশ অমান্য করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে না থাকিলে কৌন্সিলের উপবেশন হইতে পারে না। সুতরাং হেষ্টিংস শূন্য কৌন্সিলে সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য নহে।'

কান্ত পোদ্দারের এই কথা শুনিয়া জেনেরল ক্লেবারিং অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন; এবং কান্ত পোদ্দারকে বেত্রাঘাত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু তৎপর দিবস হেষ্টিংস সাহেব জেনেরল ক্লেবারিংকে বলিলেন, 'কান্তকে যদি কেহ বেত্রাঘাত করে, তবে তিনি কান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিবেন।'

জেনেরল ক্লেবারিং এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এবং কর্ণেল মন্সন দেখিলেন যে কৌন্সিলের গৃহে হেষ্টিংসের সহিত ক্লেবারিং সাহেবের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং তাঁহারা ক্লেবারিংকে থামাইয়া রাখিলেন; ইহার পর তৎক্ষণাৎ কৌন্সিল ভঙ্গ হইল।

মহারাজ নন্দকুমারের আবেদন পত্রের উল্লিখিত অভিযোগ সকল কৌন্সিলের মেম্বর ফ্রান্‌সিস্, মন্‌সন্ এবং ক্লেবারিং সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেন।

উনচল্লিশ
প্রথম চক্রান্ত

চৈত্রমাস। গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন লোক রৌদ্রের সময় গৃহের বাহির হয় না। কিন্তু হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার এবং হেষ্টিংসের পরমহিতৈষী নবকৃষ্ণ মুন্সি আজকাল সর্বদাই এই চৈত্রমাসের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে শহরের এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন।

অপরাহ্ণে আবার ইঁহারা সকলেই আসিয়া হেষ্টিংসের গৃহে একত্রে সমবেত হইতেন। গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া অনেক কতাবার্তা বলিতেন। আবার রাত আট ঘটিকার পর প্রায় প্রত্যহ হেষ্টিংস সুপ্রিম কোর্টের জজ ইলাইজা ইম্পির বাড়ি যাইয়া নানা পরামর্শ করিতেন। কখনো কখনো সুপ্রিম কোর্টের সমুদার জজেরা হেষ্টিংসের সঙ্গে একত্র হইয়া নির্জনে পরামর্শ করিতেন।

হেষ্টিংসের এখন আর সেই হাস্যমুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিমর্ষের ছায়া দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

কান্ত পোদ্দার কখনো গঙ্গাবিষ্ণুর বাড়ি বসিয়া মোহনপ্রসাদের সহিত গোপনে নানাকথা বলিতেছে, কখনো মুর্শিদাবাদে লোক প্রেরণ করিতেছে। আজকাল পোদ্দারবাবুর এক মুহূর্তও অবসর নাই।

মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে পর প্রায় একমাস যাবত হেষ্টিংস, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, নবকৃষ্ণ মুন্সি এবং কান্ত পোদ্দারকে সর্বদাই ব্যস্ত দেখা গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মোহনপ্রসাদকেও হেষ্টিংসের বাড়িতে দেখা যাইত। মাসাবধি পরে অকস্মাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক চতুষ্টয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র হেষ্টিংস সাহেবের নিকট পৌঁছিল।

The Honorable Warren Hastings Esqr.

Sir,

A Charge having been exhibited, upon oath, before us against Joseph and Francis Fowke, Maharajah Nanda Kumar and Radha Charan Roy, for a conspiracy against you and others; we have summoned the parties to appear tomorrow, at ten o'clock in the

forenoon, at the house of Sir Elijah Impey, where we must require your attendance.

We are Sir,
Your most obedient humble Servants
E. Impay,
Rob. Chambers,
S.C. Lemaistre,
John Hyde

Calcutta,
April 19th 1775

পত্রের অনুবাদ

মহামান্য ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সমীপেষু

মহাশয়,

জোসেফ ফাউক, ফ্রান্সিস্ ফাউক, মহারাজ নন্দকুমার এবং রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগের নিকট এই মর্মে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, ইহারা আপনার এবং অন্যান্য কয়েক জনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমরা আসামীদিগকে আগামী কল্য পূর্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় ইলাইজা ইম্পির বাড়িতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তলব করিয়াছি। আপনি সেই স্থানে তখন উপস্থিত থাকিবেন।

কলকাতা,
১৯ই এপ্রিল।

আপনার অনুগত ভৃত্য,
ইলাইজা ইম্পি,
রবার্ট চেম্বার্স,
এস. সি. লিমেইষ্টার,
জন., হাইড।

চল্লিশ

প্রথম অভিযোগের বিচার

২০ এপ্রিল ১৭৭৫

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজ ইম্পির গৃহ লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। হেষ্টিংস, বারওয়েল, বান্সিটার্ট,* রাজা রাজবল্লভ।** কান্ত পোদ্দার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কমলদ্দিন আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া দশ ঘটিকার পূর্বেই ইম্পির বাড়িতে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ রায় বাহাদুর, জোসেফ ফাউক এবং ফাউক নন্দন ফ্রানসিস্ ফাউক অভিযুক্তের পরিচ্ছদে বিচারকদিগের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ফরিয়াদি কামালদ্দিন আলি খাঁ আভূমি সেলাম প্রদানান্তর শপথপূর্বক বলিল—

'আমার নাম কামালদ্দিন আলি খাঁ। আমি সরকার বাহাদুরের হিজেলি পরগণার লবণ মহালের ইজারাদার। সরকার বাহাদুর লবণের দাদন বাবদ আমাকে যে টাকা দিতে হুকুম করিয়াছিলেন, সেই টাকা হইতে ২৬০০০ ছাব্বিশ হাজার টাকা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমি সেই টাকা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিবার উপায় অবধারণার্থ কলিকাতা আসিয়া মহারাজ নন্দকুমারের নিকট গিয়াছিলাম। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে এই ছাব্বিশ হাজার টাকার নিমিত্ত দুইখানা দরখাস্ত লিখিয়াছিলাম। এই দরখাস্ত আমি মহারাজ নন্দকুমারের নিকট রাখিয়াছিলাম। সেই টাকা আদায় করিয়া দিতে পারিলে মহারাজ নন্দকুমারকে ছয় হাজার টাকা দিব বলিয়া কবুল করিয়াছিলাম।

'পরে মুন্সী সদরদ্দিনের নিকট যাইয়া এই সকল কথা বলিলে, তিনি আপোষে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তাহাতে আমি মহারাজ নন্দকুমারের নিকট দরখাস্ত ফেরত চাহিলাম। তিনি দরখাস্ত ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন; এবং তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণ রায়কে সঙ্গে দিয়া, আমাকে ফাউক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ফাউক সাহেব আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ করিয়া দরখাস্ত লিখিতে

* ইনি গবর্ণর বান্সিটার্ট নহে, দ্বিতীয় বান্সিটার্ট।

** ইনি বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ নহেন। কায়স্থ কুলোদ্ভব খাল্না ডিপার্টমেণ্টের রাজা রাজবল্লভ।

বলিলেন। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। ফাউক সাহেবের কথামত আমি হেস্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগের দরখাস্ত লিখিয়াছিলাম। সহস্তে সে দরখাস্ত লিখিয়াছিলাম; এবং আমার নামের মহর তাহাতে মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

ইলাইজা ইম্পি। তুমি সহস্তে দরখাস্ত লিখিলে কেন?

কামালদ্দিন। ধর্মঅবতার! আমাকে বড় ভয় দেখাইয়াছিল। তখন আমাকে সমুদয় হিন্দুস্থানের রাজত্ব লিখিয়া দিতে বলিলেও, তাহা লিখিয়া দিতাম।

ইলাইজা ইম্পি। Go on–আচ্ছা তোমার কথা বল।

'ধর্মঅবতার আমি দিনের মধ্যে সাতবার নোমাজ পড়ি। মিথ্যা কথা বলব না। আমি সেই সকল দরখাস্ত তৎপর দিন ফেরত চাহিয়াছিলাম। তখন ফাউক সাহেব আমাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। পরে ফাউক সাহেবের পুত্র বলিল, আগামী কল্য মহারাজ নন্দকুমার এখানে আসিবেন। তখন তুমি আসিলে যাহা হয় করিব।

'আমি তৎপর দিন আবার ফাউক সাহেবের কুঠিতে গিয়াছিলাম। তখন ফাউক সাহেবের ঘরে বসিয়া ফাউক এবং মহারাজ নন্দকুমার কী পরামর্শ করিতেছিলেন। ফাউক সাহেব এবং মহারাজ নন্দকুমার আমাকে বারম্বার হেস্টিংস এবং বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। আমি দরখাস্ত দিতে অসম্মত হইলে, আমাকে কয়েদ করিতে উদ্যত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার নিজের পালকিতে উঠিয়া পলাইয়া গবর্ণর সাহেবের বাড়ি আসিলাম।'

ইলাইজা ইম্পি এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্য তিনজন জজ, এই এজাহার শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'ফাউক সাহেবের পুত্রের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই। অতএব ফাউক নন্দন ফ্রান্সিস ফাউকে খালাস দেওয়া গেল। আর মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ এবং জোসেফ ফাউক সাহেবের বিরুদ্ধে হেস্টিংস এবং বারওয়েল সাহেব মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহা তিন দিনের মধ্যে আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন।'

একচল্লিশ

দ্বিতীয় চক্রান্ত

হেস্টিংস, বারওয়েল, কান্ত পোদ্দার এবং গঙ্গাগোবিন্দ এই মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। তাঁহারা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সুপ্রিম কোর্টের জজেরা অগত্যা তাঁহাদের উত্থাপিত এই মোকদ্দমা দায়ের রাখিলেন। ইহার শেষ নিষ্পত্তি হইল না।

এদিকে মহারাজ নন্দকুমার দেশের অন্যান্য জমিদারদিগকে লইয়া হেস্টিংস এবং বারওয়েলের অন্যান্য শত শত কুক্রিয়া ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় দশ পনের দিন অতিবাহিত হইল। জেনেরল ক্লেবারিং, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি সময়ে সময়ে নন্দকুমারের বাড়ি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

* * * *

অকস্মাৎ ৬ই মে মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট হইতে এক গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল। তিনি ধৃত হইয়া সেই দিনই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সমুদয় কলিকাতার লোক একেবারে আশ্চর্য এবং চমৎকৃত হইল। সুপ্রিম কোর্টের আচরণ দেখিয়া দেশীয় সমুদয় লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কী নিমিত্ত যে মহারাজ নন্দকুমার এই প্রকারে অকস্মাৎ কারাগারে প্রেরিত হইলেন, তাহার মর্মভেদ করিতে কেহই সমর্থ হইল না।

পরে প্রকাশ হইল যে মহারাজ নন্দকুমারের পরম শত্রু মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জাল দলিল প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযোগ করিয়াছিল, তন্নিমিত্তই সুপ্রিম কোর্টের জজেরা তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ মোহনপ্রসাদের সুদীর্ঘ এজাহারে কেবল সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

৬ই মে ১৭৭৫

‘আমার নাম মোহনপ্রসাদ। আমি মৃত বোলাকি দাসের উছি গঙ্গাবিষ্ণু এবং হিঙ্গলালের আটণর্কী। ১৭৬৯ সালের জুন মাসে বোলাকি দাসের মৃত্যু হইয়াছে। বোলাকি দাস তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এক উইল করিয়াছিলেন। সেই উইল দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির চারি আনা অংশ

তাঁহার পালিতপুত্র পদ্মমোহন দাসকে দিয়াছিলেন। উক্ত পদ্মমোহন দাসকে এবং আমাকে তাঁহার ষ্টেটের আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পদ্মমোহনের প্রায় তিন বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে। এখন আমি একাকী বোলাকি দাসের উছি, গঙ্গাবিষ্ণু এবং হিঙ্গুলালের পক্ষে বোলাকির ত্যাজ্য ষ্টেটের সমুদয় দেনা পাওনা আদায় উসুল করি। বোলাকি দাসের ষ্টেটের যত টাকা আদায় হয়, তাহার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে আমি কমিশন পাই।

'বোলাকীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে তাঁহার বাড়িতে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। বোলাকী মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং পদ্মমোহনকে মহারাজ নন্দকুমারের হাতে সমর্পণ করিলেন। তিনি বারম্বার মহারাজ নন্দকুমারকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমার স্ত্রী, কন্যা এবং পদ্মমোহনকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

'মৃত বোলাকীদাস শেঠের সহিত মহারাজ নন্দকুমারের দেনাপাওনা কারবার ছিল। বোলাকীর নিকট নন্দকুমারের কতক টাকা পাওনা ছিল। বোলাকী তাঁহার কোম্পানির খত বিক্রয় করিয়া সেই টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছিলেন।

'বোলাকীর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পরে মহারাজ নন্দকুমার, গঙ্গাবিষ্ণু এবং পদ্মমোহনকে সঙ্গে করিয়া, হেষ্টিংস সাহেবের বাড়ি হইতে বোলাকীর কোম্পানির কাগজ আনিয়া তাঁহার নিজের হাতে রাখিলেন। বোলাকীর স্ত্রী বলিলেন, মহারাজ নন্দকুমার অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কাগজ আনাইয়া দিয়াছেন; অতএব অগ্রে তাঁহার টাকা পরিশোধ কর।

'বোলাকী যে আমাকে আমমোক্তারনামা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র দশ হাজার টাকা মহারাজ নন্দকুমারের পাওনা বলিয়া উল্লিখিত ছিল। আমি গঙ্গাবিষ্ণুর নিকট সেকথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু বোলাকীর কোম্পানির কাগজ আনিবার চৌদ্দ কি পনের দিন পরে, পদ্মমোহন আমাকে এবং গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে দেনা-পাওনা পরিষ্কার করিতে গেল। মহারাজ নন্দকুমার তখন উপর তালায় বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বাড়ি গেলে পর, তিনি বোলাকীদাসের প্রদত্ত বলিয়া তিনখানা তমশুকের উপরিভাগ ছিঁড়িয়া পদ্মমোহনের হাতে দিলেন। সেই তিনখানা তমশুকের পাওনা টাকার নিমিত্ত তিনি বোলাকীর সতেরখানা কোম্পানির খত হইতে আটখানা খত নিজে রাখিলেন। এই তিন তমশুকের মধ্যে এক তমশুকে ৪৮০২১ টাকা দেনা লিখিত ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের আমানতি অলঙ্কারের মূল্য বাবদ বোলাকী তাঁহাকে এই তমশুক দিয়াদিলেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন। পার্সি ভাষায় এই তমশুক লিখিত ছিল। আমি পার্সি জানি না। এই তমশুকে সভ্যতা সম্বন্ধে তনই আমার মনে সন্দেহ হইল। কিন্তু পদ্মমোহন দাস এই তমশুক সত্য বলিয়া বরাবর আমার নিকট প্রকাশ করিতেন।

'এই সকল অগ্রভাগ ছেড়া তমশুক বোলাকী দাসের ষ্টেটের অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রোবেট লওয়ার সময় মেয়র কোর্টে দাখিল হইয়াছিল; এবং সেই হইতে এই তমশুক বরাবর মেয়র কোর্টেই ছিল। কিন্তু এই সকল তমশুকের এক এক খণ্ড নকল আমি রাখিয়াছিলাম।

‘মহারাজ নন্দকুমারের সহিত হিসাব পরিষ্কারের কয়েক মাস পরে আমি এক দিবস কামালদ্দিন আলি খাঁর নিকট বোলাকী দাসের ষ্টেটের পাওনা টাকা চাহিয়াছিলাম।

‘কামালউদ্দিন আলি খাঁ আমার বাড়িতে আসিয়া বলিল, বোলাকী দাসের ছয় শত টাকা মাত্র তাহার নিকট পাওনা হইবে। কিন্তু এখন তাহার টাকা পরিশোধ করিবার কোনো উপায় নাই। সে বড় দুরবস্থায় আছে।

‘আমি সেই সময়ে কামালদ্দিনকে মহারাজ নন্দকুমারের ছাড়তি (surrendered) তমশুক তিন খানার নকল দেখাইলাম। কামালদ্দিন সেই তিন তমশুকের নকল পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে ৪৮০২১ টাকার তমশুক দেখাইয়া বলিল, এই তমশুকের সাক্ষীর নামের স্থানে তাহার নামের মহর এবং তাহার নাম দেখা যায়। কিন্তু সে এইরূপ কোনো তমশুকে কখনো সাক্ষী হয় নাই।

‘এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে পুনর্বার কামালউদ্দিন আমার নিকট আসিয়া বলিল, মহারাজ নন্দকুমার তাহার লবণের মহালের জামিন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন বলেন যে তাঁহার কথামত তিনটি কার্য না করিলে তিনি তাহার জামিন থাকিবেন না। তিনি যে তিনটি কার্য করিতে বলিতেছেন তাহার মধ্যে প্রথম কার্য এই যে বোলাকীদাসের বিরুদ্ধে যে তিনি ৪৮০২১ টাকার এক তমশুক জাল করিয়াছেন, সেই তমশুকের প্রমাণার্থ তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। দ্বিতীয় কার্য লাসিংটন্ সাহেবের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের নালিশ করিতে হইবে; তৃতীয় কার্য বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধেও উৎকোচ গ্রহণের নালিশ করিতে হইবে। কিন্তু সে এইরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করিতে কখনো সম্মত হইতে পারে না। আমাকে সেই জন্য অন্য একজন জামিন তল্লাস করিতে বলিল।

‘আমি কামালদ্দিনের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ মাহাম্মদ আলির নিকট এই সমুদয় বলিলাম।

‘ইহার পর মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কাচারি আদালতে বোলাকী দাসের কোম্পানির কাগজের মূল্যের টাকার নিমিত্ত নালিশ করিলাম।

‘সেই মোকদ্দমায় মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জবাবে বলিলেন যে, তিনি বোলাকী দাসের নিকট তিনখান তমশুকের বাবদ টাকা পাইতেন। সেই তিনখান তমশুক কোম্পানির কাগজের মূল্যের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে কাচারি আদালত আমাদের মৌকদ্দমা ডিসমিশ করিতে উদ্যত হইলে, আমরা নালিশ মান্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু এই বিষয়ের আর কোনো সালিশী হয় নাই।

‘এই নূতন সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাপিত হইয়াছে পর মেয়র কোর্টের সমুদয় কাগজপত্র সুপ্রিম কোর্টে আসিয়াছে। আমি সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের চাড়্তি (surrendered) তমশুকের মধ্য হইতে ৪৮০২১ টাকার তমশুকখানা ফেরত লইয়া, তাঁহার নামে জাল দলিল প্রস্তুতের নালিশ করিতেছি। মহারাজ নন্দকুমারকে বোলাকী

দাস অলঙ্কারের মূল্যের বাবদ কখনো কোনো তমশুক দেন নাই। এই তমশুক মহারাজ নন্দকুমার জাল করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে এই জাল দলিল প্রস্তুতের অভিযোগ করিতেছি।'

মোহনপ্রসাদের এই এজাহারের পোষণার্থে পূর্ব মোকদ্দমার ফরিয়াদি কামালদ্দিন বলিল, 'এই দাখিলি তমশুকে তাহার নাম এবং মহর রহিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার যে তাহার নাম এই তমশুকে জাল করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু এই সাক্ষীর নাম কামালদ্দিন আলি খাঁ। তমশুকের লিখিত সাক্ষীর নাম আব্দু কামালদ্দিন। সুতরাং এইস্থানে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু সুচতুর কামালদ্দিন আলি খাঁ সাক্ষী বলিল যে এখন সে কিছু অধিকতর ভদ্র হইয়াছে, তাহাতে নামের পশচাতে একটা আলি সংযুক্ত করিয়াছে। বাল্যকালে আবদু কামালদ্দিনই তাহার নাম ছিল।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই কামালদ্দিন আলি খাঁই ১৯শে এপ্রিল তারিখে মহারাজ নন্দকুমার এবং ফাউক সাহেব প্রভৃতির নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সুবিজ্ঞ নূতন সুপ্রিম কোর্টের দুইজন জজ লিমইষ্টার এবং হাউড সাহেব ইলাইজা ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাদিগের এজাহার অনুসারে নন্দকুমারকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ পূর্বক বিচারার্থ সেসনে সোপর্দ করিলেন।

হেষ্টিংস, বারওয়েল, বান্সিটাট, রাজা বাজবল্লভ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার প্রভৃতির চক্রান্তে মহারাজ নন্দকুমার এইরূপে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি দেশের মধ্যে একজন উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে আহার করিতে তিনি সম্মত হইলেন না। অন্যূন তিন চারি দিন একক্রমে অনাহারে জেলের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের নিকট তাঁহার আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের নিমিত্ত দরখাস্ত করিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বর ফ্রান্সিস্ ফিলিপ, কর্ণেল মন্সন্, জেনেরল ক্লেবারিং সুপ্রিম কোর্টের এইরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া যারপনাই দুঃখিত হইলেন। মহারাজ নন্দকুমারকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত জেনেরল ক্লেবারিং সাহেবের কন্যা এবং লেডী মন্সন্ স্বয়ং কারাগারে যাইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এদিকে ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, 'মহারাজ নন্দকুমার উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি কারাগারে কখনো আহার করিবেন না। অতএব তাঁহাকে কারাগারে রাখিতে হইলে তাঁহার আহারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।'

কিন্তু হেষ্টিংস প্রভৃতির উত্তেজনায় সুপ্রিম কোর্টের জজেরা তিন চারি দিনের মধ্যেও এই বিষয় কোনো বন্দোবস্ত করিলেন না। বোধ হয় প্রথমত চক্রান্ত করিয়া নন্দকুমারকে কারাগারে অনাহারে মারিয়া ফেলিবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্টের জজেরা এই বিষয় দেশীয় পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত কান্ত পোদ্দার তিন চারি দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে হরিদাস তর্কপঞ্চাননকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

হরিদাস তর্কপঞ্চাননের স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁহার পুত্র দুইটিরও মৃত্যু হইয়াছিল। এই পণ্ডিত মহাশয় পাঠকদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। ইনি ইতিপূর্বে স্বীয় কন্যাকে বিষ প্রদান করিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের মধ্যে ইঁহার বিশেষ প্রাধান্য আছে। বঙ্গসমাজে ঈদৃশ নরপিশাচেরা সহজেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। তৎকালে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। ইনি সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'কারাগারে আহার করিলে কোনো ব্রহ্মণ পতিত হয় না। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণকে কারাগারে আহার করিতে হয়, তাহারা কারামুক্ত হইয়া ধার্মিক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ প্রদান করিলে, কিম্বা দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই, এই ক্ষুদ্র পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।'

নন্দকুমার যখন দেওয়ান ছিলেন, তখন হরিদাস তর্কপঞ্চানন সময়ে সময়ে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ধার্মিক বলিয়া পরিচিত এই বঙ্গকুলাঙ্গার কান্ত পোদ্দারের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিয়া এখন এইরূপ মত প্রদান করিল।

মহারাজ নন্দকুমার অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতকে তলব করাইয়া তাঁহাদের মত গ্রহণার্থ আবার দরখাস্ত করিলেন। পূর্বোল্লিখিত নবকিশোর চট্টোপাধ্যায় এই সময় কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ কারাগারে আহার করিলে শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগকে পতিত হইতে হয়। পণ্ডিতদিগের এরূপ মতের অনৈক্য দেখিয়া জজেরা নন্দকুমারের আহারের নিমিত্ত কারাগারে এক স্বতন্ত্র তাম্বু প্রদান করিবার আদেশ করিলেন।

দেশের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহারাজ নন্দকুমারের এইরূপ দুরবস্থার সময়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক দিন শত শত লোক জেলে যাইয়া মহারাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। জেলের মধ্যেও তাঁহার দরবার হইতে লাগিল।

বিয়াল্লিশ
বিচার না নরহত্যা?
৩রা জুন ১৭৭৫
ইংলণ্ডেশ্বর বনাম মহারাজ নন্দকুমার

উপস্থিত

সাই লাইজা ইম্পি নাইট চিফ্ জাস্টিস্, রবার্ট চেম্বারস্
স্টিফেন সিজার লিমেইস্টার, জন্ হাইড্, পিউনি জজত্রয়।

সুপ্রিম কোর্ট লোকারণ্যে পরিপূর্ণ হইল। দেশীয় সহস্র সহস্র ভদ্রলোক মহারাজ নন্দকুমারকে অভিযুক্তের পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের জজেরা লোহিত বস্ত্রে সমাবৃত হইয়া ধীর পদ সঞ্চারে আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের গোমস্তা চৈতাননাথ, তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণ রায় বাহাদুর সুপ্রিম কোর্টের বারিষ্টার ফারার সাহেবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে ফরিয়াদির সাক্ষিগণ এবং কান্ত পোদ্দার প্রভৃতি হেষ্টিংসের সহচরেরা দর্শকদিগের বসিবার স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুত করা, জাল দলিল ব্যবহার করা, জাল দলিল প্রকাশিত করা, জাল দলিল অন্যের হস্তে অপর্ণ করা, জাল দলিল স্পর্শ করা ইত্যাদি অন্যূন বিশটি অভিযোগ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।*

এই সমুদয় অভিযোগ তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে পর তিনি বললেন, 'আমি নির্দোষী'।

তৎপর আবার জজেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাহার বিচার প্রার্থনা করেন।'

মহারাজ নন্দকুমার বলিলেন, 'আমি প্রার্থনা করি যে পরমেশ্বর আমার বিচার করুন; আমার দেশীয়, আমার সমশ্রেণীস্থ লোকেরা আমার বিচার করুন।'

কিন্তু বাঙ্গালিদিগের জুরর (Juror) হইবার কোনো অধিকার ছিল না। সুতরাং বারোজন ইংরাজ জুরী মনোনীত হইলেন। ইঁহাদিগের প্রায় সমুদয়ের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের পূর্বে শত্রুতা ছিল।

---

* এই মোকদ্দমা বিচারের পর এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মোহনপ্রসাদ প্রথম যে দরখাস্ত দাখিল করে তাহার মুশাবিদা সুপ্রিম কোর্টের জজেরা করিয়া দিয়াছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান ইন্টারপ্রেটার উইলিয়ম চেম্বারসের অনুপস্থিতি নিবন্ধন হেস্টিংস এবং ইম্পির অনুগত লোক আলেক্‌জ্যাণ্ডার ইলিয়ট ইন্টারপ্রেটারের কার্য করিবেন বলিয়া স্থির হইল। মহারাজ নন্দকুমারের বারিস্টার ইলিয়ট সাহেবকে ইণ্টারপ্রেটার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। কিন্তু ইম্পি সক্রোধে এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন।

তৎপর ক্লার্ক অব দি ক্রাউন (Clerk of the Crown) অভিযোগ-পত্র পাঠ করিলেন এবং সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল।

প্রথম সাক্ষী স্বয়ং ফরিয়াদি মোহনপ্রসাদ। ইহার জবানবন্দী আর এইস্থানে উদ্ধৃত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে এজাহারে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই আবার এখন বলিল। মধ্যে মধ্যে কেবল কয়েকটি খাতা তজ্‌দিগ্ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় সাক্ষী পূর্ব মকদ্দমার ফরিয়াদি কামালদ্দিন আলি খাঁ শপথ করিয়া বলিল, ‘আমার নাম কামালদ্দিন আলি খাঁ। আমি মীরজাফরের রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদ জেলে কয়েদ ছিলাম। পরে কারামুক্ত হইয়া সুবাদার মীরজাফরের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলাম। মহারাজ নন্দকুমার তখন মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি আমাকে আমার নামের মহর মুদ্রিত করিয়া দরখাস্ত পাঠাইতে লিখিলেন। আমি তখন আমার নামের মহর আমার পূর্ব প্রেরিত দরখাস্তে মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ নন্দকুমারের নিকট প্রেরণ করিলাম। সেই সময় হইতে আমার নামের মহর এই চৌদ্দ বৎসর যাবত, মহারাজ নন্দকুমারের নিকট রহিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার সে মহর আমাকে ফেরত দেন নাই।’

যে তমশুক মহারাজ নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই তমশুক এই সাক্ষীকে দেখাইলে, সাক্ষী তমশুক দেখিয়া বলিল, ‘এই তমশুকে যে মহর মুদ্রিত হইয়াছে, এই মহরই আমার নামের মহর। মহারাজ নন্দকুমারের নিকট যে আমি চৌদ্দ বৎসর পূর্বে আপন নামের মহর প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সাক্ষী আমার চাকর হোসেন আলি। এতদ্ভিন্ন আমি ইতিপূর্বে খাজে পেট্রুজ এবং মুন্‌সী সদরদ্দিন নিকট এই বিষয় বলিয়াছি।’

ইলাইজ ইম্পি। এই তমশুকের মহর দেখিয়া তুমি বলিতেছ যে এই তোমার নামের মহর। কিন্তু তোমার নাম কামালদ্দিন আলি খাঁ। তবে তমশুকে আব্‌দু কামালদ্দিনের মহর এবং আব্‌দু কামালদ্দিনের নাম রহিয়াছে কেন?

সাক্ষী। ধর্মঅবতার! আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিব না। আমি দিনের মধ্যে সাতবার নোমাজ পড়িয়া থাকি। আমার নাম পূর্বে আব্‌দু কামালদ্দিন ছিল। কিন্তু এখন আমি পূর্বাপেক্ষা কিছু একটু বড় লোক হইয়াছি তাহাতেই নামের আগের ভাগ ছাড়িয়া দিয়া, পিছের দিকে একটা ‘আলি’ লাগাইয়া দিয়াছি। আমাদের মুসলমানেরা ভদ্র হইলে নামের পাছে ‘আলি’ বা ‘খাঁ’ ইত্যাদি শব্দ বসাইয়া থাকে।

জজ হাইড। এই তমশুকে যে তোমার নামের মহর এবং তোমার নাম সাক্ষীস্থলে লিখিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিলে?

সাক্ষী। আজ্ঞে ধর্মাবতার! কখনো মিথ্যা কথা বলিব না। মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমার নাম এবং আমার নামের মহর এই তমশুকে সাক্ষীর স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর আমাকে ইহাও বলিয়ছিলেন, 'এই তমশুকের প্রমাণার্থ তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে!' কিন্তু আমি বলিলাম যে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারিব না। আমি অধর্মের কাজ কখনো করিব না।

জেরাসওয়াল। মোহনপ্রসাদ তোমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত টাকা দিয়াছে কি না?

কামালদ্দিন। ও আল্লা—ও আল্লা, তোবা—তোবা—আমি কি আর এমন কাজ করি!

মহারাজ নন্দকুমার ইহার প্রেরিত দরখাস্ত এবং মহর প্রাপ্তি স্বীকার পূর্বক ইহার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া এই সাক্ষী এক জাল পত্র দাখিল করিয়াছিল। কিন্তু সে পত্রে মহরের কথা উল্লেখিত ছিল না।

তৃতীয় সাক্ষী হোসেন আলি শপথ করিয়া বলিল, 'আমার নাম হোসেনালি। আমি কামালউদ্দিন খাঁর চাকর। কামালউদ্দির সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। কামালদ্দি ইতিপূর্বেও মহারাজ নন্দকুমার এবং ফাউক সাহেবের নামে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই বারবার আমরা এখানে আছি। প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল কামালউদ্দিন তাঁহার নামের মহর মহারাজ নন্দকুমারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। যে থলিতে ভরিয়া মহর পাঠাইয়াছিলেন, ঐ থলি আমি সেলাই করিয়াছিলাম। তাহাতে জানি যে কামালদ্দিন তাঁহার নামের মহর মহারাজ নন্দকুমারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।'

চতুর্থ সাক্ষী খাজে পেট্রুজ শপথ পূর্বক বলিল, 'আমার নাম খাজে পেট্রুজ। আমি আরমানিয়ান। আমি হিন্দি এবং পার্সি ভাষা জানি। আমি কামালদ্দিনকে চিনি। চারি বৎসর হইল কামালদ্দিন একবার আমার নিকট বলিয়াছিল যে তাহার নামের মহর মহারাজ নন্দকুমারের নিকট রহিয়াছে।'

পঞ্চম সাক্ষী মুন্সী সদরদ্দিন শপথ পূর্বক বলিল, '১১৭৯ সালের আষাঢ় মাসে কামালউদ্দিন আমার নিকট আসিয়া বলিল যে মহারাজ নন্দকুমার তাহার নামের মহর এক জাল তমশুকে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাকে সেই তমশুক তজ্‌দিগ্ কবিরার নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন। সে (কামালদ্দিন) মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে তিনি (মহারাজ) তাহার জামিন হইবেন না। তাহাতে আমি কামালদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাহার নামের মহর মহারাজ নন্দকুমার কেমন করিয়া পাইলেন। কামালদ্দিন বলিল যে চৌদ্দ পনের বৎসর পূর্বে সে নবাব মীরজাফরের নিকট এক দরখস্ত পাঠাইয়াছিল। এই দরখাস্তে মহর মুর্দ্রিত ছিল না। পরে দরখাস্তে মহর মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সে মহারাজ নন্দকুমারের নিকট তাহার নামের মহর প্রেরণ করিয়াছিল। তদবধি সে মহর মহারাজ নন্দকুমারের নিকট রহিয়াছে।'

ষষ্ঠ সাক্ষী রাজা নবকৃষ্ণ। ইহার জবানবন্দি এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার পূর্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করা বিধেয়।

যে তমশুক মহারাজ নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ হইয়াছিল, সেই তমশুকে তিনজন মাত্র সাক্ষী ছিল। একজন সাক্ষীর নাম আব্দু কামালদ্দিন, দ্বিতীয় সাক্ষী শীলাবত, তৃতীয় সাক্ষী মাধব রায়। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে শীলাবত, আমদু কামালউদ্দিন এবং মাধব রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ মুন্সী মৃত শীলাবত সিংহের হস্তাক্ষর চিনিতেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। সুতরাং তমশুকে শীলাবতের প্রকৃত দস্তখত ছিল কি না তাহার প্রমাণার্থই তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হইল।

রাজা নবকৃষ্ণ শপথপূর্বক বলিলেন, 'আমার নাম নবকৃষ্ণ দেব। আমি লর্ড ক্লাইবের মুন্সী ছিলাম। বোলাকী দাসের উকিল শীলাবতের হস্তাক্ষর আমি চিনি। বোলাকী দাসের পক্ষ হইতে শীলাবত ক্লাইবের নিকট সময়ে সময়ে অনেক পত্রাদি লিখিতেন, তাহাতেই তাঁহার হস্তাক্ষর চিনি।'

মোহনপ্রসাদের কথিত জাল তমশুক রাজা নবকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিয়া জজেরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই তমশুকে যে শীলাবত সিংহের দস্তখত আছে, ইহা শীলাবতের প্রকৃত দস্তখত কি না?

রাজা নবকৃষ্ণ। আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমি কায়েত। আসামী ব্রাহ্মণ। মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে আসামীর প্রাণদণ্ড হইবে। এ সহজ ব্যাপার নহে।

ইলাইজা ইম্পি। তুমি শপথ করিয়াছ। তোমাকে অবশ্য সত্য কথা বলিতে হইবে। এই দস্তখত শীলাবতের দস্তখতের মতো দেখা যায় কি না?

রাজা নবকৃষ্ণ। আমার মনের কথা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রাহ্মণের জীবন লইয়া টানাটানি। এ বড় গুরুতর বিষয়। ধর্ম-অবতার! আমাকে মাপ করুন।

ইলাইজা ইম্পি। এই শীলাবতের দস্তখত কি না তুমি নিশ্চয়ই করিয়া বল।

রাজা নবকৃষ্ণ। আজ্ঞে, এ শীলাবতের দস্তখত নহে। শীলাবতের হস্তাক্ষর এত উৎকৃষ্ট ছিল না।

বাদীর সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দি হইলে পর জজেরা দেখিলেন যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুতের অপরাধ কোনো ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না। অন্যূন নয়বার মোহনপ্রসাদকে সাক্ষীর বাক্সে আনিতে হইল। কিন্তু পদ্মমোহন দাস মোলাকীর মৃত্যুর পর যে এই তমশুক সত্য করিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহা কিছুতেই প্রমাণ হয় না।

জজ, জুরি, হেস্টিংস, বারওয়েল সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড না হইলে উৎকোচ গ্রহণ এবং দেশ লুণ্ঠনের সুবিধা হয় না। এখন কী উপায় অবলম্বন করিবেন।

বোলাকী দাসের প্রধান গোমস্তা কৃষ্ণজীবন দাসকে চব্বিশ বার সাক্ষীর বাক্সে আনিলেন। কোনো প্রকারেই মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না। অবশেষে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণজীবন দাস স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন, যে পদ্মমোহন দাসের হস্তলিখিত এক করারনামা বোলাকী

দাসের মৃত্যুর পূর্ব বোলাকী নিজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; সে করারনামা মোহনপ্রসাদ মোকদ্দমা উত্থাপনের চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই করারনামা পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে বোলাকীদাস ৪৮০২১ টাকার বাবদ মহারাজ নন্দকুমারকে ১৭৬৫ সনে এক তমশুক দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণজীবন দাসের জবানবন্দিতে এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র, একেবারে সুপ্রিম কোর্টের জজ এবং হেস্টিংস প্রভৃতি সকলের মস্তকে বজ্রঘাত হইল। ইলাইজা ইম্পি অত্যন্ত সুচতুর। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কৃষ্ণজীবন বরাবর সকল কথা অকপটে বলিয়াছে। কিন্তু অদ্য করারনামার বিষয় বলিবার সময় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল; শরীর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণজীবনের এই শেষ কথা নিতান্ত মিথ্যা। আর পদ্মমোহন মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে যোগসাজস করিয়া এই করারনামা তাহার মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিল।'

এদিকে কান্ত পোদ্দার, নবকৃষ্ণ মুন্সী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কায়স্থ কুলোদ্ভব দ্বিতীয় রাজা রাজবল্লভ এবং স্বয়ং হেস্টিংস নূতন সাক্ষী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর আমাদের পূর্বোল্লিখিত লবণের কুঠির এজেন্ট জনস্টোন সাহেবের খান্‌সামা আজিমালি চাচাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

আজিমালি জনস্টোন সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা আসিয়াছিল পর খান্‌সামার কার্য পরিত্যাগ করিয়া, লালবাজারে জুতার দোকান খুলিয়াছিল। ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিকসভার অধ্যক্ষগণ এই ব্যক্তিকে পূর্বে সরকারি সাক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন উকিল-সরকার নিযুক্ত হইত না। একজন সরকারি সাক্ষী থাকিত। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোপনে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলেই, আজিমালিকে তাহার অপরাধ প্রমাণার্থ সাক্ষ্য দিতে হইত। কিন্তু বণিকসভা এবালিস্ হইলে পর আজিমালির পদও এবালিস্ হইল। সে এখন কলিকাতায় একটি স্ত্রীলোককে নিকা করিয়া লালবাজারে বাস করিতে ছিল। জুতা বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত।

সাক্ষ্য প্রদান করিতে যে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, তাহা হেস্টিংস প্রভৃতি সকলেই জানিতেন। সুতরাং ফরিয়াদির পক্ষে ইহাকে প্রধান সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করা হইল।

আমরা এই স্থানে পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ বলিতেছি যে সুপ্রিম কোর্টের অনুমত্যানুসারে মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার যে রিপোর্ট মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আজিমালি সাক্ষির নাম উল্লিখিত নাই। হয়তো পাঠকগণ বলিবেন যে এই সাক্ষীটি লেখকের কল্পিত। কিন্তু বোধ হয় রিপোর্টারের ভুল ক্রমেই আজিমালির নাম উল্লেখ হয় নাই। বিশেষত নন্দকুমারের মোকদ্দমার রিপোর্ট ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইলে পর, মেকিণ্টস্ নামক একজন ইংরাজ একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সুপ্রিম কোর্টের জজেরা সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক মোকদ্দমার অনেক কথা গোপন করিয়াছিলেন। অনেক সাক্ষীর জবানবন্দি পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মেকিণ্টসের কথা সত্য হইলে হয়তো আজিমালির জবানবন্দি সেই নিমিত্ত রিপোর্টে দেখা যায় না।

কিন্তু এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি তৎসমুদয়ই উল্লেখ করা উচিত। অতএব মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী আজিমালি চাচার জবানবন্দির নকল সবিস্তারে এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

৩রা জুন এই মোকদ্দমার ফরিয়াদির সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হয়। ১১ই জুন ফরিয়াদির অন্যান্য সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দি শেষ হইল। ১২ই জুন ফরিয়াদি পক্ষে আজিমালির সাক্ষী আসিয়া হাজির হইল। সেসনের মোকদ্দমার আইনানুসারে এইরূপ নূতন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় জজেরা আইনানুসারে কার্য করিতে বাধ্য ছিলেন না। যদি আইনানুসারে কার্য করিতেন তবে মুন্সী সদরদ্দি এবং খাজে পেট্রেজের জবানবন্দিও গৃহীত হইত না।

আজিমালি চাচা সুপ্রিম কোর্টে আসিয়া সাক্ষীস্বরূপ হাজির হইল। তাহাকে সাক্ষীর বাক্সে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহারাজ নন্দকুমারের গোমস্তা চৈতাননাথের এবং মহারাজার জামাতা রায় রাধাচরণ রায় বাহাদুরের মস্তকে একেবারে বজ্রাঘাত হইল। ইঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন মহারাজ নন্দকুমারকে দলিল প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছে, এইরূপ একটা কথা কোনো সাক্ষীর মুখ হইতে বাহির হইলেই জজেরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন। ইংরাজি প্রথানুসারে বিচার হইতেছে। কেবল আইনত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবেই জজেরা ইতস্তত করিতেছেন। তাহা হইলে নন্দকুমারের দোষ, বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেই সাব্যইত হইয়া রহিয়াছে।

নন্দকুমারের গোমস্তা চৈতাননাথ ধূর্ততা এবং শঠতাতে হেষ্টিংসের সহচরগণ অপেক্ষা বড় কম ছিল না। আজিমালি জবানবন্দি দিতে আরম্ভ করিলে, সে অবিশ্রান্ত হস্ত ইশারা দ্বারা তাহাকে প্রথমত একশত টাকা, পরে দুইশত ক্রমে তিনশত টাকা পর্যন্ত কবুল করিল। কিন্তু আজিমালি তাহাতে সম্মত হইল না। সে শপথ করিয়া প্রশ্নোত্তরে বলিতে লাগিল—

'আমি মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি চিনি! মহারাজ নন্দকুমারের গোমস্তা চৈতাননাথ বাবু আমার দোকান হইতে বরাবর জুতা নিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট বাকিতে জুতা বিক্রী করি। ইংরাজি ১৭৬৯ সালের জুলাই মাসের চৈতাননাথ বাবুর নিকট জুতার দাম আনিতে মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি গিয়াছিলাম। ইহার দশ দিন পূর্বে বোলাকী দাসের মৃত্যু হইয়াছিল। চৈতাননাথ বাবুকে বড় ব্যস্ত দেখিলাম। চৈতানবাবু আমাকে বল্লেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মহারাজের কাজে ব্যস্ত আছি। আমি চৈতাননাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, কী কার্যে ব্যস্ত আছেন? তিনি বল্লেন, মহারাজ একখানা তমশুক জাল করিতেছেন তাহাতে ব্যস্ত আছি। তারপর মহারাজ নন্দকুমার বৈঠকখানায় আসিলেন; বাক্স খুলিয়া প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা নামের মহর বাহির করিলেন;* চশমা নাকে দিয়া, সেই মহরের নাম পড়িতে লাগিলেন। সেই সকল মহর হইতে একটা মহর ধরিয়া চৈতাননাথকে বলিলেন, দেখ

* Vide note (10) in the appendix.

তো, এইটা কামালদ্দিনের নামের মহর কি না। চৈতাননাথবাবু সেই মহর হাতে নিয়া বল্লেন, 'হাঁ, এই কামালদ্দিনের নামের মহর বটে।'

আজমালি এই পর্যন্ত বলিলেই জজেরা বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এত দিনের পর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সে এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেই জজেরা বলিতেন, 'Go on–Go on. তার পর — তার পর।'

আজিমালি। আজ্ঞে তার পর তমশুকের মত একখানা কাগজে সেই মহর ছাপাইলেন।

জজ হাইড্। Go on–Go on. তার পর— তার পর।

আজিমলি। তার পর চৈতানবাবুকে বলিলেন যে এই মহর যে স্থানে ছাপাইয়াছি তার পার্শ্বে আব্দু কামালদ্দিনের নাম লিখিয়া রাখ।

জজ লিমেইষ্টার। Go on – তার পর।

আজিমালি। তার পর সেই কাগজে চৈতানবাবু আব্দু কামালদ্দিনের নাম লিখিলেন।

জজ চেম্বারস্। তুমি লেখাপড়া জান।

আজিমালি। আজ্ঞে এখন চক্ষে কিছু কম দেখি, এখন পড়িতে পারি না। পূর্বে পার্সি লেখা পড়িতে পারিতাম।

ইলাইজা ইম্পি। Go on. তার পর।

আজিমালি। আজ্ঞে তার পর সেই তমশুকে পার্সিতে মহারাজ নন্দকুমার শীলাবত সিংহ এবং মাধব রায়ের নাম সাক্ষীর স্থানে লিখিলেন।

সাক্ষী এই পর্যন্ত বলিবামাত্র রায় রাধাচরণ ঘোর বিপদের আশঙ্কা করিয়া চৈতাননাথকে চুপে চুপে বলিলেন, 'আজিমালিকে এক হাজার টাকা কবুল কর।'

চৈতান অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়া সাক্ষীকে এক হাজার টাকা কবুল করিল।

তখন আজিমালি চৈতাননাথকে আশ্বাসসূচক ইশারা করিল।

এদিকে জজেরা এবং ফরিয়াদির উকিল আজিমালিকে বলিতে লাগিলেন, 'তার পর। তার পর।'

আজিমালি। তার পর সমুদয় সাক্ষীর নাম দলিলে লেখা হইলে মহারাজ নন্দকুমার দলিলখানা নিজের মুখের কাছে ধরিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাতে শোনলাম যে বোলাকী তমশুক দিল বলিয়া লেখা হইয়াছিল।

সমুদয় জজ। (অতিশয় আনন্দিত হইয়া) Go on —তার পর।

আজিমালি। দলিল পাঠ করিয়া মহারাজ নন্দকুমার কাগজখান বাক্সের মধ্যে রাখিলেন।

সমুদয় জজ। Go on– তার পর।

আজিমালি। আজ্ঞে তার পর ঘরের মধ্যে হইতে মুর্গী ডাকিয়া উঠিল। আমারও ঘুম ভাঙ্গিল। আমার ছোট কবিলা বলিল, মিঞা তুমি গাথোল্ বা না (গাত্রোত্থান করিবে না)—বাইরে রৌদ্র উঠছে।

ইন্টারপ্রেটার ইলিয়ট সাহেব সাক্ষীর এই কথা শুনিয়া হাঁ করিয়া সাক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জজেরা ইন্টারপ্রেটারকে তাড়াতাড়ি সাক্ষীর এই শেষ কথা ইন্টারপ্রেট করিতে বলিলেন; এদিকে সাক্ষীকে বলিতেছেন, Go on – Go on.

আজিমালি। আজ্ঞে তারপর আমি আমার ছোট কবিলাকে বল্লাম যে, মীরের ঝি! আমি সপনে দেখিতেছিলাম যে মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি গিয়াছি, তিনি বোলাকীবাবুর নামে খত জাল করিতেছেন।

ইন্টারপ্রেটার ইলিয়টসাহেব সাক্ষীর এই শেষোক্ত দুই কথা জজদিগকে বুঝইয়া বলিলে, তাঁহার স্তব্ধ হইয়া আজিমালির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আজিমালি আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'আজ্ঞে ধর্মাবতার যাহা যাহা দেখিয়াছি তা সকলেই বলব। জান গেলেও এক কথাও মিথ্যা বলব না। আমার ছোট কবিলা বল্লো, মিঞা কী সপন দেখিয়াছ। আমি বল্লাম, বড় মজার সপন দেখিয়াছি। সপন দেখ্‌তে ছিলাম আমি চৈতানবাবুর নিকট জুতার পয়সা আন্‌তে গিয়াছি— চৈতানবাবু আর মহারাজ নন্দকুমার খত জাল করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমার ছোট কবিলা বল্লো, মিঞা! তুমি হর হামেশা কেবল সাহেব, সুবা, রাজা, উমরা লোকের বাড়ি যাও—তাদের সঙ্গে চলা চল্‌তি কর—তাতে স্বপ্নেও তাই দেখ।'

সুপ্রিম কোর্টের জজ চতুষ্টয় একেবারে ভেবা-চোকা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অবশেষে জজ চেম্বারস্‌ ইন্টারপ্রেটারকে বলিলেন যে, এই সাক্ষীর নিকট জিজ্ঞাসা কর এ ব্যক্তি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাই জবানবন্দিতে বলিয়াছে নাকি।

ইন্টারপ্রেটার আজিমালির নিকট এই প্রশ্ন করিলে পর আজিমালি বলিল, 'হুজুর আমি স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছি সকলই বলিয়াছি। তিন চারি দিন হইল, মোহনপ্রসাদবাবুর নিকট বলছিলাম যে মহারাজ নন্দকুমার যে দলিল জাল করিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। তাতে মোহনপ্রসাদবাবু সকল কথা না শুনিয়া তাড়াতাড়ি বল্লেন, তোকে সাক্ষী দিতে হবে। আমি বোল্লাম, যা দেখছি তা বোলতে পারব। যা দেখছি তাই এখানে বল্লাম। আমি কোনো কথা মিথ্যা বলি নাই। ধর্মাবতার! আমি একেবারে ছোটলোক না—আমার চোট কবিলা মীরের মেয়ে। জিলার কর্তা মৌলবী আবদুল লতাফত্‌ আমার সাক্ষাৎ শ্বশুর। মৌলবী আবদুল রহেমান আমার বৈমাত্র্‌ শালা।'

এই সময় চৈতাননাথ পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, 'বেটা ভদ্র মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বেটা লালবাজারের রহেমানির মেয়েকে নিকা করিয়াছে। এখন বলিতেছে যে মৌলবী আবদুল লতাফত্‌ ওর শ্বশুর।'

আজিমালি। (চিৎকার করিয়া) দোহাই ধর্মাবতারের—আমি চৈতানবাবুর নামে 'ডামেজের মোকদ্দমা করব—ইনি আমার শাশুড়িকে লালবাজারের রহেমানি বলতেছেন।

ধর্মাবতার, আমার শাশুড়ি এখন পর্দানিশী হইয়াছেন। তিনি পূর্বে লালবাজারে বছর আষ্টেক একটু বেপর্দায় ছিলেন। আজ প্রায় ছয় মাস হইল, মৌলবী সাহেব তাঁহাকে নিকা করিয়া পর্দানিশী করিয়াছেন। তাতেই তো মৌলবী সাহেব আমার শ্বশুর।'

আজিমালি সাক্ষীর কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, জজউকিল, ইন্টারপ্রেটার সকলই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কাহার মুখে কোনো কথা নাই।

অনেকক্ষণ পরে ইলাইজা ইম্পি আসামীর বারিষ্টার ফারার সাহেবকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, Mr. Farrer! have you any legal objection to our using this man's statement in evidence. ফারার, ইহার জবানবন্দি প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি আছে?

ফারার। My Lord ! how his statement can be considered admissible in evidence I cannot understand. He started what he saw in a dream. আমি বুঝিতে পারি না ইহার জবানবন্দি কিরূপে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে। এ ব্যক্তি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাই বলিয়াছে।

ইলাইজা ইম্পি। Mr. Farrer! in this hot climate of India, there is hardly anything like sound sleep. In Eengal even when we are supposed to be asleep, we are almost half-awakened. I think under these peculiar climatic circumstences, Lord Thurlow would not hesitate to accept in evidence a statement of fact observed or perceived, seen or heard, in a half-awakened state. মেস্তর ফারার! এই গ্রীষ্মাতিশয়প্রধান দেশে কখনো পূর্ণ নিদ্রা হয় না। আমরা নিদ্রিতাবস্থায় প্রায় অর্ধজাগ্রত থাকি। এইরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে, সে বিষয় সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লর্ড থার্লো বোধ হয় অনুচিত মনে করিবেন না।

ফারার। My Lord! I have nothing to do with Lord Thurlow's opinion on the subject. But if your Lordship is inclined to use Azimali's statement in evidence, I hope my obejection to the admissibility of such statement in evidence should be recorded. লর্ড থার্লোর মতামতের বিষয় আমি কিছু বলিতে চাই না। আপনি যদি আজিমালির সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই সম্বন্ধে আমার আপত্তি লিখিয়া রাখিবেন।

ইলাইজা ইম্পি অন্য তিনজন জজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, আজিমালির জবানবন্দি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা আসামীর বারিষ্টারকে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

আসামীর বারিষ্টার ফারার সাহেব বলিলেন, 'আসামীর বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুতের অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই। অতএব আমরা সাফাই সাক্ষী দিব না। আসামী অবশ্য খালাস পাইতে পারে।'

সুপ্রিম কোর্টের জজেরা বলিলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব সাফাই সাক্ষী না দিলে জুরিদিগের নিকট আমাদিগকে প্রমাণ সমালোচনা করিতে হইবে।

বোলাকী দাস যে মহারাজ নন্দকুমারকে তমশুক দিয়াছিল, সে বিষয় প্রমাণ করিবার নিমিত্ত মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষে অনেক সাক্ষী উপস্থিত ছিল। সুতরাং একে একে তাহাদের জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

আমরা এই সকল সাফাই সাক্ষীর নাম কেবল এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। ইহাদিগের জবানবন্দি উদ্ধৃত করিয়া উপন্যাসের আয়তন বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এ মোকদ্দমায় সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ এক প্রকার ছলনা ভিন্ন আর কী হইতে পারে? মোকদ্দমা উত্থাপনের পূর্বেই সুপ্রিম কোর্টের জজ চতুষ্টয়ের সঙ্গে হেষ্টিংসের পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষে তেজ রায়, বাবু হুজুরিমাল, কাশীনাথবাবু, রূপনারায়ণ চৌধুরী, জয়দেব চৌবে, মীর আসাদালী, সেক ইয়ার মাহাম্মদ, সেরালি খাঁ, চৈতাননাথ প্রভৃতি অনেকের জবানবন্দি লওয়া হইয়াছিল। ফরিয়াদির সাক্ষীগণ মধ্যে মনোহর, রামনাথ দাস এবং কৃষ্ণজীবন দাস প্রভৃতিরও জবানবন্দি লওয়া হইল।

উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি হইলে পর, চিফ্ জাষ্টিস ইলাইজা ইম্পি জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রমাণ সমালোচনা করিলেন। প্রমাণ সমালোচনা উপলক্ষে তিনি অতি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে অন্যূন একশত বার বলিয়াছিলেন যে, জুরি মহোদয়গণ যেরূপ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক সাক্ষীর জবানবন্দি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বিচার যাহাতে ন্যায়সঙ্গত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন। 'ন্যায়সঙ্গত ন্যায়সঙ্গত' বলিয়া অন্যূন পঞ্চাশ বার চিৎকার করিলেন। বোলাকীর পালিত পুত্র মৃত পদ্মমোহন নন্দকুমারের সহিত যোগসাজস করিয়াছিল বলিয়া যে অনুমান হয়, তাহাও জুরিদিগের নিকট বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে জুরিগণ পরামর্শ করিবার নিমিত্ত অন্য এক প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে জুরিদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি (foreman) বরিন্‌সন্ সাহেব বলিলেন, যে সমুদয় জুরিদিগের বিবেচনায় মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুত করিবার অভিযোগ সপ্রমাণ হইয়াছে।

'মহারাজ নন্দকুমার অপরাধী।'

জুরিগণ এই মত প্রদান করিবামাত্র সুপ্রিম কোটের জজ চতুষ্টয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইলাইজা ইম্পি মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।

তেতাল্লিশ
গুরু শিষ্য

সুপ্রিম কোর্টের জজেরা মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলে পর, তাঁহার উকিল ফারার সাহেব এই দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার নিমিত্ত জজদিগের নিকট দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জজেরা এই প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন না।

মহারাজ নন্দকুমারের আত্মীয়স্বজন মনে করিয়াছিলেন যে, এই গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা জজেরা কিছুকালের নিমিত স্থগিত রাখিলে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দণ্ডাজ্ঞার প্রত্যাহার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিবেন। কিন্তু হেষ্টিংস এবং সুপ্রিম কোর্টের জজেরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরের মন্ত্রিসভা এ মোকদ্দমার অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই নন্দকুমারকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন; সুতরাং তাঁহাদের সকল চক্রান্ত বিফল হইবে। তাঁহারা এই নিমিত্ত ফাঁসির হুকুম অন্তত কিছুকালের নিমিত্তও স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন না।

অতঃপর দেশীয় সমুদয় তালুকদার জমিদার অন্যূন দশহাজার লোক একত্র হইয়া মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের কথায় জজেরা একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না।

নন্দকুমারের উকিল অবশেষে জুরর (Jurors) দিগের বাড়ি বাড়ি যাইয়া তাঁহাদিগের এই হুকুম কিছুকাল স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত জজদিগকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। কিন্তু এই সকল ইংরাজ জুরুর বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা যখন নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তখন এইরূপ অনুরোধ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে।

দেশের সমুদয় লোক মহারাজ নন্দকুমারের দুরবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলে হেষ্টিংস এবং বারওয়েল দেখিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের উপর দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তখন ইম্পিকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দুই মহাত্মার মনোরঞ্জনার্থ কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করিয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক সংগ্রহ করিলেন।

সেই চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে ভদ্রলোক একজনও ছিল না। কয়েক জন লালবাজারের জুতার দোকানদার, দুইজন বারওয়েল সাহেবের খান্‌সামা, দুইজন হেষ্টিংসের

খানসামা, আর নন্দকুমারের মোকদ্দমার বিচারার্থে যে বারোজন ইংরাজ জুরর মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যের আটজন জুরর; ইঁহারা একত্র হইয়া ইলাইজা ইম্পিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন ! এই অভিনন্দন পত্রে কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং নবকৃষ্ণ প্রভৃতিও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

অভিনন্দন পত্রে লিখিত হইল যে, 'সুপ্রিম কোর্ট ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে কলিকাতার অধিবাসিদিগের মোকদ্দমা বিচার করিবেন বলিয়া প্রথমত আমরা অত্যন্ত ত্রাসিত হইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মোকর্দমার যেরূপ সদ্বিচার হইয়াছে, তাহাতে আমরা এইক্ষণ আশ্বস্ত হইলাম। আর প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পি এবং অপর তিনজন জজ যেরূপ পরিশ্রম করিয়া মোকর্দমার প্রকৃত অবস্থা অবধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে আমরা আপন আপন অন্তরস্থিত সমুদয় কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।'

রাজা নবকৃষ্ণ ইলাইজা ইম্পির হস্তে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলে পর, ইম্পি সমাগত অভিনন্দন প্রদাতাদিগের মধ্যে আটজন জুরর এবং নবকৃষ্ণ, কান্ত পোদ্দার আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভিন্ন আর ভদ্রলোক দেখিতে পাইলেন না। এখন কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কান্ত পোদ্দার এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের অনুগত লোক। তাহাদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন পাইয়াছেন, ইহা প্রকাশ হইলে অভিনন্দনের কোনো মূল্য থাকে না। রাজা নবকৃষ্ণও হেষ্টিংসের অনুগত লোক এবং ফরিয়াদির সাক্ষী ছিলেন। অন্যান্য প্রায় সমুদয় লোকই খানসামা কিম্বা জুতার দোকানদার। অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়া অভিনন্দন পত্র স্বাক্ষরকারী সেই আটজন ইংরাজ জুররকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনাদিগের যত্ন ও পরিশ্রমেই এই মোকদ্দমার সুবিচার হইয়াছে। আপনারা জুরর না থাকিলে এই সকল নাগরী ভাষায় লিখিত খাতা ও কাগজ পত্র আমরা সাম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, অতএব আমার ভ্রাতৃত্রয়ের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ করিতেছি।'

দুই চারি দিনের মধ্যেই অভিনন্দনের গোলযোগ শেষ হইল। নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম আর স্থগিত হইল না। ৫ই আগস্ট মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির দিন ধার্য হইল।

জুন মাসের শেষ ভাগে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। জজদিগের ইচ্ছা ছিল যে জুলাই মাসে তাঁহার ফাঁসি হয়। কিন্তু হেষ্টিংস আর একটি অসদভিপ্রায় সাধনার্থ জজদিগকে ফাঁসির তারিখ একটু বিলম্বে ধার্য করিতে পরামর্শ দিলেন।

হেষ্টিংস মনে করিয়াছিলেন যে ফিলিপ ফ্রান্সিস্, কর্ণেল মন্সন্ এবং জেনারেল ক্লেবারিংএর উত্তেজনায় নন্দকুমার তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, এইরূপ একটা স্বীকার উক্তি নন্দকুমারকে বাধ্য করিয়া বলাইতে পারিলে, একেবারে সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইবেন। এই আশায় তিনি ইম্পির সহিত

পরামর্শ করিয়া নন্দকুমারের ফাঁসির দিন ৫ই আগস্ট ধার্য করাইলেন। কিন্তু নন্দকুমার প্রাণান্তেও সেইরূপ কুকার্য করিতে সম্মত হইলেন না। বরং তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ কর্ণেল মনসন এবং জেনেরল ক্লেবারিংকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে দেশের অত্যাচার নিবারণে পরমেশ্বর তাঁহাদিগের সহায় হউন্।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির দিন ধার্য হইলে পরও প্রত্যহ দেশের শত শত লোক কারাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এখনও কারাগারে নন্দকুমার দরবার করিতে লাগিল। জেলের অধ্যক্ষ মাক্রেবি সাহেব সর্বদা মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

বাপুদেব শাস্ত্রী এখনও কালীঘাটেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার কারারুদ্ধ হইলে পর, মোকদ্দমার বিচারের পূর্বে, তিনি একবার মাত্র কারাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রমদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনি কাশীধামে চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সর্বদা মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি যাইয়া তাঁহার সহধর্মিণী এবং কন্যাগণকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের স্ত্রী বাপুদেবকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বাপুদেবের প্রতি মহারাজ নন্দকুমারের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি ফাঁসির পনের দিবস পূর্বে বাপুদেবকে কারাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। বাপুদেব কারাগারে যাইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি নন্দকুমারকে অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। নন্দকুমারের দুরবস্থা দেখিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন! কারাগারে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে পর উভয়ে নির্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মহারাজ নন্দকুমার বলিলেন, 'গুরুদেব! প্রায় বারো বৎসর অতিবাহিত হইল, আপনার সঙ্গে হলধর তাঁতির নিরাশ্রয় বালকের প্রতিপালন সম্বন্ধে যখন কথাবার্তা হইতেছিল, তখন আপনি বলিয়াছিলেন, নন্দকুমার তোমার ফাঁসির কাষ্ঠ প্রস্তুত হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! জিজ্ঞাসা করি ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা নিহিত ছিল, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন?'

বাপুদেব। বাছা! ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা নিহিত থাকে, তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে না। কিন্তু কর্তব্য প্রতিপালন না করিলে যে মানুষকে এই সংসারেই দণ্ডিত হইতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিশ্বসংসার মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারানুসারে পরিশাসিত হইতেছে। ইলাইজা ইম্পি কিম্বা হেস্টিংসের তোমার একটি কেশ স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। তুমি আপন দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছ।

নন্দকুমার। গুরুদেব! জননীসদৃশ আপনার সহধর্মিণীকে এবং পরম পুণ্যবতী প্রমদাকে

উপহার প্রদানার্থ যে স্বর্ণাভরণ ক্রয় করিয়াছিলাম এবং যে আভরণের মূল্যদ্বারা শত শত দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোককে অন্ন বিতরণ করা হইল, সেই অলঙ্কারই আমার মৃত্যুর কারণ হইল। এখনও আপনি বলিতেছেন, যে, পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারানুসারে বিশ্বসংসার শাসিত হইতেছে? আবার মহম্মদ রেজা খাঁ দেশের সমুদয় চাউল ক্রয় করিয়া গোলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া গেল; কিন্তু তাহার কী বিচার হইল?

বাপুদেব। বাছা! মৃত্যু কি দণ্ড? মৃত্যু অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড কি সংসারে আর কিছুই নাই?

নন্দকুমার। স্বাভাবিক মৃত্যু দণ্ড না হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবিচারে অপমৃত্যু অপেক্ষা আর গুরুতর দণ্ড এ সংসারে কী আছে? বিশেষত জাল দলিল প্রস্তুতকরণের অপরাধে আমার ফাঁসি হইল, এই কলঙ্ক চিরকাল আমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকিবে।

বাপুদেব। মৃত্যু কোনো অবস্থায়ই কষ্টের কারণ নহে। মৃত্যু দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তবে জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছ বলিয়া যে তোমার নাম কলঙ্কিত হইল, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু এ কলঙ্ক তোমার নিজের কুকার্যের অবশ্যম্ভাবী ফল।

নন্দকুমার। আমি এমন কী কুকার্য করিয়াছি? আপনি কি তবে বিশ্বাস করেন যে আমি আমার অনুগত নিরাশ্রয়া বোলাকী দাসের বিধবাকে প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে এই অল্প কয়েকটা টাকার নিমিত্ত তমশুক জাল করিয়াছিলাম? আপনি কি জানেন না যে, গঙ্গাবিষ্ণু, হিঙ্গুলাল এবং মোহনপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া বোলাকীর বিধবা স্ত্রীকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলে, আমি সেই নিরাশ্রয়া বিধবার পক্ষ অলম্বন করিয়াছিলাম? তাহাতেই তো আমার সহিত মোহনপ্রসাদের প্রথম শত্রুতা হয়।

বাপুদেব। বাছা! তুমি যে তমশুক জাল কর নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু মানুষের জীবনের পূর্বকৃত পাপ এবং কর্তব্য লঙ্ঘন ইত্যাদি বিবিধ ঘটনা তাহাদিগকে বিপদের দিকে পরিচালন করে; এবং সেই ঘটনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানুষ বিপদসাগরে নিমগ্ন হয়।

নন্দকুমার। আমি পূর্বে এমন কী পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, কী কর্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছি, যে জনসমাজে আমাকে এইরূপ ঘৃণিত এবং কলঙ্কিত হইতে হইল।

বাপুদেব। কর্তব্য লঙ্ঘনের তো অভাব নাই। দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে, আমরা সকলেই কর্তব্য লঙ্ঘন করিতেছি। কিন্তু তুমি এ জীবনে অনেক পাপানুষ্ঠানও করিয়াছ। তুমি হেষ্টিংসের ন্যায় সর্বদা উৎকোচ গ্রহণ কর নাই? নিজের স্বার্থরক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার কর নাই? তুমি যদি আমার উপদেশানুসারে দেশ প্রচলিত অত্যাচার নিবারণার্থ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইতে তবে একদিকে যেমন তোমার

জীবনের কর্তব্য প্রতিপালন করা হইত, পক্ষান্তরে আবার তোমার পাপানুষ্ঠানে সুযোগ একেবারেই উপস্থিত হইত না। হয়তো সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মুসলমান রাজত্ব বিলোপ করিতেও সমর্থ হইতে।

নন্দকুমার। কিন্তু সংগ্রাম করিলে আমার জয়লাভ হইবে, একথা তো আপনি কখনো বলেন নাই। আপনি সর্বদাই বলিতেন, জয় পরাজয় ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং আমি সে-পথ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলের পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম।

বাপুদেব। জয়লাভের আশা দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তোমাকে সংগ্রাম ক্ষেত্রের প্রেরণ করিলে নিশ্চয়ই তুমি পরাজিত হইতে। মানুষকে আত্মবিস্মৃত হইয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। যে আত্মবিস্মৃত হইতে অসমর্থ, তাহার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তোমার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ তো কখনো পরিলক্ষিত হয় নাই। তুমি সর্বদাই কিরূপে দেওয়ানি লাভ করিবে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছ।

নন্দকুমার। আমি মনে করিয়াছিলাম যে দেওয়ানি পদ লাভ করিয়া দেশের সকল অত্যাচার দূর করিব।

বাপুদেব। আমি সর্বদাই তোমাকে বলিতাম যে দেওয়ানি পদ তোমার লাভ হইলে, তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভবনা নাই। দেশীয় লোকের উপকার করা তো তোমার ইচ্ছা ছিল না। অন্য লোক দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করে, প্রভুত্ব করে, তাহা তোমার সহ্য হইত না। তোমার মনের ভাব ছিল যে, আমি থাকিতে অন্যে কেন ইহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবে? এই তোমার স্বদেশানুরাগ এবং দেশহিতৈষিতা। অথচ মুখে বলিতে যে দেশের অত্যাচার নিবারণার্থ কেবল দেওয়ানি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছ।

নন্দকুমার। দেওয়ানি লাভ করিতে পারিলে, দেশ যাহাতে সুশাসি হইত তাহারও চেষ্টা করিতাম। তবেই দেশের মঙ্গল হইত।

বাপুদেব। দেশ সুশাসন করিবার নিমিত্ত লোক পাইতে কোথায়? এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশ শাসনের ভার তাহাদের হস্তে নিয়াছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি তাহাদিগকে এই শাসন কার্যের সহায়তা করিতেছে। তুমি দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিলেও এই প্রকার লোভ দ্বারাই তোমাকে দেশ শাসন করিতে হইত। এখন যেরূপ অত্যাচার রহিয়াছে, তোমার সুশাসনেও সেই রূপ অত্যাচার প্রচলিত থাকিত। তুমি তখন আবার আত্মসুখে রত হইয়া সমুদয়ই বিস্মৃত হইয়া পড়িতে। প্রজার দুঃখ-কষ্টের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করিতে না।

নন্দকুমার। সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বঙ্গের সুবাদারি লাভ করিলেও তো সেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং কান্ত পোদ্দারের ন্যায় লোকদিগের দ্বারা শাসন কার্য চালাইতে হইত। তবে আপনি যে সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করিতে বলিতেন, তাহাতেও তো কোনো লাভ ছিল না।

বাপুদেব। বাছা! কোনো প্রদেশের বায়ুরাশি দূষিত হইলে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা যদ্রূপ সেই বায়ু পরিষ্কৃত হয়, সেই প্রকার জাতীয় জীবন সংগ্রাম দ্বারাই কেবল সমুন্নত হইতে পারে। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলে, কেহ সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে না। আত্মবিস্মৃতির অভাবে মানব মন ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তার আধার হইয়া পড়ে। এদেশের লোক কেন এই প্রকার নীচাশয় এবং স্বার্থপর হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি নাই। একবার যদি তুমি বঙ্গবাসীদিগকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিচালন করিতে সমর্থ হইতে তবে তাহারা নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ করিতে পারিত। দেশের হিতের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে শিখিত। তবে আর বঙ্গদেশ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং কান্ত পোদ্দারের ন্যায় নীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং সন্তানঘাতক হরিদাস তর্কপঞ্চাননের ন্যায় ধর্মশিক্ষকদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইত না।

নন্দকুমার। তবে আপনি বলিতেছেন যে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইলে দেশের লোকের স্বভাব প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত?

বাপুদেব। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হইত।

নন্দকুমার। তবে এ সকল বিষয় তো পূর্বে আমাকে বুঝাইয়া বলেন নাই।

বাপুদেব। তখন বুঝাইয়া বলিলেও, তুমি কখনো তাহা বুঝিতে না। দেওয়ানি লাভের চিন্তা তোমার অন্তরাতমা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। অন্য কোনো চিন্তা, কি কথা, তোমার মনে প্রবেশ করিত না।

নন্দকুমার। আপনি যে আমাকে বাহুবলে মীরজাফরকে পরাস্ত করিয়া সুবাদারি লাভ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা যে অতি সৎপরামর্শ ছিল এখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আপনি যে বলিতেছেন যে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারানুসারে জগৎ শাসিত হইতেছে, তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য পরমেশ্বর পরম ন্যায়বান। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে অনেক অন্যায়াচরণ হইতেছে।

বাপুদেব। সংসারে যে অনেক অন্যায়াচরণ হয় তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনো ব্যক্তির নিজের পাপ না থাকিলে অন্য কেহ তাহার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারে না। পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই যে সাবিত্রী নাম্নী তাঁতির কন্যাটিকে আমার বাড়ি দেখিয়াছ, ইহার ধর্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত একটা ইংরাজ ইহাকে কাশিমবাজারে নেওয়াইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কী অপূর্ব কৌশল! অকস্মাৎ এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যে, সাহেব আপন কুপ্রবৃত্তি চরতার্থ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল। ঈশ্বরের কৃপার ইহার ধর্ম সংরক্ষিত হইল।

নন্দকুমার। সে তাঁতির কন্যার যে ধর্ম রক্ষা হইল, এ ত একটি ঘটনা মাত্র। কিন্তু জগতের সহস্র সহস্র ঘটনার মধ্যে দেখিতে পাই যে সাধু লোক বিনা অপরাধে কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আপনার ন্যায় পরমধার্মিক লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই। আপনার স্ত্রী পরমাসাধ্বী ছিলেন; অতিশয় পুণ্যবতী ছিলেন। তারপর

প্রমদা নিজেও স্বয়ং ভগবতী হৈমবতী সদৃশী পরমাসাধ্বী এবং পুণ্যবতী। তাঁহাকে কেন বিধবা হইতে হইল? তাঁহার অদৃষ্টে এইরূপ দুরবস্থা কেন ঘটিল?

বাপুদেব। বাছা! প্রমদা বিধবা হইলে পর এই প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হইয়াছিল। আমি অন্যূন দুই তিন মাস এই বিষয় চিন্তা করিয়াছি। আমি এখন নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে ইহার মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে। কিন্তু কী মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহা মনুষ্যের নিশ্চয় অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। তবে অনুমান করিয়া ইহার মধ্যে দুই একটা মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা নির্দেশ করিতে পারি।

নন্দকুমার। আপনি ইহার মধ্যে বিশেষ কি মঙ্গল অভিপ্রায় দর্শন করিয়াছেন?

বাপুদেব। আমি যে মঙ্গল অভিপ্রায় অনুমান করি, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করি না। কারণ অনুমান অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইতে পারে।

নন্দকুমার। এখন আমার নিকট প্রকাশ করিতে কোনো বাধা নাই। আমি তো এ সংসার হইতে চলিয়াছি। আপনার মত ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা প্রকাশিত হইবে না।

বাপুদেব। প্রমদার এই দৃষ্টত বিপদের মধ্যে আমি ঈশ্বরের অনেক মঙ্গল অভিপ্রায় দেখিতে পাই। বাছা! এই সংসার আমাদের চিরকালের আবাস-ভূমি নহে। এ-সংসার মানুষের একমাত্র কার্যক্ষেত্র। আমাদের সম্মুখে অনন্ত জীবন রহিয়াছে। সুতরাং এ-সংসারের ক্ষণস্থায়ী কষ্ট-যন্ত্রণা জ্ঞানী লোকেরা বিপদ বলিয়া মনে করেন না। এইরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রমদার বর্তমান বিপদ যে বড় গুরুতর বিপদ ছিল, তাহা নহে। এতদ্ভিন্ন সংসার কাব্যশূন্য হইলে সংসারের ভোগাসক্ত নর-নারীর হৃদয় একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া পড়ে। প্রমদার বিপদরাশি একটি কবিতাস্বরূপ হইয়া জগতের ভোগাসক্ত নর-নারীর হৃদয় বিগলিত করিবে। পিতৃবৎসল রামচন্দ্রের বনবাস না হইলে, জগৎ একখানি অপূর্ব কাব্য হইতে বঞ্চিত থাকিত। সেই প্রকার প্রমদার দৃষ্টত বিপদরাশি জগতে কাব্য বিতরণ করিতেছে।

নন্দকুমার। এইরূপ বিচারের মধ্যে আমি কোনো ন্যায়পরতা দেখি না। এখন জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রমদাকে এ দুর্বিসহ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে কেন?

বাপুদেব। প্রমদার এই দৃষ্টত বিপদরাশির মধ্যে আমি আরও ঈশ্বরের অনেক মঙ্গল অভিপ্রায় দেখিতে পাই।

নন্দকুমার। আর কী মঙ্গল অভিপ্রায় আছে।

বাপুদেব। বাছা! এই সমুদয়ই অনুমান করিয়া বলিতে হয়। সুতরাং যে বিষয় নিশ্চয় অবধারণ করা যায় না, তাহা কাহারো নিকট বলিতে নাই। ইহাতে ভ্রমাত্মক মত প্রচারিত হইতে পারে। ক্ষুদ্র একটি বৃক্ষপত্রের মধ্যে পরমেশ্বরের যে কত কৌশল রহিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারি না। এখন তাঁহার চক্ষে কি ন্যায়, কি অন্যায়, তাহা কিরূপে অবধারণ করিব। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কিছু শেষ করা যায় না। এই মাত্র আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়। বিপদে সম্পদে সকল অবস্থায় তিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

নন্দকুমার। তবে আমার এই অপমৃত্যুর মধ্যে কি ঈশ্বরের কোনো মঙ্গল অভিপ্রায় আছে?

বাপুদেব। তোমার এই অপমৃত্যুর মধ্যে যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কী অভিপ্রায় আছে তাহা মনুষ্য কখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।

নন্দকুমার। এই ঘটনার মধ্যে কি মঙ্গল অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়া আপনি অনুমান করেন।

বাপুদেব। অনুমান করিয়া কোনো কথা বলিলে তাহা সর্বদা অভ্রান্ত হয় না, কিন্তু কখন কখনো যাহা আমরা অনুমান করি তাহা ঠিকও হয়।

নন্দকুমার। তবে আপনি চিন্তা করিয়া বলুন কী মঙ্গল অভিপ্রায় সম্ভবত ইহার মধ্যে থাকিতে পারে।

বাপুদেব। আমার অনুমান হয় তোমার এই অপমৃত্যু দ্বারা দেশের অত্যাচার অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

নন্দকুমার। এ যে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেন। আমি বাঁচিয়া থাকিলে বরং এই উৎকোচগ্রহী মিথ্যাবাদী ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে দুই একটা অভিযোগ উপস্থিত করিতাম। আমার মৃত্যুর পর আর তো কেহ বাঙ্ নিষ্পত্তিও করিবে না। হেষ্টিংস এবং বারওয়েল দিবারাত্র উৎকোচ গ্রহণ করিবে; লোককে সর্বস্বান্ত করিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিবে। শুনিয়াছি সুপ্রিম কোর্টের জজদিগকে হেষ্টিংস আমার এই মোকদ্দমায় অনেক উৎকোচ দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। সেই সকল টাকা তো এই দেশের লোককে সর্বস্বান্ত করিয়াই সংগ্রহ করিবে। আমার মৃত্যু দ্বারা দেশের যে কোনো উপকার হইবে, তাহা আমি মনে করি না।

বাপুদেব। বাছা! তুমি কার্যজগতের ফলাফলের শৃঙ্খল কিছুই দেখিতেছ না। আমার বোধহয় হেষ্টিংস এবং ইম্পি চক্রান্ত করিয়া তোমার প্রাণবধ করিল বলিয়া, বিলাতে এই বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন হইবে। হয়তো নরহত্যার অপরাধে ইহাদিগেরও বিচার হইতে পারে। ভদ্রসমাজে ইহারা আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। বারওয়েল প্রভৃতি উৎকোচগ্রাহী ইংরাজের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা উপস্থিত হইবে। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সৎলোক প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবে। ইম্পি এবং হেষ্টিংসকে এই ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার। যদি সত্য সত্যই আমার মৃত্যু দ্বারা এই দেশস্থ লোকের উপকার হয়, তবে আমি এখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

বাপুদেব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমার মৃত্যু দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

নন্দকুমার। আপনি আমার মৃত্যুর পূর্বে আর একদিন আমাকে দেখিয়া যাইবেন।

বাপুদেব। ৫ই আগষ্ট তোমার ফাঁসির দিন ধার্য হইয়াছে। ৪ঠা তারিখে পুনরায় আমি এখানে আসিয়া তোমার সহিত শেষবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।

এই বলিয়া বাপুদেব চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কারাগারের দ্বার পর্যন্ত গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

চুয়াল্লিশ
দ্বিতীয়বার গুরু সন্দর্শন

বাপুদেব শাস্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কিছুই মিথ্যা হইল না। কালে তাঁহার বাক্য সকলই পূর্ণ হইল।

এই ঘটনার প্রায় দশ বারো বৎসর পরে মহরাজ নন্দকুমারের হত্যার নিমিত্ত ইলাইজা ইম্পির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে অভিযোগ উপস্থাপিত হইল। এই অভিযোগ উপলক্ষে যদিও ইম্পি দণ্ডিত হইলেন না, তথাপি ভদ্রসমাজে আর তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। তাঁহার নাম আজ পর্যন্তও এতদূর কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে, ইলাইজা ইম্পির পুত্র বারওয়েল ইম্পি স্বীয় পিতার কলঙ্ক নিরাকরণার্থ, ইম্পির মৃত্যুর পরাও অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। থরণ্টন্ সাহেব যখন ইংরাজাধিকৃথ ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছিলেন, তখন ইলাইজা ইমিপর পুতর পরাগুরু বারওয়েল ইম্পি থরণ্টন্ সাহেবকে তাঁহার ইতিহাসে ইম্পির পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু থরণ্টন সাহেব তাহাতে বিশেে মনোযোগ করিলেন না। তৎপর বারওয়েল ইম্পি নিজেই পিতার কলঙ্ক অপনোদনার্থ এক পুস্তক লিখিলেন। কিন্তু অঙ্গার যতই ধৌত করা যায়, ততই আরও কালো রং বাহির হইয়া পড়ে। বারওয়েল ইম্পি কোনো প্রকারেই পিতৃকলঙ্ক দূর করিতে সমর্থ হইলেন না। বরং আরও কিছু কলঙ্ক বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে টমাস্ বেবিংটন মেকলে ইম্পির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে একেবারে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে, ততদিন মেকলের এই কথাটি সভ্যজগতের সম্মুখে জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে—*Impey, sitting as a judge put a man unjustly to death in order to serve a political purpose. No other such judge has dishonoured the English Ermine, since Jefferices drank himself to death in the Tower* — ইম্পি বিচারাসনে বসিয়া অন্যায় পূর্বক একটি নরহত্যা করিয়াছিল। নরপিশাচ জেফরিজের মৃত্যুর পর ইম্পি ভিন্ন অপর কারো দ্বারা বিচারাসন এইরূপ কলঙ্কিত হয় নাই।

হেষ্টিংসকেও অল্প কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। অন্যূন আট বৎসর তাঁহাকে অভিযুক্তের পরিচ্ছদে কাল যাপন করিতে হইল।

বস্তুত নন্দকুমারের মৃত্যু ঘটনা এবং হেষ্টিংসের অন্যান্য কুক্রিয়া সম্বন্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন না হইলে, এই শত বৎসর পরেও ভারতবর্ষে অনেকানেক ইম্পি বিচারাসন কলঙ্কিত করিতেন এবং অনেকানেক হেষ্টিংস বেলবিডিয়ারে বিচারণ করিতেন। কেবল সময়ের উন্নতিতেই দেশের অবস্থার উন্নতি হয় না। সময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মতামতের উন্নতি হইলে, জনসাধারণের সমাজপ্রচলিত পাপ ও কুকার্যের প্রতি ঘৃণার উদয় হইলেই দেশীয় অবস্থার উন্নতি হয়—দেশীয় অবস্থা রূপান্তরিত হয়।

জগদ্বিখ্যাত সদ্বক্তা মহাত্মা এডমাণ্ড বার্কের সুগভীর কণ্ঠধ্বনিতে সমস্ত ইংলণ্ড নিনাদিত হইতে লাগিল। অত্যাচার নিপীড়িত বঙ্গবাসীদিগের দুখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণের হৃদয় বিগলিত হইল। বঙ্গের অত্যাচার নিবারণার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইল।

* * *

৪ঠা আগষ্ট আবার বাপুদেব শাস্ত্রী কারাগারে আসিয়া মহরাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আজ মহরাজ নন্দকুমারকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখা গেল। তাঁহার মৃত্যু দ্বারা যে দেশের লোকের বিশেষ উপকার হইবে, এই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ বর্ষণ করিতে লাগিল।

বাপুদেব গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘গুরুদেব, আমার এই কলঙ্ক কতদিনে অপনোদন হইবে?’

বাপুদেব। বঙ্গবাসীগণ স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা যখন বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন দেশের লোক জানিতে পারিবে যে, তুমি বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলে; তখনই দেশের লোক জানিতে পারিবে যে ইংরাজেরা কৌন্সিল পুস্তকে তোমার বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; তখনই দেশের লোক বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কুচরিত্র ইংরাজদিগের অত্যাচারের অবরোধ করিতে বলিয়াই, তাহারা তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকানেক মিথ্যা অপবাদ লিখিয়া গিয়াছেন।—কিন্তু বঙ্গদেশে তুমি কখনো দেশহিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তোমাকে কনও দেশহিতৈষী বলাও যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে দ্বীর্ঘকাল পর্যন্ত তোমার ন্যায় স্বার্থপর লোক দেশহিতৈষীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দেশহিতৈষী বলিয়া আপন আপন পরিচয় প্রদান করিবে। কিন্তু ভাবী বংশাবলী তাহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারিবে।

এই সকল কথাবার্তার পর মহারাজ নন্দকুমার বাপুদেব শাস্ত্রীর হাতে পারস্য ভাষায় লিখিত দুই খণ্ড কাগজ প্রদান করিয়া বলিলেন, ‘ইহার এক খণ্ড ফিলিপ্, ফ্রান্সিস, সাহেবের নিকট দিবেন, অপর খণ্ড জেনেরল ক্লেবারিংয়ের হস্তে প্রদান করিবেন।’

বাপুদেব শাস্ত্রী সেই কাগজ হস্তে করিয়া নন্দকুমারের নিকট হইতে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন।

হেষ্টিংস এবং সুপ্রিম কোর্টের জজেরা যে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিলেন, তাহাই এই কাগজে লিখিত ছিল। ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এই কাগজ সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে নিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জেনেরল ক্লেবারিং কৌন্সিল গৃহেই এই কাগজ উপস্থিত করিলেন। তখন হেষ্টিংস বলিলেন যে, ইহার এক খণ্ড নকল সুপ্রিম কোর্টের জজদিগকে দিতে হইবে। হেষ্টিংস সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া যেরূপ ভীষণ ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ফিলিপ, ফ্রান্সিস এবং কর্ণেল মনসন্ পর্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে হেষ্টিংস এবং ইম্পির ন্যায় নরপিশাচ, জেনেরল ক্লেবারিং এই পত্র জাল করিয়াছেন বলিয়া দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাঁহাকেও কারাগারে প্রেরণ করিতে পারে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা বলিলেন জজদিগকে এই কাগজের নকল প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ কাগজে জজদিগের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ লিখিত হইয়াছে। অতএব এই কাগজ পুড়াইয়া দিতে হইবে। এই বলিয়া তাঁহার সেই কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস গোপনে তাহার এক খণ্ড নকল ইলাইজা ইম্পির নিকট দিয়াছিলেন।

পঁয়তাল্লিশ
ব্রহ্মহত্যা

৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সায়ংকালে কারাগারের অধ্যক্ষ মাক্রেবী সাহেব বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে কারাগারে প্রবেশ পূর্বক মহারাজ নন্দকুমারের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি যে সংবাদ মহারাজকে জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ হইতে আর বাহির হয় না। তিনি মহারাজের সহিত অন্যান্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার প্রফুল্লমুখে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মহারাজকে মাক্রেবী সাহেব এই প্রকার প্রফুল্লমুখে কথা বলিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করিলেন 'আগামী কল্য যে মহারাজের ফাঁসি হইবে তাহা কি তিনি জানেন না?'

অনেক কথাবার্তার পর মাক্রেবী সজলনয়নে বলিলেন, 'মহারাজ! আমার শেষ সম্মানের চিহ্ন গ্রহণ করুন। আগামী কল্যই আপনাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আপনার কোনো বিষয়ের আবশ্যক হইলে, কিম্বা কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, আমাকে বলিবেন। আমি সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ প্রতিপালনে ত্রুটি করিব না।'

মহারাজ নন্দকুমার বলিলেন, 'আপনার সৌজন্য দর্শনে আপনার নিকট বাধিত হইলাম। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। আপনি ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্, জেনেরল ক্লেবারিং এবং কর্ণেল মন্‌সন্‌কে আমার আশীর্বাদ বলিবেন। তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার গুরুদাসকে রক্ষা করেন।'

এইরূপ কথা বলিবার সময় মহারাজ নন্দকুমারকে কিঞ্চিৎমাত্রও বিমর্ষ দেখা গেল না। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। ইহার কিছুকাল পূর্বেই তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণ রায় বাহাদুর তাঁহার নিকট হইতে এ জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। রায় রাধাচরণ ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন; কিন্তু মহারাজ স্বয়ং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

মাক্রেবী সাহেব চলিয়া গেলে পর, মহরাজ সায়ংকালে সান্ধ্যক্রিয়া সমাপনান্তে অনেক হিসাবপত্র দেখিতে লাগিলেন। রাজা গুরুদাসকে কিরূপে বিষয় কার্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি অনেক বিষয় লিখিয়া রাখিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা অবলোকন করিয়া মাক্রেবী সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন।

রাত্রে তাঁহার বিলক্ষণ নিদ্রা হইল। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বে প্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া

ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ নন্দকুমার সময়ে সময়ে অনেক ধর্ম সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার নিজের রচিত দুই চারিটি পদাবলী এবং দুই একটি সংকীর্তন গাইতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। সহস্র সহস্র লোক কারাগারের দ্বারে আসিয়া সমবেত হইল। ইহাদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের অনেক আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। অনেকেই এখনও বিশ্বাস করে না যে, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবে। অনেকে পরস্পরের নিকট বলিতে লাগিল, 'এও কি সম্ভব! কোম্পানির লোকেরা কি ব্রহ্মহত্যা করিবে?' আবার কেহ কেহ বলিল, 'ফিরিঙ্গির অসাধ্য কিছুই নাই। অর্থলোভে ইহারা স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করিয়াছে।'

বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় জেলের অধ্যক্ষ মাক্রেবী সাহেব আসিয়া মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ বলিলেন, 'আমি নিজে প্রস্তুত হইয়াছি; কিন্তু আমার মৃতশব অপর জাতীয় কোনো লোক স্পর্শ না করে, তজ্জন্য প্রাতে আমি আমার অনুগত তিনজন ব্রাহ্মণকে আসিতে বলিয়াছিলাম। তাঁহারা এখনও আসেন নাই।'

মাক্রেবী বলিলেন, 'আপনি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহাদের নিমিত্ত আমি অপেক্ষা করিব।'

ইহার কিছুকাল পরেই ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজের সেই অনুগত তিনটি বাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দকুমারের পদতলে পড়িয়া তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'প্রভো! আমাদের কি উপায় হইবে?'

মহারাজ নন্দকুমার তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া দিয় বলিলেন, 'তোমাদের কিছু ভাবনা নাই, রাজা গুরুদাস আমার সমুদয় আশ্রিত লোকদিগকে প্রতিপালন করিবেন।'

তৎপরে তিনি পালকীতে আরোহণ করিলেন। যেস্থানে ফাঁসির কাষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছিল, বেহারাগণ তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া চলিল। খিদিরপুরের পুলের উত্তর পূর্বদিকের যে স্থানটিকে এখন কুলিবাজার বলে, সেই স্থানে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। মাক্রেবী সাহেব অন্য এক পালকীতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ফাঁসির কাষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় পাঁচ হাজার লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সময় কলিকাতা অতি ক্ষুদ্র শহর ছিল। কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা দশ হাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় ছয় সাত হাজার লোকই নন্দকুমারের ফাঁসির স্থানে উপস্থিত ছিল।

এই উপস্থিত লোকদিগের ক্রন্দন এবং হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মাক্রেবী সাহেব প্রভৃতি সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার এখনও প্রফুল্ল বদনে বসিয়া আছেন।

পালকী হইতে উঠিয়াই আবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুগত

যে তিনজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মৃতশব লইয়া যাইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া আবার কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

মাক্রেবী সাহেব বলিলেন, 'আপনার কোনো চিন্তা নাই। তাঁহারা আসিয়া না পৌঁছিলে আমরা কিছু করিব না।'

লোকারণ্যের মধ্য হইতে অনেক কষ্টে সেই তিনজন লোক আসিয়া মাক্রেবী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মাক্রেবী সাহেব অন্যান্য লোককে সরিয়া যাইতে বলিলেন। মাক্রেবী মনে করিয়াছিলেন যে, মহারাজ ইঁহাদিগের নিকট গোপনে কোনো কথা বলিবেন। কিন্তু নন্দকুমার মাক্রেবীকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবার কোনো প্রয়োজন নাই।'

তৎপর মহারাজ পালকী হইতে উঠিয়া ফাঁসির কাষ্ঠের নিকট আসিলেন। কেহ না বলিতেই হস্ত দুইখানি নিজেই পৃষ্ঠের দিকে রাখিলেন এবং তাঁহার অনুগত একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হস্ত বন্ধন করিলেন।

ফাঁসির কাষ্ঠে আরোহণ করিলে পর, মাক্রেবী বলিলেন, 'আপনি যখন নিজে ইশারা করিবেন তখনই গলদেশে রজ্জু দেওয়াযাইবে।'

মহারাজ কিছুকাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত বান্ধা ছিল। দুই তিন মিনিট পরে তিনি পদ দ্বারা ইশারা করিলেন। মুখাবৃত করিবার সময় মাক্রেবী সাহেব একজন ক্ষত্রিয় সৈনিক পুরুষকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ। এই ব্যক্তি আপনার মুখাবৃত করিবে।'

তিনি বলিলেন, 'আমার নিজের লোক এখানে আছে।' পরে তাঁহার নিজের সেই অনুগত ব্রাহ্মণ বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিল। তাঁহার গলে রজ্জু দিয়া পদতলের কাষ্ঠখানি নিক্ষেপ করিবামাত্র দর্শকদিগের মধ্যে ঘোর আর্তনাদের কোলাহল উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল! 'ব্রহ্মহত্যা হইল'— 'ব্রহ্মহত্যা হইল'—'কলিকাতা অপবিত্র হইল'—'দেশ পাপে পূর্ণ হইল'—'ফিরিঙ্গির ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই'—এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লোক সকল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

ভদ্রলোকেরা সেদিন আর কলিকাতায় আহার করিলেন না। সকলেই গঙ্গা পার হইয়া হাবড়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইহার পরদিন কলিকাতার অনেকানেক ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রলোক কলিকাতায় বাড়িঘর পরিত্যাগ পূর্বক অপর পারে গৃহ নির্মাণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মহত্যা দ্বারা কলিকাতা অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন।

এদিকে ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতি মফস্বলে এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র দেশ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। মহারাজ নন্দকুমার প্রকৃত দেশহিতৈষী না হইলেও দেশের অনেক লোক তাঁহাকে পরোপকারী ধার্মিক লোক বলিয়া জানিত।

উপসংহার

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কয়েকদিন পরে সুপ্রিম কোর্টের জজেরা কামালদ্দিন আলি খাঁর উত্থাপিত প্রথম অভিযোগের বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মোকদ্দমায় মহারাজ নন্দকুমার, ফাউক সাহেব এবং রায় রাধাচরণ তিনজন আসামী ছিলেন। কিন্তু নন্দকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাধাচরণের উপর সুপ্রিম কোর্টের এলেকা আছে কি না তৎসম্বন্ধে অনেক তর্ক উপস্থিত হইল। ফাউক সাহেবের বিচার আরম্ভ হইলে, তাঁহার একজন আত্মীয় বারওয়েল সাহেবকে ভয় প্রদর্শন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফাউক সাহেবের এই মোকদ্দমায় কোনো দণ্ড হইলে, তিনি বারওয়েল সাহেবের সমুদয় কুক্রিয়া প্রকাশ করিয়া দিবেন। বারওয়েল ইহাতে ভীত হইয়া সুপ্রিম কোর্টের জজদিগকে ফাউক সাহেবকে অতি লঘু দণ্ড প্রদান করিতে লিখিলেন। জজেরা ফাউক সাহেবকে কয়েক টাকা মাত্র জরিমানা করিলেন।

বাপুদেব শাস্ত্রী কালীঘাট পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিলেন। মদন দত্ত ইতিপূর্বে তাহার কন্যাদ্বয়কে কলিকাতাস্থ দুইটি সুবর্ণ বণিকের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল। বাপুদেব তাঁহার কালীঘাটের গৃহখানি সাবিত্রীর স্বামীকে এবং মদন দত্তকে প্রদান করিলেন। তিনি কাশীধামে যাত্রা করিবার সময় সাবিত্রী, জগদম্বা এবং অহল্যা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার চরণে প্রণামপূর্বক বলিল, ‘প্রভো! আপনাকে আমরা স্বয়ং ভগবান বলিয়া মনে করি, আমাদিগকে বর প্রদান করুন যে, আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে যেন আর তাঁতির ব্যবসা কিম্বা সুবর্ণ বণিকের ব্যবসা করিতে না হয়। তাঁতি এবং সুবর্ণ বণিকের প্রতি যে গোর অত্যাচার হইয়াছে তাহা মনে হইলেও শরীর কাঁপিয়া উঠে।’

বাপুদেব আশীর্বাদপূর্বক বলিলেন, ‘তন্তুবায় এবং সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারে অত্যন্ত নিপীড়িত হইতে হইয়াছে, পরমেশ্বর করুন ভবিষ্যতে যেন তাঁতি এবং সুবর্ণ বণিক বংশোদ্ভব লোকেরা রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।’

বর্তমান সময়ে সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায় এবং তেলি নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে অনেকেই ডেপুটি মাজিস্ট্রেট, সবজজ হইয়াছেন। অনেকানেক লোক রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বোধহয় বাপুদেবের আশীর্বাদেই ইঁহারা এই প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তন্তুবায়দিগের মধ্যে অনেকেই সাবিত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের বংশোদ্ভব,

আর অনেকানেক সুবর্ণ বণিক জগদম্বা এবং অহল্যার গর্ভজাত সন্তানগণের বংশবলী বলিয়া অনুমান হয়।

রামা তাঁতিও বিবাহ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিল। সাবিত্রীর ভ্রাতা কালাচাঁদ সাবিত্রীর অনুরোধে পুনর্বার বিবাহ করিল।

হরিদাস তর্কপঞ্চানন বার্ধক্য প্রযুক্ত অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ইঁহাকে বৃদ্ধকালে অনেক কষ্টে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল।

বাপুদেব কালীঘাট হইতে বিদায় হইয়া নবকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শোভাবাজারে আসিলেন। নবকিশোর শোভাবাজারের নিকটবর্তী কোনো স্থানে বাস করিতেন। নন্দকুমারের মোকদ্দমার সময় বাপুদেবের সহিত নবকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। নবকিশোর পূর্ব হইতেই বাপুদেবকে চিনিতেন। কিন্তু বাপুদেব পূর্বে তাঁহাকে চিনিতেন না।

নবকিশোরের মুখে তাঁহার মাতার মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করিয়া বাপুদেব বলিলেন, 'বাছা! আমাদের দেশ প্রচলিত জাতিভেদ এবং জাত্যাভিমান বিবিধ অমঙ্গল এবং যন্ত্রণার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাসুদেব শাস্ত্রী শাক্ত হইয়াও চৈতন্যের মত যাহাতে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এও কি অল্প দুঃখের বিষয় যে তোমার জননী একজন পরমা সাধ্বী ব্রাহ্মণ কন্যা; তাঁহার স্পৃষ্ট জল বাগ্দীর গৃহের দাসী অপবিত্র বলিয়া মনে করিল।'

নবকিশোর বলিলেন, 'সে বাগ্দীর গৃহের দাসী নহে। সে জগন্নাথ বিশ্বাসের ঘরের দাসী ছিল। জগন্নাথ বিশ্বাস শূদ্র।'

বাপুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'বাছা! জগন্নাথ বিশ্বাস শূদ্র নহে। জগন্নাথ এবং ছিদামের পিতার নাম নিতাই বাগ্দী ছিল। ইহাদের মাতার নাম রাইমণি। নিতাইর বাড়ি ত্রিবেণীতে ছিল। সে একটা ছাগল চুরি করিয়াছিল বলিয়া, হুগলির ফৌজদারের লোক তাহাকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিল। রাইমণি আপন শিশু সন্তান দুইটিকে লইয়া ত্রিবেণীতেই জগন্নাথ বাচস্পতির বাড়ির নিকট বাস করিতেছিল। তোমার ভগ্নীপতি শিবদাস রাইমণিকে কুপথগামিনী করিল। পরে শিবদাসের কুকার্য প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলে, শিবদাস এবং হরিদাস তর্কপঞ্চানন একত্র হইয়া রাইমণিকে বিষপ্রদান করিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিলেন। বালক দুইটি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। শিবদাস এবং হরিদাস আমার সঙ্গে এক টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, আমি আমার প্রজা কৃপারামের মাকে এই বালক দুইটিকে প্রতিপালন করিতে বলিলাম। কৃপারামের মা লোকের নিকট শূদ্র বলিয়া ইহাদিগের পরিচয় প্রদান করিত। সেই হইতেই ইহারা শূদ্র হইয়াছে।'

নবকিশোর এই কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য হইলেন। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুকালে যে জন্য 'রাইমণি—রাইমণি' বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিলেন।

বাপুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের দেশের এই জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন প্রকৃত ইতিহাসেরও অভাব দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীস্থ লোক যখন সমুন্নত হইয়া কোনো প্রদেশের রাজা কিম্বা প্রধান লোক হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহারা আপন আপন পূর্বপুরুষের নাম ধাম গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কখনো তাহাদের পূর্বপুরুষের জন্ম এবং উন্নতির সঙ্গে কোনো অলৌকিক কিম্বা ঐশ্বরিক ঘটনা সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।* কিন্তু যে জাতীয় লোকের ইতিহাস নাই তাহাদের জাতীয় জীবনও নাই। বাছা নবকিশোর ! তোমাকে আমি একটি অনুরোধ করিতেছি—তুমি আমার শিষ্য নন্দকুমারের জীবনের ইতিহাস লিখিয়া রাখিবে। ইংরাজেরা তাহাদের সেরেস্তার কাগজপত্রে নন্দকুমারকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত বলিয়া সময়ে সময়ে লিখিয়া রাখিয়াছে। নন্দকুমার ইংরাজদিগের অত্যাচারের অবরোধ করিতেন বলিয়া তাহারা ইচ্ছাপূর্বক এই সকলমিথ্যা কথা লিখিয়াছে।** ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকদিগের ন্যায় মিথ্যাবাদী লোক ভূমণ্ডলে আছে কিনা সন্দেহ। ইহাদিগের প্রধান গবর্ণর ক্লাইব সাহেব এক দলিল জাল করিয়া উমিচাঁদকে প্রতারণা করিয়াছিল। কেবল ইহাদিগের সেরেস্তার খাতাপত্র দেখিয়া ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে তাহাতে ভুল থাকিবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণ করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে।

এই বলিয়া বাপুদেব শাস্ত্রী নবকিশোরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাশীধামে রওনা হইলেন।

নবকিশোর শতবর্ষ পূর্বের অনেক অবস্থা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক দৃষ্টেই মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা বিরচিত হইবে।

---

* The story or legend about the origin of Bishnupore Raj family will prove this fact.

** Vide note (26) in the appendix.

APPENDIX

KEY TO MAHARAJAH NANDAKUMAR

NOTE 1

After the defeat of Serajal Dowlah, in 1756, the new Nabab was made to engage, 'that he or his officers should, on no account interfere with the Gomastas of the English, but that care should be taken that their business might not be obstructed in anyway. And these Gamastas so well availed themselves of this new acquired power, that after the company, had made their first Nabab, Jaffer Ally Khan, in the year 1757, their black Gomastas in every District assumed a jurisdiction which even the authority of Rajas and Zemindars in the country durst not withstand. Instances of this influence, so detrimental to the country, are to be met with in every page of Mr. Vansittart's Narrative.

–Bolts on India affairs, page 191.

NOTE 2

His (Clive's) family expected nothing good from such slender parts and such a head-strong temper. It is not strange therefore, that they gladly accepted for him, whên he was in his eighteenth year, a writer-ship in the service of the East India Company and shipped him off to make a fortune or to die of a fever at Madras. *–Lord Macaulay.*

Clive was a man to whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang. *–James Mill.*

Whether the young adventurer, (Hastings) when once shipped off, made a fortune or died of a liver complaint, he equally ceased to be a burden to any body. *– Macaulay on Hastings.*

NOTE 3

'But for the better understanding of the nature of these oppression, it may not be improper to explain the methods of providing an investment of piece goods, se either by the Export-warehouse keeper and the Company's servants at the subordinate factories, or by English gentle men in the service of the Company, as their own private

ventures. In either case, factors, of agents called Gomatas are engaged at monthly wages by the gentlemen's Banyen ; there being generally, on each expedition into the countty, one head Gomasta, one Mohuree or clerk, and one cashkeeper appointed with some peons and hircarahs; the latter being for the purpose of intelligence, or carrying letters to and fro, which, for want of regular posts, every merchants does at his own expense. These are despatched, with a Perwanah from the Governor of Calcutta, to the Zemindar of the districts where the purchases are intended to be made, directing him not to impede their business, but to give them every assistance in his power.

Upon the Gomasta's arrival at the Aurung, or manufacturing town, he fixes upon a habitation which he calls his Cutchery; to which, by his peons and hircarahs he summons... the weavers; whom, after receipt of the money despatched by his masters, he makes to sign a bond for the delivery of a certain quantity of goods, at a certain time and price, and pays them a part of the money in advance. The assent of the poor weaver is in general not deemed necessary, for the Gomastas, when employed in the Company's investment, frequently make them sign what they please, and upon the weavers refusing to take the money offered, it has been known they have had it tied in their girdles, and they have been sent away with a flogging.

A number of these weavers are generally also registered in the books of the Company's Gomastas, and not premitted to work for any others; being transferred from one to another as so many slaves subject to the tyranny and roguery of every succeeding Gomasta.

The cloth, when made, is collected in a ware-house for the purpose called a Khattab; where it is kept marked with the weavers name, till it is convenient for the Gomasta to hold a Khattab, for fixing the price of each piece. ...

The roguery practised in this department is beyond imagination, but all terminates in the defrauding of the poor weaver; for the prices which the Company's Gomastas... fix upon the goods, are in all places at least fifteen per cent, and in some even forty percent, less than the goods so manufactured would sell for in the public bazar, or market, upon a free sale. The weaver therefore, desirous of obtaining the just price of his labour frequently attempts to sell his cloth privately to others, particularly to the Dutch and French Gomastas, who are always

ready to receive it. The occasions the English Company's Gomasta to set his peons over the weaver to watch him, and not unfrequently to cut the piece out of the loom when nearly finished. With this power and influence, and Gomastas, in the meantime, are never deficient in providing as many gooods as they can on their own accounts, and for the Banyans of their English employers,...

In the time of the Mogul Government and even in that of the Nabab Aliverdy Khan, the weavers manufactured their goods freely, and without oppression.

–Bolts on India affairs, pages 192-94.

NOTE 4

With every species of monopoly, therefore, every kind of oppression . . . has daily increased; in so much that weavers, for daring to sell their goods (to other people, and Dullals or Pykars for having contributed to or connived at such sales, have, by the Company's agent, been frequently seized and imprisoned, confined in irons, fined considerable sums of money, flogged, and deprived, in the most ignominious manner, of what they esteem most valuable, their caste.

Weavers also upon their inability to perform such agreements as have been forced from them by the Company's agents, universally known in Bengal by the name of Mutchulkas, have had their goods seized, and sold on the spot to make good the deficiency

–Bolts on India affairs, page 194.

NOTE 5

Eight members of the Council, Messrs. Johnstone, Watts, Marriot, Hay, Cartier, Billers, Batson and Amyatt recorded their opinion, that a regard for the interests of their employers compelled them to call upon the Nabab to revoke his determination to relieve the inland trade of his dominions from duties, and to require him, while suffering the servants of the Company to trade on their own account without charge, to tax the trade of his own subjects for their benefit. Selfishness has rarely ventured to display itself under so thin a veil as was believed sufficient on this occasion to disguise it.

–Thornton's History of British Empire in India, Vol. I., page 439.

NOTES 6

The trading therefore in salt, beetle and tobacco, having been one cause of the present disputes. I hope these articles will be restored to the Nabab, and your servants absolutely forbidden to trade in them. This will be striking at the root of the evil.

As a means to alleviate, in some measure, the dissatisfaction that such restrictions upon the commercial advantages of your servants may occasion in them, it is my full intention not to engage in any kind of trade myself.

–Extract from Olive's letter, dated Berkeley Square, the 27th April 1764.

NOTE 7

You are hareby ordered and directed, as soon after the receipt of this as may be convenient, to consult the Nabab as to the manner of carrying on the inland trade in salt, bettle-nut and tobacco. ...

You are therefore to form a proper and equitable plan for carrying on the said trade and transmit the same to us. ...In doing this as before observed you are to have a particular regard to the interest and entire satisfaction of Nabab. In short this plan must be settled *with his free-will and consent.*

–Extract from the Court of Directors letter 1st June 1764.

NOTE 8

AT A SELECT COMMITTEE, HELD
AT FORT WILLIAM
The 10th August 1866.
PRESENT :
William Brightwell Sumner, Esq.–*President.*
Harry Verelst, Esq.

In conformity to the Honourable Company's order, contained in their letter of the 1st June, 1764, the committee now proceed to take under their consideration the subject of the inland trade in the articles of salt, beetlenut and tobacco, the same having frequently been discoursed of at former meetings, and Mr. Sumner having lately collected the opinions of the absent members at large on every circumstance, it

is now agreed and resolved: That the following plan for conducting this trade shall be carried into execution, the committee esteeming the same the most correspondent to the Company's order and conducive to the ends which they have in view, when they require that the trade should be put upon such a footing as may appear most equitable for the benefit of their servants, least liable to produce disputes with the country Government; and wherein their own interests and that of the Nabab shall at the same time be properly attended to and considered.

Firstly. – That the whole trade shall be carried on by an exclusive Company formed for that purpose, and consisting of all those who may be deemed justly entitled to a share.

Secondly. – That the salt, beetle-nut and tobacco produced in or imported into Bengal, shall be purchased by this established company, and public advertisement shall be issued strictly prohibiting all other persons whatsoever, ... to deal in those article.

Thirdly. – That application shall be made to the Nabab to issue the like prohibition to all his officers and subjects of the Districts where any quantity of either of these articles is manufactured or producted.

Fourthly. –That the salt shall be purchased by contract on the most reasonable terms.

Ninthly. – ... That application be made to the Nabab for Perwanahs on the several zemindars of those Districts. . . . Strictly ordering and requiring them to contract for all the salts that can be made on their lands, with the *English alone*, and forbidding the sale to any other person or persons whatsoever,

Tenthly. – That the Honourable Company shall either share in this trade as duty upon it. proprietors, or receive an annual duty upon it.

Eleventhly. – That the Nabab shall in like manner be considered as may be judged most proper, either as a proprietor, or by an annual Nuzzeranah to be computed upon inspecting a statement of his duties on salt in former years. *–Bolts on India affairs, pages 166 to 168.*

NOTE 9

Translation of the Purwannah issued by Nabab on the requisition of the English trading Company.

To the Gomasta of Lukminarain Chowdry of the Pergunnah of Jollamootha.

Be it understood, that a request has been made by the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, to this purport, that until the contracts for salt of the said gentlemen are settled, so salt shall be made, or got ready in any District, that a Gomasta be sent to attend on the said gentlemen, and having given a bond, he may then proceed to his business, and make salt, but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, they should make none.

Therefore, this order is written, that you send, without delay, your Gomasta to the said gentlemen in Calcutta, and give your bond, and settle your business; and then proceed to the making of salt. In case of any delay, it will not be for your good. Regard this as a strict order.

– Bolts on India affairs, page 176.

FORM OF MUTCHLKA.

I Jaduram Chowdry of the Pergunnah of Deroodumna, in the District of Ingellee, agreeable to an order which has issued from the Nabab to this purpose, 'that I should attend upon the Gentlemen of the Committee and Council, in order to settle my trade in salt, and that I should not deal with any other person; do accordingly oblige myself, and give this writing, that, except the said gentlemen called : '*The English society of merchants for buying and selling all the salt, beetle-nut and tobacco in the Pravinces of Bengal, Behar and Orissa, do*. I will on no account trade with any other person for the salt to be made in the year 1173; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; but whatever salt shall be made within the dependencies of my zemindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society, and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing, and I will deliver the whole and entire quantity of the salt produced, and without the leave of the said Committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five rupees per every maund.

– Bolts on India affairs, page 177.

NOTE 10

AT A SELECT COMMITTEE, HELD AT FORT WILLIAM.

The 18th September 1765.

PRESENT :

The Right Hon'ble Lord Clive.–President.
William Brightwell Sumner Esq., Jonh Carnac Esq.
Harry Verelst Esq, Francis Sykes Esq.

Resuming the consideration of the plan for carrying on the inland trade, in order to determine with respect to the Company and the classes of proprietors, the Committee are unanimously of opinion, that whatever surplus-monies the Company may find themselves possessed of after discharging their several demands at this Presidency, the same will be employed more to their benefit and advantage in supplying largely, that valuable branch of their commerce, the China trade, and in assisting the wants of their other settlements, and that it will be more for their interest to be considered as superiors of this trade, and receive a handsome duty upon it, than to be engaged as proprietors in the stock.

Bestowing therefore, all due attention to be circumstance of the Company's being at the same the head and masters of our service, and now come into the place of the country-government by His Majesty's Royal Grant of the Dewani, it is agreed, that the inland trade of the above articles shall be subject to a duty to the Company, after the following rates, which are calculated acccoding to the best judgment we can form of the value of the trade in general, and the advantage which may be expected to accure from it to the proprietors.

On salt, thirty-five percent, valuing hundred maunds at the rate of ninety arcot rupees. . . . With respect to the proprietors it is agreed and resolved, that they shall be arranged into three classes; the each class shall be entitled to so many shares in the stock. ...

According to this scheme it is agreed, that class the first shall consist of the Governor, five shares, the second, three shares; the General, three shares, ten gentlemen of the Council, each two thares, . . . two colonels each two shares . . . in all thirty-five shares for the

first class.

That class second shall consist of one chaplain, fourteen junior merchants, and three Lieutenant-Colonels, in all eighteen persons, who shall each be entitled to one-third of a Councillor's proportion, or two-thirds of a share...

That class third shall consist of thirteen factors, four Majors, four first Surgeons at the Presidency, two first Surgeons at the army, one Secretary to the Council, one sub-accountant, one Persian translator, &c. . . . ` *–Bolts on India affairs, p. 171-72.*

The Trading Company used to pay 75 rupees per hundred maunds, whereas they began to sell at 500 rupees per hundred maunds to the native merchants.

NOTE 11

The chaplain was a second class sharer in the profit of this oppressive salt monopoly as it will appear form the note 10.

NOTE 12

Upon the establishment of the private co-partnership, or society, of the gentlemen of the committee among themselves, there was an Armenian merchant, named Parseek Aratoon, who had about 20,000 maunds of salt lying in ware-houses, upon the borders of the Rungpoor and Dinagepore Provinces.

The Armenian, sensible, as well as the gentlemen of the committee, that the price of salt would rise, ordered his Gomasta to fasten up his ware-houses, and not to sell. As the retailing of this salt in those parts might hurt the partnership sales, it was thought expedient at any rate, it possible, to get possession of it. Upon failure of the artifices which were practised to induce the Gomasta to sell it, the Armenian marchent's ware-house were broken open, the salt forcibly taken out and weighted off, and a sum of money, estimated to be the price of it, was forced upon the Armenian Gomasta, on his refusing to receive it

–Bolts on India affairs, p. 185-86.

NOTE 13

The winders of raw silk, called Nagaads, have been treated also with such injustice, that instances have been known of their cutting off their thumbs, to prevent their being forced to wind silk.

These workmen were pursued with such rigour during Lord Clive's late Government in Bengal, from a zeal for increasing the Company's investment of raw silk, that the most sacred laws of Society were atrociously violated; for it was a common think for the Company's Sepoys to be sent by force of arms, to break open the houses of the Armenian Merchants, established at Sydabad, and forcibly take the Nagaads from their work, and carry them away to the English Factory.

–Bolts on India affairs, p. 195.

NOTE 14

Mr. William Bolts– who is called by Dr. Hunter 'notorious Bolt is said to have amassed nine lacs of rupees duriag his three years' stay at Kasim Bazar.

He was shipped off to England under custody by Goversnor Verelst for his alleged swindling habit.

NOTE 15

Vide the Pawannah issued upon Lackmi Narayan Chowdry of jolla Mutha Pergunnah in note (9).

NOTE 16

In 1763 a consternation of a different kind and from a different source threatened Mr. Kiernander's little charge again. The abuse of the transit duties by the Company's servants, their grasping cupidity and oppressive exaction, fastened on the people with a power from which they had no escape, threw the whole country into disorder ...

Mr. Kiernander, in speaking of these things to the Society adds, that he feared the mission would be destroyed. Not only did he find these contentions unfavourable to the exercise of Christain liberality among his fellow Europeans, but the natives were so exasperated against the company's servants for their evil practices, that the missionary found them utterly unwilling to lend an ear to truths, which his fellew Christain heeded so little.

He is not the only missionary who has found the sins of Europeans, a powerful barrier against the progress of the Gospel, and has had those sins retorted on him by natives as an excuse and colour for their own. *–Calcutta Review, January 1847.*

NOTE 17

There is a tradition that Nabab Alliverdi Khan was being guided by the advices of a Hindu astrologer who was an old Brahmin. Alliverdi also treated the Begums of his predecessor with respect and kindness as it appears from Siyar-ul-Mutakherin in which it is said: 'On advancing to the place, and before taking his seat, he struck off to the right, and went to the apartments where Zineten-nissa Begum, daughter of Jafar Khan, and mother to the late Serefraz Khan, resided. He stoped at the gate, and assumed a respectfull posture, and in a moving tone of voice, having first made a profound bow, he supplicated her forgiveness, and sent in the following message.'

'Whatever was predestined in the book of fate has came to pass and the ingratitude of this worthless servant is now registered in the unfading records of history. Eut I swear, that so long as life exists, I shall never swerve from the path of respect and the duties of the most complete submission to Your Highness; and I hope that the guilt of this poor humbled and afflicted slave may in time be effaced from your memory. *–Siyar-ul-Mutakherin, p. 462.*

NOTE 18

Mr. Henry Beveridge in his most impartial as well as a very clever article on 'Warren Hastings in Lower Bengal' observes. 'Whether justly or not, it seems evident that Hastings nourished strong resentment against Nanda Kumar. In a letter of November 1558, he writes that the Nabab is greatly enraged against Nanda Kumar, and adds that he thinks he would be wanting in his duty if he did not acquaint Clive with the Nabab's sentiments. *–Calcutta Review, October 1877.*

NOTE 19

There is a tradition that the jewels, which were alleged to have been deposited by Maharajah Nanda Kumar with Bolaki Das, and for the value of which, Bolaki Das executed to him a bond, which was ultimately declared to be a forged document, were purchased by the Maharajah for one of his nearest female relations who had become widow before the jewels were presented to her.

NOTE 20

The servants of the Company obtained not for their employers but for themselves, a monopoly of almost the whole internal trade. They forced the natives to buy dear and to sell cheap. They insulted with impunity the tribunals, the police, and the fiscal authorities of the country. They covered with their protection a set of native dependents who ranged through the provinces spreading desolation and terror wherever they appeared.

Enormous fortune were thus rapidly accumulated at Calcutta, while thirty millions of human beings were reduced to the extremity of wretchedness. *They had been accustomed to live under tyranny, but never sunder tyranny like this-Lark Macaulay*.

NOTE 21

In consequence of most extraodinary oppression in the inland parts of the country ... an Armenian merchant named Parseek Arratoon, on the 15th September 1767, filed a bill in the Mayor's Court against the Gomastas or agents of Governor Harry Verelst and Francis Sykes Esqs, for 60,432 current rupees, or about 7,500 pounds sterling, principal amount of salt, aid to have been forcibly taken out of the plaintiffs ware-houses. The cause was brought to an issue and in the month of August 1768, on a day appointed for the hearing, all the proceedings and depositions were read and fully considered; the demand of the plaintiff established to all appearance, and judgment upon the point of being pronounced, when the Mayor, (Cornelius Goodwin) while sitting in judgment, received a private letter or note, sent from the Governor, to put a stop to the proceedings, because, as was alleged, he, the said Governor, was partly concerned in the cause, and was in expectation of settling matters by a private compromise. To the astonishment of the plaintiff's solicitor, who declared he knew of no compromise, and had received no instructions from his client upon this matter, the request contained in the letter or note was complied with, and a stop was at once put to the proceeding; the plaintiff being left without any satisfaction.

–Bolts on India affairs, p. 91-92.

NOTE 22

Something more remains to be told. Shameful frauds appear to have been practised during the famine by persons in office. They

were known to have dealt in again, imported for the supply of the famishing multitude, to have made false returns of its distribution, and to have appropriated the exorbitant price it brought. The Council tried to throw the blame upon the subordinates who were natives. The Directors refused to be thus duped, said plainly that they believed the guilt lay at the door of their own countrymen high in office, and called for the disclosure of their names; but the names were never audibly disclosed. One who held an important place at the time, returned to his own country, a wealthy man, founded a family, since ennobled, and amid 'honour, love, obedience, troops of friends' lay down to spend the evenings of his days in peace. But that best of blessings was denied him. His nights were haunted by images and sounds which would not let him sleep; and though a man of what is called iron frame and of ready courage, to his dying hour he never would allow the lights to be extinguished round his bed.

–W. M. Tarrens' Empire in Asia, p. 77.

NOTE 23

The Dacca merchants begin by complaining, that in November, 1773, Mr. Richard Barwell, then chief of Dacca, had deprived them of their employment and means of subsistence; that he had extorted from them 44,224 Arcot rupees (4,731) by the terror of his threats, by long imprisonment, and cruel confinement in the stocks; that afterwards they were confined in a small room near the factory gate, under a guard of Sepoys; that their food was stopped, and they remained starving a whole day; that they were not permitted to take their food till next day at noon, and were again brought back to the same confine-ment, in which they were continued for six days, and were not set at liberty until they have given Mr. Barwells' Banyan a certificate for forty thousand rupees; that in July, 1774, when Mr. Barwell had left Dacca they went to Calcutta to seek justice; that Mr. Barwell confined them in his house at Calcutta, and sent them back under a guard of peons to Dacca.

–Edmund Burkes, vol. iv. p. 80

NOTE 24

In March 1775, a petition was presented to the Governor-General and Council by a person called Coja Kaworke, an Armenian merchant,

resident at Dacca of which division Mr. Barwell had lately been chief), setting forth in substance that, in *November*, 1772, the petitioner had farmed a certain salt district, called Savagepur (Shabazepur) and had entered in a contract with the committee of circuit providing and delivering to the India Company the salt produced in that District; that in 1773 he farmed another, called Selimabad, on similar conditions. He alleges, that in February, 1774, when Mr. Barwell arrived at Dacca, he charged the petitioner with 1,25,500 rupees (equal to 13,000) as a contribution; and in order to levy it, did the same year deduct 20,799 rupees from the amount of the advance money, which was ordered to be paid to the petitioner; on account of the India Company, for the provision of salt in the two forms; and, after doing so, complled the petitioner to execute and give him four different bonds for 77,627 rupees, in the name of one *Porran Paul,* for the remainder of such contribution, or unjust profit. *–Burke's Work, vol. iv. page 110.*

The facts stated, or admitted, by Mr. Barwell are as follow: fhat the salt farms of Selimabad and Savagepur were his, and re-let by him to the two Armenian merchants, Michael and Kaworke on condition of their paying him 1,25,000 rupees, exclusive of their engagements to the Company; that the engagement was written in the name of *Bussant Roy and Kissen Deb Singh*; and Mr. Barwell says, that the reason of its being "in these people's names was becuse *it was not thought consistent with the public Regulations that the names of any Europeans should appear.*

–Burke's Work, vol. IV, page 112

NOTE 25

The author of Siyaral Mutakherin, Gollam Hossin Khan, was a deadly enemy of Maharajah Nanda Kumar, He alone says that a casket of seals, bearing the names of different persons, were found in the house of the Maharjah, afer his death. This is absolutely false statement.

NOTE 26

That the servants of the East India Company used to villify and miss-represent Nanda Kumar's character and conduct is quite apparant even from Mr. barwell's letter to his sister recently published by Sir James Stephen in his book on 'Num Coomer and Impey.'